ভারতবর্ষ

ভাদ্র, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ

আচার্য্য শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

বহু দিন হইতেই শুনিতেছি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদী ; অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত জীবের তত্ত্বতঃ ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে ; এবং সেই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অগোচর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত বৈষ্ণবগণও ঐ কথাই বলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আধুনিক টীপ্পনীকারগণও ঐ ভাবের কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিকভেদবাদী। মধ্বাচার্য্যের ন্যায় তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত স্বরূপতঃ ভেদই স্বীকার করিয়াছেন। পরে ইহার কারণ বলিব। এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী—ইহা কিরূপে বুঝা যায়? এ বিষয়ে মাননীয় গোস্বামী পণ্ডিতগণের কথা কি—তাহাই প্রথমে আলোচনা করিব।

বহু জিজ্ঞাসা ও বহু অনুসন্ধানের পর একজন অতিবৃদ্ধ বহুদর্শী সুপণ্ডিত গোস্বামী মহোদয়ের নিকটে শুনিয়াছি যে, শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের টীকায় কল্পান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তুর অংশ জীব এবং ব্রহ্মের শক্তি মায়া, ও ব্রহ্মের কার্য্য জগৎ ও এই সমস্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে—এই সিদ্ধান্তই বুঝা যায়। সেই ভাগবতের শ্লোকাংশ এই—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্", এবং তাহার টীকা যথা—"যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তিঃ মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগৎ চ, তৎসর্ব্বং বস্তেব, ন ততঃ পৃথক্ ইতি বেদ্যম্ অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যম্ ইত্যর্থঃ।"

এখানে "ব্যাখ্যালেশ"কার শ্রীধরস্বামীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীধর স্বামীর মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়ই যে তত্ত্ব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবও জীবেশ্বরের ভেদাভেদবাদী ইহা কথিত হয়। "ব্যাখ্যালেশ" গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আর

শ্রীমদ্ভাগবতাদি অনেক গ্রন্থেই যখন জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, তখন জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাবে ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায়।

পরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্বকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। তিনি পরমাত্মসন্দর্ভে ও শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদনির্দ্দেশ ও অভেদনির্দ্দেশের উপপাদন করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানলিপ্সু তাঁহাদিগের জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ আছে, আর যাঁহারা ভক্তিলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উপদেশ আছে। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামীর ঐ সকল কথার দ্বারা তিনি যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের ন্যায় অভেদও স্বীকার করিয়াছেন ইহা বুঝা যায়। তাহার পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপদেশ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণের দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
(ম, খ, ২০ প)

এই শ্লোকে জীবের স্বরূপ বলিতে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ উভয়ই তত্ত্ব এবং ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মত ইহাই বুঝা যায়। এইরূপে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গোস্বামি-পাদগণ জীব ও ব্রহ্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী—ইহাই প্রসিদ্ধ আছে—আর ইহাই উক্ত অতিবৃদ্ধ গোস্বামিপাদের নিকট আমি শুনিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত কথায় আমার বক্তব্য এই যে, যদিও শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামিপাদকে অমান্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে, শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ও সমস্ত মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলা যায় না। কারণ, শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা" এই তৃতীয় চরণের ব্যাখ্যা করিতে শেষ কল্পে মায়াবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের আরও বহু স্থলে তিনি যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে মায়াবাদের খণ্ডন ও নিন্দা করিতে ইহাও বলিয়াছিলেন—

"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"
(চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য-৬ষ্ঠ পঃ)

সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় শেষ কল্পে ভেদাভেদবাদের ব্যাখ্যা করিলেও উহার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের মত নির্ণয় করা যায় না। পরন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ যে ঐ স্থলে ভেদাভেদবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহাও আমাদিগের মনে হয় না। তিনি ঐ স্থলে জীবাদির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তৎসর্ব্বং বস্তুত্বেব ন ততঃ পৃথক্"—এই কথার দ্বারা জীবাদি সমস্তই ব্রহ্মরূপ "বস্তু" হইতে পৃথক্ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তা হইতে জীবাদির বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই, এই অদ্বৈতবাদও আমরা বুঝিতে পারি। "বস্তুত্বেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা যে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে—ইহাই মনে হয়। শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের শেষ কল্পের ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ কল্পের ব্যাখ্যারও ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে হয়।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানা শাস্ত্র গ্রন্থে জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা কথিত হইলেও, তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য-দেবের মতেও জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

কারণ, মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ হইলে তাহাতে স্বরূপতঃ ঈশ্বরের অভেদ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। যেহেতু তিনি বেদান্ত দর্শনের "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে প্রথমে জীব ঈশ্বরের অংশ এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পরে জীব ঈশ্বরের-অংশ নহে, এ বিষয়েও শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করতঃ পরে অন্যান্য শ্রুতি ও বরাহ-পুরাণের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া জীব ঈশ্বরের অংশ—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং জীব ঈশ্বরের অংশ নহে—এতদ্বোধক শ্রুতির উপপত্তির জন্য বরাহপুরাণের "স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে" ইত্যাদি বচন

উদ্ধৃত করিয়া জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়াছেন এবং মৎস্যকূর্ম্মবরাহপ্রভৃতি অবতারকে ঈশ্বরের স্বাংশ বলিয়াছেন।

তাহার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে "ভেদাভেদ প্রকাশ" এই কথার দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। উহার অর্থ—শাস্ত্রে যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশ আছে, তদ্রূপ অভেদেরও প্রকাশ আছে এই মাত্র। আর এই অভেদও তত্ত্বতঃ অভেদ নহে, কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বপ্রযুক্ত অভেদ। শাস্ত্রে ঐরূপ অভেদ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য আছে। ইহা পরে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

পরন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে অদ্বৈতবাদখণ্ডন করিতে শ্রীচৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে॥ (ম, খ, ৬প)

ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর মায়ার অধীশ অর্থাৎ মায়া তাঁহার অধীন, কিন্তু জীব মায়ার অধীন; সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না। কারণ, জীবেশ্বরের তত্ত্বতঃ অভেদ থাকিলে ঈশ্বরকেও মায়ার অধীন বলিতে হয়। ঈশ্বরেরও জীবগত দোষের আপত্তি হয়। দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান শক্তি বলিয়াই ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ জীবকে ঈশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন বলা যায় না। কারণ, জীব ঈশ্বরের শক্তি হইলে ঈশ্বর আশ্রয় আর শক্তি তাঁহার আশ্রিত। আশ্রয় ও আশ্রিত সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হয়। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতেও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতিপন্ন হয় না, কেবল ভেদই প্রতিপন্ন হয়।

এখানে আর একটি কথা অবশ্য বক্তব্য এই যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবমহাত্মা শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় নিম্বার্কভাষ্যের যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি শ্রীচৈতন্যদেবও যে নিম্বার্ক-মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকের পরার্দ্ধে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকে এবং পরে যে বহু বিজ্ঞ গোস্বামি পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংশোধনপূর্ব্বক ব্যাখ্যাসহ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে "হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ পাঠই আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথি-শালায় সংরক্ষিত হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও দেখিয়াছি—হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে" এইরূপ পাঠই রহিয়াছে। উহার লিপিকাল ১০৮০ বঙ্গাব্দ।

বস্তুতঃ ঐ স্থলে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতে জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ বলেন নাই, বাস্তব অভেদই বলিয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ কথা বলিতে পারেন না, সুতরাং ঐ পাঠ প্রকৃত নহে।

মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

কাহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥ (অন্ত্যখণ্ড ৫প)

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদেরই নিষেধ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "ভেদাভেদ প্রকাশ" এই কথার দ্বারা শাস্ত্রে ঈশ্বরের সহিত জীবের ভেদপ্রকাশ ও অভেদপ্রকাশ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী যে "অভেদনির্দ্দেশ" বলিয়া উহার উপপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "অভেদপ্রকাশ" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যদি বলা যায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঈশ্বরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসদৃশ এবং জীবকে স্ফুলিঙ্গকণা সদৃশ বলিয়া উল্লেখ আছে, সুতরাং অগ্নিরূপ তত্ত্বাংশে স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন? কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, উক্ত গ্রন্থেরই অন্যান্য শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই—তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। অতএব ঈশ্বর ও জীবের, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যথাসম্ভব

সাদৃশ্যই বুঝিতে হইবে, অসম্ভব সাদৃশ্য বুঝা যাইবে না। জীবচৈতন্য নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় এবং উহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত উহার অনেক অংশে সাদৃশ্য সম্ভবও নহে। তাহার পর জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, এ জন্যই জীব ভিন্ন পদার্থ হইয়াও ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ইহাই বলিয়াছেন। যথা—

"স চ তদ্‌ভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগদ্যতে"

ইত্যাদি। সিদ্ধান্তরত্ন ৮ম পাদ।

এবং তিনিও গোবিন্দ ভাষ্যে মাধ্বমতানুসারেই জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়াছেন। আর সেই জন্যই ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ঈশ্বরাবতারগণ তাঁহার স্বাংশ এবং জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ ইহা কথিত হইয়াছে, যথা—

স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ (মধ্য ২২প)

অতএব জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ শক্তিরূপ বলিয়া অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার্য্য নহে। আর স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিতে অগ্নিত্বরূপে অভেদ থাকিলেও তাহাকে ব্যক্তিগত অভেদ বলা যায় না। এইরূপ সূর্য্য ও তাহার প্রভাসম ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ, ইহাও বহুস্থলে বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারাও শ্রীচৈতন্যদেবের মতে যে, জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অভেদও আছে ইহা বুঝা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্য্য জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও যে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বারাও ইহা আমরা বুঝিতে পারি। গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই—

"অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরিস্বীকৃতমধ্বমুনিমতানুসারতো ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসু ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত টীকাসন্দর্ভে প্রথমে মধ্বমুনির মত যে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃত এবং ঐ মধ্বমতানুসারেই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন—ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে—ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া পরে নিজেই উহার টীকা করিয়াছেন—ইহাই অনেকের ধারণা। ফলকথা বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের কথা যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে প্রধান প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা স্বীকার্য্য। উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকা করিয়াও তাঁহার যে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীবগোস্বামিপাদের তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে তুল্যভাবে মধ্বাচার্য্যের প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে নিম্বার্ক অথবা অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ও তত্ত্বসন্দর্ভে "শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ" ইত্যাদি এবং "তত্ত্ববাদগুরূণাং··· শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মধ্বাচার্য্যের প্রতি অত্যাদর প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অত্যাদরের কারণ বলিয়াছেন "স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ"। সুতরাং তাঁহার ঐ কথার দ্বারাও শ্রীজীবগোস্বামী যে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির মতই সাদরে গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন—ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়রচিত সিদ্ধান্তরত্নের বিজ্ঞতম টীকাকার মহাশয়ও শেষ শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেবকে "মাধ্বান্বয়দীক্ষিত ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থ" বলিয়াছেন। অবশ্য পরতত্ত্ব বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মত হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের মত যে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট তাহার বহু প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতিও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যমতে কিন্তু বিষ্ণুই পরতত্ত্ব। কিন্তু তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ কেবল ভেদই আছে—এই মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়াছেন বুঝা যায়। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় তত্ত্বসন্দর্ভে জীবস্বরূপবর্ণনের পর বলিয়াছেন যে,—

"এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎস্বরূপং তয়ৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং যৎতত্ত্বং তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা প্রোক্তাম্।"

অর্থাৎ এবম্ভূত জীবসমূহের চিন্মাত্র যে স্বরূপ, তাহার সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃ সেই জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা এই গ্রন্থে বাচ্য। কিন্তু এই স্থলে ব্রহ্ম জীবের সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃই জীব হইতে অভিন্ন ইহাই বলা হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ বলা হয় নাই। তাহা হইলে শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় ঐ স্থলে "স্বরূপতস্তদভিন্নং" এই কথা না বলিয়া "তয়ৈব আকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নম্" এইরূপ কথা বলিবেন কেন? টীকাকার বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার টীকায় বলিয়াছেন "অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে পুরুষাদ্ ইব দণ্ডিনো দণ্ডঃ" অর্থাৎ দণ্ডী পুরুষ যেমন তাহার বিশেষণ দণ্ড হইতে বিযুক্ত হয় না, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডী বলা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বর তাঁহার নিত্য বিশেষণ জীবশক্তি হইতে কখনই বিযুক্ত হন না। তাই ঈশ্বরকে অংশী বলিয়া জীবশক্তিকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু দণ্ড ও কেবল পুরুষ যেমন ঐকান্তিক ভিন্ন জীব ও ঈশ্বরও তদ্রূপ ভিন্ন। এখন যদি অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদই তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত টীকাসন্দর্ভে "ন ভিদ্যতে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে "ন বিযুজ্যতে"। বিয়োগ বা বিভাগ অর্থেও ভিদ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের তত্ত্বসন্দর্ভের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারাও তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয় শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-নির্দ্দেশের যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার টীকার শেষকালে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তি ইতি সিদ্ধম্"

অর্থাৎ তাহা হইলে ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপতঃ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নাই—ইহা সিদ্ধ হইল। ঐ স্থলেই তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, যেমন গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অথবা যুবক ও বালক ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্বরূপে ঐক্য থাকায় জাতিরূপে অভেদ আছে, কিন্তু ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ নাই, তদ্রূপ জীবও চৈতন্যস্বরূপ এবং ঈশ্বরও চৈতন্য স্বরূপ—উভয়েই চিৎস্বরূপ এক জাতীয় কিন্তু ব্যক্তিতঃ তাঁহাদের ভেদই আছে। অতএব জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের অষ্টম পাদে ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ অভেদের দোষও বলিয়াছেন; যথা—

"যদি জীবেশয়োঃ স্বরূপেণৈব অভেদঃ তর্হি ঈশস্যাপি আংশিকসুখদুঃখভোগঃ, জীবস্য চ জগৎকর্ত্তৃত্বাদি" ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তরত্ন ৮ম পাদ।

অর্থাৎ জীবেশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ যদি হয়, তবে ঈশ্বরেরও আংশিক সুখদুঃখভোগ হউক এবং জীবেরও জগৎকর্ত্তৃত্বাদি হউক, ইত্যাদি।

পরন্তু যদি কেবল প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বারাই আমরা তাঁহার মত নির্ণয় করিতে যাই, তাহা হইলেও, তিনি যে স্পষ্ট করিয়া জীব ও ঈশ্বরের সর্ব্বথা ভেদই বলিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, তিনি তাঁহার "পরমাত্মসন্দর্ভে"র অনুব্যাখ্যা—"সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদবাদই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ তত্তদসদ্ভাবাদ্ ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানি

ইত্যায়াতম্"। অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ"।—উক্ত বাক্যে তিনি "এব" শব্দ এবং "সর্ব্বথা" শব্দের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ একেবারেই নাই—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়।

পরন্তু উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র তিনি "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভেদবোধক বাক্যের সহিত তাঁহার সমর্থিত সিদ্ধান্তের বিরোধ পরিহারের জন্য বলিয়াছেন—

"তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈব একাকারত্বং বোধয়তি উপাসনাবিশেষার্থং, নতু বস্ত্বৈক্যম্"।

অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহা জ্ঞানার্থী অধিকারিবিশেষের উপাসনাবিশেষের জন্য; জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপতা প্রভৃতি কারণবশতঃই ঐ উভয়ের একাকারত্ব অর্থাৎ একজাতীয়ত্বের বোধক, বস্তুর ঐক্য বোধক নহে। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যে তত্ত্বতঃ একই বস্তু, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শ্রীজীবগোস্বামী "ন বস্ত্বৈক্যং" এই বাক্যের

দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ স্বীকার করেন নাই, একজাতীয়ত্বরূপ অভেদই স্বীকার করিয়াছেন। আর তিনি "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের কষ্টকল্পনা করিয়া অন্যরূপ কোন নূতন ব্যাখ্যাও করেন নাই। পরন্তু জ্ঞানার্থী অধিকারিবিশেষের জন্য অহংগ্রহ উপাসনাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভক্ত সাযুজ্যের অধিকারী নহেন, কারণ, তিনি সাযুজ্য চাহেন না। সুতরাং তিনি অভেদ উপাসনা করেন না, করিতেও পারেন না—ইত্যাদি কথাও শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন। তিনি সাযুজ্য মুক্তি ও অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহার অনুকূল উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রভৃতিকে অশাস্ত্রীয় বলেন নাই। উহার নিন্দাও করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই—

"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহে পায় লয়॥"

আদি ৫ম পঃ।

মূলকথা, আমরা প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর "সর্ব্ব-সংবাদিনী" গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, তিনি মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদ-সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন; অচিন্ত্যভেদাভেদ সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থে উপাদানকারণ ও কার্য্যের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদপ্রভৃতি বিষয়ে নানা-মতের উল্লেখ করিয়া, কোন সম্প্রদায় যে ঐ অচিন্ত্যভেদা-ভেদ স্বীকার করেন, ইহা বলিয়াছেন, এবং পরে লিখিয়াছেন —"স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তিময়, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাহাতে তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই আছে, উহা বিরুদ্ধ হয় না। সুতরাং আমা-দিগের মতে ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে, উহা অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অগোচর। এখানে জানা আবশ্যক যে, শ্রীজীবগোস্বামী শ্রুত্যুক্ত মণিদৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া জগৎকে ঈশ্বরের বাস্তব পরিণাম বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের উহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ঐ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে; যথা—

"মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হন্ কৃষ্ণ তবু অবিকার" ইত্যাদি।

অর্থাৎ "চিন্তামণি" নামক মণিবিশেষ যেমন নিজের অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াও স্বর্ণ প্রসব করে, তদ্রূপ ঈশ্বরও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং জগৎ তাঁহার সত্য পরিণাম,—রজ্জুসর্পের ন্যায় বিবর্ত্ত বা মিথ্যা নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ পরিণামবাদে ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ অনেকে স্বীকার করিলেও, এবং শ্রীজীবগোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে উহা সমর্থন করিলেও, জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে তিনি ঐ কথা বলেন নাই। পরন্তু তিনি মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন—পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। তাঁহার মতে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইলেও জীবরূপে পরিণত হন নাই। জীব, ঈশ্বরের পরিণাম নহে, জীবচৈতন্য নিত্য, উহা ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদ তিনি সমর্থন করিতে পারেন না—ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সকল সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন করিয়া মধ্বাচার্য্যের মত সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাহা সম্ভবও নহে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভৃতি যে অনেক বিষয়ে মাধ্বমত গ্রহণ না করিলেও মাধ্বমতানু-সারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদেই সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী নহেন, —ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। এজন্য আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে যে সকল সন্দর্ভ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা দেখিয়া সুধী পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রকৃত মত কি—তাহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বাস্তব, ইহা স্বীকার না করিলে নিম্বার্কমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদ বলা যায় না। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভৃতি জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বাদিরূপে যে অভেদ বলিয়াছেন, উহা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নহে। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদের নিষেধই করিয়াছেন।

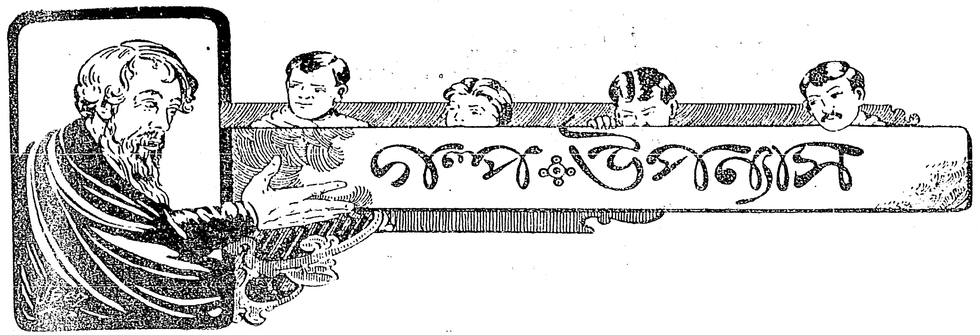

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

অনিবার্য্য হৃদয়ের আবেগে সে-রাত্রে বিছানায় পড়িয়া লীলা স্থির করিল, কাল সকালে সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী গিয়া, তাহার সঙ্গে নিজেই দেখা করিয়া ব্যাপারটা মিটমাট করিয়া আসিবে। অরুণকে দেখিতে এখন মাঝে মাঝে তাহাকে ত সেখানে যাইতে হইবে, অথচ সে যাহার বাড়ী যাইবে, তাহার সঙ্গেই এমন অসদ্ভাব হইয়া থাকিবে, এ কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার! যেমন করিয়াই হউক, কিরণের সঙ্গে ভাব না করিলে কিছুতেই তাহার চলিবে না। বিশেষ প্রথম প্রথম লীলার নিজের মনে মনেই এ বিষয় লইয়া কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু এখন যখন সে এ সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে, ও তাহার নিজের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছে, তখন কিরণ কেন একটা অমূলক ধারণা মনে বদ্ধমূল রাখিয়া এমন দূরে দূরে থাকিবে। এর বিহিত করিতেই হইবে।

প্রত্যূষে উঠিয়াই লীলা ঘোড়া ছুটাইয়া বসন্তপুরের দিকে চলিল। বেলা হইলে কিরণ বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে! কিন্তু দেখা হইলে লীলা আগে কি বলিবে? এখন তো আর আগের মত ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরা যায় না! যদি তাহাকে দেখিয়া কিরণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! লীলা নিজের মনে কত কথাই তোলাপাড়া করিতে করিতে যাইতেছিল।

সহিস তাহার অশ্ব আস্তাবলে লইয়া গেলে, বেহারা জানাইল, তাহার প্রভু বাড়ী নাই। বাহিরে যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন—মিসবাবা আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার যেন কোন ত্রুটী না হয়। সুতরাং তাঁহার সেবার জন্য তাহারা প্রস্তুত রহিয়াছে। পাছে লীলার সঙ্গে দেখা হয়, তাই সে এত সকালে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে! কিরণ নাই! লীলা স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার আর কোন কথা ভাবিবার বা কোন কিছু করিবার শক্তি রহিল না।

কিরণ সত্য সত্যই তবে তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিল! সে আর কোন দিন তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিবে না! লীলা অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল,—এ আঘাত তাহার বুকে বড় বিষম বাজিল। প্রভাতের নির্ম্মল আকাশ তাহার সমস্ত শোভা-বৈচিত্র্য লইয়া তাহার চোখের সামনে ম্লান হইয়া গেল! লীলার মনে হইল, তাহার এখানকার দেনা-পাওনা সব নিঃশেষে চুকিয়া গিয়াছে! আর কিছু তাহার করিবার নাই!

বেহারা বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে নিঃশব্দে চলিয়া গেল!

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর লীলার নিস্পন্দ

দেহে ও মনে চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে শুনিল, ঘরের ভিতর হইতে অরুণ ডাকিতেছে, বীণা! বীণা!

লীলা চমকিয়া উঠিল। অরুণের স্বরে তাহার মনের নির্জ্জীবতা নিমেষে ছুটিয়া গেল। সে এখানে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল!

টেবিলের ধারে চৌকিতে বসিয়া অরুণ অত্যন্ত অধীর ভাবে লীলার আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার চোখে মুখে কি আকুলতা! একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ তাহার দৃষ্টিহীন অসহায় মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে মুখ দেখিয়াই লীলার মনের সমস্ত অশান্তি ও বেদনা নিমেষের মধ্যে দূর হইয়া গেল।

সে অরুণের কাছে দাঁড়াইতেই, অতি মৃদু, অতি কোমল স্বরে অরুণ বলিল, এসেছ বীণা? তোমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমি কাল থেকে চিনে রেখেছিলুম। আজ যেমন তুমি গেটের কাছে এসেছ, তখনই আমি জানতে পেরেছি! তার পর থেকে কতক্ষণ ধরে যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি,—এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল!"

লীলার নিজের প্রতি অত্যন্ত ধিক্কার ও বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল! তাহার আজ কি হইয়াছে! নিরর্থক এইবেচারাকে এত কষ্ট দিয়া সে এতক্ষণ কোন্ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিল!

অনুতপ্ত চিত্তে সে নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল, আজ ত আমি কালকের চেয়ে সকালেই এসেছি অরুণ, বেশি দেরি হয়েছে কি?

অরুণ তাহার কোমল হাতখানি নিজের দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, তা হয় ত এসেছ! তোমাদের হিসেবে হয় ত দেরি হয় নি! আমার নিজের হিসেব যে আজকাল একবারে আলাদা ধরণের হয়ে গেছে! কাল তোমার যাবার পর থেকে আমি কি করে যে মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণে গুণে আজকের এই সময়টির প্রতীক্ষা করে কাটিয়েছি, সে তুমি বুঝতে পারবে না বীণা, কোন চক্ষুষ্মান্ লোকেই তা পারবে না! এসো! আরো কাছে এসো আমার! আমার চোখ নেই ত, যে, তোমায় আমি দেখবো! আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমার সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি শুধু তোমার সান্নিধ্য অনুভব করতে চাই!

দুইজনে পরস্পরের হাত ধরিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। হৃদয় যখন ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত ও পূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন মুখে সে ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা থাকে না, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিও হয় না। অরুণ তাহার একমাত্র প্রিয় বস্তুকে নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা, লীলার মনও তখন অরুণের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসায় পূর্ণ। সে তখন ভাবিতেছিল, অরুণ তাহার ভবিষ্যৎ স্বামী, তাহার কাছে এ ভাবে আসায় তাহার কোন দোষ নাই! সে যে কাল এখান হইতে যাইবার পর কিরূপে অরুণকে হারাইয়া কিরণের চিন্তায় বিভোর হইয়া কাটাইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া সে অবাক হইতেছিল। কতক্ষণ পরে অরুণ ডাকিল, বীণা!

'অরুণ!—অরুণ!'

কবে আমি তোমায় একেবারে আমার কাছে পাব? তোমাকে 'আমার' বলবার অধিকার কবে আমার হবে?

লীলা সস্নেহে তাহার উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র মুখের দিকে চাহিল, এত ব্যস্ত কেন অরুণ? এই ত তুমি আমারি কাছে রয়েছ! এখনো কি আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে না?

সে জন্য নয় বীণা! তোমার কথায় আমার কোন সন্দেহ নেই। স্বর্গের দেবী তুমি, মিথ্যার দিক দিয়ে তুমি যেতে পারো না, তা আমি জানি। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছি না। যখন জানতুম—তোমাকে পাবার আমার কোন আশাই নেই, তখন অনেক কষ্টে মন সংযত করেছিলুম, সংসারে মানুষ যখন তার সব আশা ভরসা হারিয়ে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়,—তখন তার মনের অবস্থাও হয়ে যায় সেই রকম, কিছুতেই তার আর সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, সেই হতাশ অবস্থা তখন আমারও হয়েছিল, তাই অত সহজে তোমার ওপর সব দাবি চুকিয়ে দিতে পেরেছিলুম। কিন্তু কাল থেকে যখন আবার বুঝেছি সংসারে এখনো আমার আশা করবার জিনিস আছে, আর সে তুমি, যাকে আমি আমার প্রথম যৌবনের অদম্য উচ্ছ্বাসে প্রাণ ভরে ভালবেসেছি, তখন থেকে মন যে আমার কি অধীর হয়ে উঠেছে, সে তোমায় বোঝাতে পারবো না! সারা দিন সারা রাত ধরে

অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর দু এক ঘণ্টার জন্যে তোমায় পাওয়া এইটুকুতে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। যদি আমায় এত ভালবেসেছ, তবে আর দূরে থেকো না বীণা! তোমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও আমার অসহ্য বলে মনে হচ্ছে!"

—তাই হবে অরুণ! আমি যত শীঘ্র পারি—এ কথা বাবাকে বোলবো, তারপরে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না! কিন্তু তার আগে যে আমার তোমাকে অনেক কথা বলতে হবে—এক দিন সময় মত সেগুলো শোন। তার পর শুনেও যদি—

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, তুমি যে কথা আমায় বলতে চাও, যখনি বলবে তখনি শুনবো। তার আবার সময় অসময় কি? তবে আমার নিজের কথা এই যে, আমি এখন কিছুই বলতে বা কোন কিছু করতে চাই না। ইচ্ছা করে, কেবল নিঃশব্দে কিছু দিন তোমার কাছে পড়ে থাকি। তোমার মনে আছে হয় ত, আগে যখন আমি তোমার কাছে থাকতুম, তোমার প্রতি একটা উন্মাদ ভালবাসায় আমায় কি মুখর করে তুলতো! কিন্তু এখন? চোখ হারিয়ে সে সবই আমার গেছে! বাইরের জগৎ থেকে রূপ রস শোভা সম্পদ—যা কিছু গ্রহণ করবার, সে সবই এখন আমার কাছে মৃত। এখন শুধু অনুভূতিই আমার সম্বল, সেইটুকু নিয়েই আমি বেঁচে আছি। আমি এখন আর কিছুই চাই না, শুধু এমনি করে তোমার হাতে হাত রেখে, তুমি যে আমার কাছে রয়েছ, এইটুকু জেনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকি। জীবনে আর সব সুখ থেকেই সমাধি হয়েছে আমার! শুধু এইটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত কোর না বীণা! ও কি! কাঁদছো? কাঁদো কেন বীণা?

অরুণের কথা শুনিতে শুনিতে বেদনা ও করুণায় লীলার হৃদয় ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে চোখের জল মুছিয়া বলিল, অমন করে বলো না তুমি! আমার বড় কষ্ট হয়! কেন তুমি এত হতাশ হয়ে পড়ছো? যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো, তখন তুমি দেখবে—আমাদের সুখের কোন কিছুই নষ্ট হয় নি!

নিজের রুমালে অরুণ সাদরে সস্নেহে লীলার চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল, তোমার এই চোখের জল আমার এ দগ্ধমরু জীবনে শান্তিবারি! এখনো আমার জন্যে একজনের মনে এত ভালবাসা, এত করুণা সঞ্চিত রয়েছে, তা জেনেই ত আমার মনে আবার বাঁচবার সাধ ও আশা ফিরে এসেছে! আমার সবই ত গিয়েছিল বীণা! তুমিই ত আবার আমায় ফিরিয়ে আনলে!

লীলা মুগ্ধ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ ও প্রেমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলাপে তাহার মনের আনন্দ ও আশা প্রকাশ পাইতেছিল। লীলা মনে মনে ভাবিল, তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ হবে! স্বেচ্ছাচার করেছি বলে আমাকে যে যতই গালাগালি দিক্—আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়বো না।

কথায় গল্পে সেদিন দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। লীলা উঠিবার সময় টেবিলের উপর একখানা খাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, এ খাতাখানা তোমার না কি? তুমি এখন লিখতে পারো অরুণ?

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, যখন একলা থাকি, তখন আঁচড় কাটি। একটা কিছু করে সময় কাটাতে হবে ত। তাকে আর লেখা বলতে পারা যায় না!

লীলা খাতাখানি তুলিয়া কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, কিন্তু তোমার লেখা ত বাঁকা-চোরা হয় নি? অল্প একটু যা দোষ আছে, আমার মনে হয়, যদি তুমি বসে বসে আরো কিছু দিন অভ্যাস করো, তা হলে বোধ হয় আর এটুকুও থাকবে না, বেশ চলনসই লেখা হয়ে যাবে।

অরুণ বলিল, আমি ত বরাবরই অভ্যাস করছি। প্রথম প্রথম বড় বাঁকা-চোরা হত। লিজি কত দিন আমার হাত ধরে ধরে লেখা অভ্যাস করিয়েছে। তার কথা সব তোমাকে আর এক দিন বোলবো বীণা! আমি যে আজ আবার এমন ভাবে দেশে ফিরে এসেছি, এ শুধু তারই সেবা ও যত্নের গুণে। এখনো হয় ত সে আমার কথা মনে করে কত কষ্ট পাচ্ছে।

লীলা গভীর সম্ভ্রমের সহিত বলিল, তোমার কাছে তাঁর কথা শুনে অবধি তাঁর প্রতি আমার যে কি শ্রদ্ধা হয়েছে, সে আর কি বোলবো? আমরা যখন একসঙ্গে থাকবো, তখন তুমি চিঠিতে পরিচয় করে দিও, আমি তাঁকে চিঠি লিখবো। কিন্তু অরুণ! তুমি কি সুন্দর

লিখতে পারো! কি চমৎকার তোমার লেখবার শক্তি! তোমার লেখা পড়তে আমার এত ভাল লাগে!

অরুণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, সত্যি বীণা? আমি কি এত ভাল লিখি, যে তোমার ও পড়তে ভাল লাগে? তা হলে আমার লিখতে শেখা আজ সার্থক হলো বলতে হবে!

লীলা বলিল, সত্যিই বলছি—তোমার বেশ ক্ষমতা আছে লেখবার! দেখ অরুণ! আমার একটা কথা মনে আসছে! তুমি একখানা উপন্যাস লেখ না কেন? যদি কিছু দিন একটা টাইপিষ্ট রেখে টাইপ-রাইটিং শিখে নিতে পার, তা হলে ত লেখবার কোন ভাবনাই থাকে না। বিলেতে অন্ধরা সব টাইপ রাইটিং এর সাহায্যে অনর্গল লিখছে—দেখে এলুম। তারা কেউ অক্ষম অকর্ম্মণ্য নয়। তুমি যদি এটা কর, তোমার মনের সমস্ত চিন্তা, কল্পনা—তুমি এ রকমে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে। আর তখন এই দিকে তোমার মন এমনি রত থাকবে যে বাইরের কোন অভাব বা চোখের অভাব তোমার মনেই আসবে না। উপস্থিত তুমি আর কিছু দিন লেখা অভ্যাস করে' হাতেও লিখতে পারো। যা কিছু ভুল থাকবে, আমি মাঝে মাঝে এসে সেগুলো তোমায় পড়ে শোনাব। তখন তুমি আবার শুধরে দেবে। এই রকমে দুজনের চেষ্টায় বেশ চমৎকার একটা বই তৈরি হবে।

অরুণের মুখ আশায় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, তুমি আজ আমায় একটা নতুন পথ দেখালে বীণা! আমি কখনো এ কথা ভেবে দেখে নি! বাইরে কাজ করবার যে শক্তি থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, সেই রুদ্ধ শক্তি—যদি এটা সম্ভব হয়, তা হলে—আর এক দিক থেকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্র পাব আমি! আমি নিশ্চয় তোমার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করবো! আজকে কিরণ বাড়ী ফিরলে তার সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলে দেখবো, সেই বা কি বলে।

১৪

মিঃ রায়ের গৃহে সেদিন অপরাহ্ণে একটা পার্টি উপলক্ষ্যে মহা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ, জমীদারবর্গ, ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বিস্তৃত বাগানের এক দিকে বড় বড় তাঁবু খাটাইয়া অতিথিগণের জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। অন্য দিকে, দূরে টেনিসকোর্টে টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলা চলিতেছিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণজাল সুবৃহৎ বট ও অশ্বত্থের ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাঠে ও লনে পড়িয়া রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। বাগানের অন্যদিকে সমবেত জনগণকে আনন্দ দিবার জন্য একদল বাদ্যকর তাহাদের ব্যাণ্ডে প্রচলিত সুর সকল আলাপ করিতেছিল।

বীণা সুচারু বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া তাহার পিতার অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বেড়াইতেছিল। নীল রংএর বেনারসী সাড়ী তাহার সুগৌর কমনীয় তনু বেষ্টন করিয়া ঝলমল করিতেছে, সুঠাম শুভ্র বাহুর উপর স্বর্ণখচিত ব্লাউসের কারুকার্য্য তাহার গাত্রবর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার অনাবৃত শুভ্র কণ্ঠে হীরক-জড়িত নেকলেস্—কাণে ছোট দুটি মুক্তার ইয়ারিং, সুগোল মণিবন্ধে রত্নময় স্বর্ণাভরণ ঝলমল করিতেছিল। সে মৃদু মিষ্ট হাসি ও শোভন ভব্যতার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া বেড়াইতেছিল। যখন যেদিকে সে যাইতেছে—সেইদিক হইতেই অস্ফুট প্রশংসার গুঞ্জন উঠিয়া তাহাকে সমধিক প্রীত ও গর্ব্বিত করিয়া তুলিতেছিল।

লীলা এ সব পার্টির পক্ষপাতী নয়। এই সংযত ভদ্রতা ও সব সময় হিসাব করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব; তাই সে যথাসম্ভব শীঘ্র নিমন্ত্রণ-সভা ত্যাগ করিয়াছে ও বীণার উপর আতিথ্যের ভার দিয়া সে টেনিসকোর্টে তাহার খেলার সঙ্গীদের লইয়া খেলা জমাইয়া তুলিয়াছে।

সুপরিচ্ছদধারী খানসামারা চা, কেক, ও অন্যান্য মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র লইয়া সকলের কাছে ঘুরিতেছিল। মিসেস্ রায়ের বন্ধু একটি মহিলা এক পেয়ালা চা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, আপনার ছোট মেয়েটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

মিসেস রায় একদৃষ্টে বীণার অকুণ্ঠ সহজ গতি, ও তাহার সকলের সঙ্গে সমান ভাবে সামাজিকতা রক্ষা করিয়া আলাপ করিবার ক্ষমতা মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। গর্ব্বময় আনন্দে তাঁহার মাতৃহৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিতে-

ছিল। লীলার প্রসঙ্গ উঠায় তাঁহার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল। তিনি বলিলেন, লীলা বড় অস্থির ও খামখেয়ালী মেয়ে,—সে এই একটু আগে টেনিস খেলতে চলে গেছে। আর তার উপর এ সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতেও ত পারি না। সে যেমন আমার বীণা,—কোন কথা তাকে শেখাতে হয় না, সকল দিকে সমান!

চায়ের পেয়ালায় একটি চুমুক দিয়া মিসেস দত্ত বলিলেন, তা যা বলেছেন! আপনার এ মেয়েটি রূপে গুণে সমান। আমি ত তাই সবাইকে বলি, বীণার মত মেয়ে আমাদের সমাজে ত আর দেখা যায় না। ভাল কথা—বোসেদের বাড়ীর খবর শুনেছেন কিছু। সুধীর বোস—ডাক্তার? আজ ভোরে যে সেখানে মহা কাণ্ড হয়ে গেছে!

মিসেস রায় বলিলেন, কি হয়েছে? কই, আমি কিছুই শুনি নি ত?

সেন-গৃহিণী এতক্ষণ তাঁহার বিপুল দেহভার একখানা ইজিচেয়ারে ন্যস্ত করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পিষ্টকের মধুর রসের আস্বাদনে ব্যস্ত ছিলেন। ডাক্তারের বাড়ীর কথা কর্ণে যাইবামাত্র, তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া সচকিতে বলিলেন, কেন? কেন? কি হয়েছে সুধীর বাবুর বাড়ী? তিনি ত কাল সকালেও আমায় দেখতে আমাদের বাড়ী গিছলেন!

মিসেস দত্ত একটু বিজ্ঞজনোচিত হাসির সহিত বলিলেন, হুঁঃ! কাল সকালে! এখন বলে দু' এক ঘণ্টার মধ্যে কত যুগ উল্টে যাচ্ছে, আর আপনি বল্লেন, কাল সকালকার কথা! ব্যাপারটা ঘটেছে আজ ভোরে। কাল সকালে কি আর কেউ এ কথা জানতো? আজকাল দিন কাল বড়ই খারাপ পড়েছে দিদি! বড়ই মন্দ সময় পড়েছে! কার ঘরে কখন যে কি ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না! এ যেন অষ্ট প্রহর মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, কখন কার মাথায় পড়ে, এমনি সশঙ্কিত হয়ে থাকা!

উপস্থিত মহিলাগণ এরূপ একটা আসন্ন বিপদের করাল ছায়ার সান্নিধ্যে মনে মনে উদ্বেগ ও ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন! ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই একটা কিছু গুরুতর বিষয় ঘটিয়াছে! মিসেস দত্ত সহরের সব খবরই রাখিয়া থাকেন। তিনি যখন বলিতেছেন, তখন তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। একটি মহিলা শুষ্কমুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়েছে—ডাক্তার বাবুর বাড়ী? আপনি কি আজ সকালে সেখানে গিয়েছিলেন?

মিসেস দত্ত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, উপস্থিত সকলেরই মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে আরম্ভ করিলেন, যাবার কি আর যো ছিল তখন সেখানে? একেবারে বাড়ীর চার পাশ তখন পুলিশে ঘিরে ফেলেছে,—ডেপুটি কমিশনার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর—যত সব পুলিশের বড় বড় অফিসার, আর লাল পাগড়ীর দল—গিস্ গিস্ করছে! সে কি কাণ্ড! রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য! ঐ যে নলিন, ডাক্তার বাবুর বড় ছেলে, এবার বি-এ পাশ করে বেরোল? আপনারা ত সকলেই তাকে দেখেছেন? কতদিন খেলতেও এসেছে এখানে! এদিকে ত অত ভদ্র—শিষ্ট শান্ত ছেলে—তা কে আর ভেবেছে বলুন—? অমন ছেলে এনার্কিষ্টের দলে মিশেছে!

এনার্কিষ্ট! সকলে ভয়ে বিস্ময়ে একবারে স্তব্ধ! কিছুক্ষণের জন্য স্থানটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মিসেস রায় জজ-গৃহিণী,—জেলার সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের পত্নী,—তাঁহার কোন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা বা কোন বিষয়ে ব্যগ্রভাব শোভা পায় না! তিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু এ কথার পর তিনিও আর তাঁর অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সবিস্ময়ে বলিলেন, নলিন এনার্কিষ্টের দলে মিশেছে? এ যে বড় আশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে! পুলিশ কি তার বিপক্ষে প্রমাণ পেয়েছে কিছু?

তা আর পায়নি? তারা তলে তলে সব সন্ধান রাখছে কতদিন ধরে! না হলে খামখা গিয়ে ধরতে পারে? তারা বাড়ী সার্চ্চ করেই ত রিভলভার, বোমা, টোটা—কত কি সব পেঁয়েছে। শুনলুম—নলিনের নামের খানকতক চিঠিপত্র যা পাওয়া গেছে, তা থেকে নাকি আরো সব ভয়ানক কাণ্ডের খবর বেরিয়ে পড়েছে। কাল সকালের কাগজে সব খবরই পাবেন এখন।

মিসেস রায় চিন্তিত ভাবে বলিলেন, গোপনীয় কিছু যদি সত্যই প্রকাশ হয়ে থাকে, সে কি আর কাগজে বেরুবে! কাগজে শুধু মোটামুটি খবরটাই পাওয়া যায়!

যাই হোক, ক্রমে ক্রমে দেশের কি অবস্থা হতে চললো? এই জনকতক মাথা-পাগলা ছোকরা,—এরাই সব গোটা-কতক বোমা ফেলে, আর দুটো দশটা লোক মেরে, এত বড় প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ রাজত্বটা উড়িয়ে দেবে ভেবেছে না কি? এতে ইংরেজের কোন ক্ষতিই হবে না, মর্‌তে ওরা শুধু নিজেরাই মরবে বই তো নয়! আর এত অসন্তোষটাই যে কিসের, তাও ত আমি কিছু বুঝি না। ইংরেজের রাজত্বে আজ আমরা যে শান্তি, সুখ, মান, সম্ভ্রম পেয়েছি, ও ভোগ করছি, এ সব পূর্ব্বে ছিল কখনো! আমি অবাক্ হয়ে ভাবি, এই সব ছেলেরা লেখাপড়া শিখে, মানুষ হয়ে কি করে এমন ভুল পথে যাচ্ছে?

মিসেস দত্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন, তবে আর একটু আগে আমি বলছিলুম কি? যত সব ভাল ভাল ছেলে,—যারাই দুটো চারটে পাশ করেছে,—সে সবই প্রায় এই দলে,—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এই এক কি হাওয়া ঢুকেছে! তাই ত বলি, আমাদের সবাইয়ের ছেলে পুলেই ত পড়ছে শুনছে, বাইরে থেকে দেখতে শুনতে বেশ ভালই, কিন্তু কে যে ভিতরে ভিতরে কি কাণ্ড করছে—তা কিছুই বলা যায় না! যেদিন যে ধরা পড়বে, সেই দিন তার কথা সবাই জানবে। এই যে নলিনের কথা নিয়ে আজ সহরে হুলস্থুল পড়ে গেছে,—অন্যের কথা দূরে থাক্, তার মা বাপই কি এ সব ঘুণাক্ষরে জানতো! আজ বিকেলে খবর পেয়ে যখন তাদের বাড়ী গেলুম, তার মা তখন কেঁদে লুটোপুটি! তাকে দুটো কথা বোলবো কি—নিজেই আমি কেঁদে মরি!

মিসেস দত্ত কথা শেষ করিয়া রুমালখানি তুলিয়া নিজের শুষ্ক চক্ষু দুটি একবার মার্জ্জনা করিয়া ফেলিলেন।

মহিলাদের মধ্যে অনেকেই এ সংবাদে যথার্থই সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাঁহাদের মনে বার বার এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতেছিল—কোন্ দিন বা কাহার ঘরে সুধীর বাবুর বাড়ীর কাণ্ডের পুনরভিনয় হয়।

মাঠের অন্য দিকের তাঁবুতে মিঃ রায় অন্যান্য রাজপুরুষ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। দেশের সাময়িক অবস্থা, বর্ত্তমান যুদ্ধের বিষয় ও যুদ্ধের পর জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের চর্চ্চায় তাঁহাদের সভাও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

বীণা ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। বৈকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল অবান্তর গল্প শুনিয়া ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া সে একবার সভা ত্যাগ করিয়া মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণে ক্ষণে সে কাহার আশায় গেটের দিকে চাহিতেছিল।

টেনিসকোর্ট হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকার-ধ্বনি ও হাসির শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। লীলার উপর তাহার বিষম রাগ ও হিংসা হইতে লাগিল। সে কেমন সহজে এ সব সামাজিকতা ত্যাগ করিয়া খোলা মাঠের হাওয়ায় খেলার আনন্দ উপভোগ করিতেছে! আর বীণা? বেচারা সমস্ত বিকালটা কতকগুলো বাজে লোকের সহিত বাজে কথা বকিয়া বকিয়া হায়রাণ! যেন যত গরজ তাহারই! লীলা শুধু স্ফূর্ত্তি করিতেই মজবুত! ঝঞ্ঝাট দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়ে!

হেমন্তের স্বল্পাবশেষ বেলা ক্রমেই অবসান হইয়া আসিতেছিল। ম্লান রৌদ্রের রক্তিম আভা তখনো অট্টালিকার উচ্চ চূড়ায়, উন্নত তরুশিরে চিক্ চিক্ করিতেছে।

মাঠের খোলা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া বীণা কিরণের কথা ভাবিতেছিল। সে আজ এখনো আসিল না কেন? সমস্ত বৈকালটা সে তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তবু তাহার দেখা নাই। আর এই চৌধুরী, দত্ত, গাঙ্গুলী, সেন ইহাদের অযাচিত আলাপ ও স্তুতি প্রশংসার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! যাহাদের দরকার নাই, তাহারাই কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছে আসে, আর যাহাকে সর্ব্বদা খোঁজা যায়, তাহার দেখা পাওয়া যায় না।

মাঠের অন্য প্রান্তে ব্যাণ্ডে একটি প্রেমের গানের গৎ বাজিতেছিল, বীণা এক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে সেই সুরটি শুনিল। তার পর বিরক্ত ভাবে নিজের অঞ্চলে গাঁথা একটি গোলাপ ফুল খুলিয়া লইয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া নিজের মনে বলিল, সন্ধ্যা হয়ে গেল—সে আর এল না দেখছি।

যতদিন হইতে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে,—

বরাবরই কিরণের এইরূপ উদাসীন ভাব! সে চিরদিনই সংযত ও গম্ভীর; তাহার স্বভাবে লঘুতা বা চাঞ্চল্য কখনো দেখা যাইত না। শারীরিক সামর্থ্যে ও সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠবে তাহার প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ ভরপুর। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, পোলো ইত্যাদি খেলায় ও শিকারে তাহার মত দক্ষ যুবক সে জেলায় আর কেহ ছিল না। তাহার হৃদয় কোমল,—দয়া মায়া স্নেহে পরিপূর্ণ; কিন্তু সে অসীম মানসিক বলে বলীয়ান্। শিশুদের সে অত্যন্ত ভালবাসিত। যখন সে তাহাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয়, তখন সেও যেন তাহাদেরই মত শিশু হইয়া পড়ে। কাছাকাছি দুই মাইলের ভিতর যত ছোট শিশু ছিল—কিরণ তাহাদের সকলের বন্ধু। তাহাদের প্রত্যেকের জন্মদিনে কিরণ বাড়ী বহিয়া তাহাদের জন্য উপহার লইয়া ফিরিত। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাইলে সে নিজের সব কাজকর্ম্ম একবারে ভুলিয়া যাইত।

জেলার মধ্যে সে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিল। তাহার উচ্চ শিক্ষা, অতুল ঐশ্বর্য্য, সংযত ভদ্র স্বভাব তাহাকে সকলের মধ্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল।

মহিলাদের মধ্যেও তাহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তার ব্যবহার সর্ব্বদা নম্র সৌজন্যে পূর্ণ ছিল। তবুও তাহার নামে চর্চ্চার ত্রুটী হইত না। সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাসক্তিই এই চর্চ্চার অন্যতম কারণ। সে তরুণীদের সহিত অবাধে মিশিত, তাহাদের সমস্ত আবদার অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রতি তাহার কোন পক্ষপাত দেখা যায় নাই।

বীণা এখানে আসিলে যখন প্রথম তাহার সহিত পরিচয় হয়, তখন সে মনে স্থির জানিত, কিরণের এত দিনের সমস্ত অনাসক্তি ও গর্ব্ব তাহার কাছে খর্ব্ব হইবেই। এ পর্য্যন্ত কোনখানে তাহার সৌন্দর্য্য ও শক্তির পরাজয় ঘটে নাই,—সেজন্য বীণা নিজেকে অজেয় বলিয়াই জানিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু কিরণের ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে বীণার সঙ্গে অকুণ্ঠ ভাবে মেশে, তাহার অন্য ভক্তদের মত তাহার রূপেরও প্রশংসা করে, তাহার সঙ্গে গান গায়, গল্প করে,—কিন্তু তাহার মনের ভিতর বীণা প্রবেশ করিতে পারিল না।

তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহার মনে ঈর্ষা জাগাইবার জন্য বীণা কতবার তাহার সম্মুখে অন্য যুবকদের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করিয়া দেখিয়াছে—কিন্তু কিরণ অচল, অটল। বরং সে কোন অপরিচিতকে দেখিলে নিজ হইতেই তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

বীণা কিরণের সম্বন্ধে যতই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল, ততই কিরণ যেন তাহার কাছে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ, মেয়েরা আর সব হয় ত সহ্য করিতে পারে,—কেবল তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য তাহাদের অসহ্য। ইহাতে তাহাদের সংকল্প ও প্রতিশোধস্পৃহা আরও বাড়িয়া ওঠে; যেমন করিয়াই হোক্—অহঙ্কারীকে বশ করিতেই হইবে।

সেইজন্য কিরণকে শেষ পর্য্যন্ত জব্দ করিবার একটা একান্ত বাসনা বীণার মনে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া থাকিত। ইতিমধ্যে এক দিন সহসা অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, ও সর্ব্বপ্রথম কিরণই বন্ধুর সাদর অভিনন্দন অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে জানাইয়া গেল।

কিন্তু লীলা ফিরিয়া আসিতেই কিরণের যেন সমস্ত প্রকৃতি ওলট-পালট হইয়া গেল। তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য, মেয়েদের প্রতি অনাসক্তি, ও উদাসীন ভাব—সব বদলাইয়া সে যেন একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গেল।

দুই চার দিনের মধ্যেই তাহারা অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত দিন ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাবার সময় ছাড়া কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িত না। এক সঙ্গে বেড়ান, হাসি, গল্প, গানে তাহারা একবারে মস্‌গুল!

লীলার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা বীণার চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল। শুধু বীণা নয়—সমাজের সমস্ত মেয়েরাই কিরণের এইরূপ রুচি-পরিবর্ত্তন দেখিয়া রাগে ও হিংসার আক্রোশে জ্বলিয়া যাইত! লীলাকে লইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এত বাড়াবাড়ি! লীলার আছে কি?

অরুণের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর হইতে বীণা কিরণকে আবার নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন দিনই তাহাকে সুবিধামত নিকটে পাইত না বলিয়া তাহার আক্রোশ ও গাত্রদাহের সীমা ছিল না। লীলা কি বেহায়া ও নির্লজ্জ!

অষ্ট প্রহর কিরণকে দখল করিয়া বসিয়া আছে! একবার তাহার সহিত একটা কথা কহিবারও উপায় নাই!

আজ হয় ত একটা সুযোগ মিলিতে পারে, বীণা আশা করিতেছিল। লীলা টেনিসকোর্টে,—সে সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না,— এই সময় যদি কিরণ আসে!

অনেকক্ষণ একা মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে বীণা নিরাশ চিত্তে আবার তাঁবুতে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। আজিকার দিনটা বৃথা! একটা অতৃপ্তি ও অবসাদে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল।

সেই সময় গেটের কাছে কাহার মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। বীণার মুহ্যমান মন আবার আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দেখিল—কিরণ মিসেস্ রায়ের সহিত কথা বলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত *

(শ্রীম-কথিত)

পঞ্চম ভাগ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধর, হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

৺ফলহারিণী পূজা ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন; বেলা ১১টা হইয়াছে। রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা সেই ঘরে উপস্থিত আছেন। গত রাত্রে ফলহারিণী পূজা হইয়া গিয়াছে; সেই উৎসব উপলক্ষে নাটমন্দিরে শেষ-রাত্রি হইতে যাত্রা হইয়াছে—বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ সকালে মন্দিরে মাকে দর্শন করিতে গিয়া একটু যাত্রাও শুনিয়াছেন। যাত্রাওয়ালারা স্নানান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আজ শনিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৪শে মে ১৮৮৪ খৃঃ, অমাবস্যা।

যে গৌরবর্ণ ছোকরাটী বিদ্যা সাজিয়াছিলেন, তিনি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত আনন্দে অনেক ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন; ভক্তেরা আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি)। তোমার অভিনয়টী বেশ হয়েছে। যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।

[যাত্রাওয়ালাকে ও চানকের সিপাইদিগকে শিক্ষা—অভ্যাস যোগ; 'মৃত্যু স্মরণ কর।']

"আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাচতে শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পূজা জপ ধ্যান এ সব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।

বিদ্যা। যাত্রাতেও দেখা যায় মাথায় কলসী রেখেছে অথচ নাচছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসার করবে, অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।

"আমি চানকে পল্টনের সিপাইদিগকে বলেছিলাম

* সর্ব্বসত্বসংরক্ষিত।

তোমরা সংসারের কাজ করবে, কিন্তু কালরূপ (মৃত্যুরূপ) ঢেঁকী হাতে পড়বে, এটী হুঁস রেখো।

"ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকী দিয়ে চিড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকী টেপে, আর একজন নেড়ে চেড়ে দেয়; যে নেড়ে চেড়ে দেয় সে হুঁস রাখে যাতে ঢেঁকীর মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে, 'তোমার কাছে এত বাকী পাওনা আছে দিয়ে যেয়ো।'

"ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁসিয়ার হওয়া চাই; তবে দুদিক রাখা হয়।"

[যাত্রাওয়ালাকে আত্মদর্শনের উপদেশ। ঈশ্বর দর্শনের উপায় কি? প্রমাণ কি?]

বিদ্যা। আজ্ঞা, আত্মা যে দেহ থেকে পৃথক তার প্রমাণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রমাণ? ঈশ্বরকে দেখা যায়; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্স্এ (science) ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সঙ্গে ওটা মিশালে এই হয়; আর ওটার সঙ্গে এটা মিশালে এই হয়; এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষের খবর পাওয়া যায়।

"তাই এ বুদ্ধির দ্বারা এ সব বুঝা যায় না; সাধু-সঙ্গ করতে হয়। বৈদ্যের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নাড়ী টেপা শেখা যায়।

বিদ্যা। আজ্ঞা, এইবার বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তপস্যা চাই, তবে বস্তু লাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' মুখে বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি খেতে হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের কথা লোককে বোঝান যায় না। পাঁচ বৎসরের বালককে স্বামী স্ত্রীর মিলনের আনন্দের কথা বোঝান যায় না।"

বিদ্যা (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি)। আজ্ঞা, আত্মদর্শন কি উপায়ে হতে পারে?

[রাখালের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গোপাল ভাব।]

এই সময়ে রাখাল ঘরের মধ্যে আহার করিতে বসিতেছেন। কিন্তু অনেকে ঘরে আছেন বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের ভাবে পালন করিতেছেন; ঠিক যেমন মা যশোদার বাৎসল্য ভাব!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)। খানা রে! এরা না হয় উঠে দাঁড়াক্।

(একজন ভক্তপ্রতি) রাখালের জন্য বরফ রাখো। (রাখালের প্রতি) বন্হুগ্লি তুই আবার যাবি? রৌদ্রে যাস্নি।

রাখাল আহার করিতে বসিলেন। ঠাকুর আবার বিদ্যা-অভিনেতা যাত্রাওয়ালা ছোক্রাটীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যার প্রতি)। তোমরা সকলে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পেলে না কেন? এখানে খেলেই হতো।

বিদ্যা। আজ্ঞা, সবাইয়ের মত ত সমান নয়, তাই আলাদা রান্নাবাড়া হচ্ছে। সকলে অতিথিশালায় খেতে চায় না।

রাখাল খাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[যাত্রাওয়ালা ও সংসারে সাধনা। ঈশ্বর দর্শনের উপায়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি)। উপায় ব্যাকুলতা। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পাবার চেষ্টা। যখন অনেক পিত্ত জমে তখন ন্যাবা লাগে; সকল জিনিষ হল্দে দেখায়। হল্দে ছাড়া কোন রং দেখা যায় না।

"তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের ভিতর যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতি ভাব হয়ে যায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মত হাব ভাব সব হয়। সেইরূপ ঈশ্বরকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁরই সত্তা পেয়ে যায়।

"মনকে যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রং হয়ে যায়। মন ধোপা-ঘরের কাপড়।

বিদ্যা। তবে একবার ধোপাবাড়ী দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আগে চিত্তশুদ্ধি; তারপর মনকে যদি ঈশ্বর চিন্তাতে ফেলে রাখ তবে সেই রংই হবে। আবার যদি সংসার করা, যাত্রাওয়ালার কাজ করা,—এতে ফেলে রাখো, তাহলে সেই রকমই হয়ে যাবে।

"তোমার কি বিবাহ হয়েছে? ছেলে পুলে?

বিদ্যা। আজ্ঞা, একটী কন্যা গত; আরো একটী সন্তান হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মধ্যে হোলো, গেল! তোমার এই কম বয়স! বলে—'সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত'! (সকলের হাস্য)

"সংসারে সুখ ত দেখছ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অম্ল-শূল।

"যাত্রাওয়ালার কাজ করছ, তা বেশ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তার পর সব তুবড়ে যাবে! যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকমই হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। (সকলের হাস্য)

"আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম—তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।

বিদ্যা। আজ্ঞা, কাম আর কামনা তফাত্ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।

"এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একবারে ত যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরের ভক্তি-কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা, অহঙ্কার করতে হয়।

"সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।

[ভোগান্তে যোগ ভ্রাতৃস্নেহ ও সংসার।]

"কামিনী কাঞ্চনে মনের বাজে-খরচ হয়। এই দেখ না ছেলেমেয়ে, যাত্রা করা—এই সব নানা কাজে ঈশ্বরেতে মনের যোগ হয় না।

"ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—অবধূত চীলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চীলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেল্লে; যে দিকে চীল মাছ-মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চীলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল, তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চীলের দিকে আর গেল না।

"মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু। কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা; ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।

"আবার দেখ, অর্থই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটা-চাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটী ফেলে দেয় তাহলে পরস্পর কামড়াকামড়ি করবে।

"মাঝে মাঝে এখানে আসবে (মাষ্টার প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এঁরা আসেন। রবিবার কিম্বা অন্য দুটীতে আসেন।

বিদ্যা। আমাদের রবিবার তিন মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কাটবার সময়। আজ্ঞা, আপনার কাছে আসব সেত আমাদের ভাগ্য।

"দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় দুজনের কথা শুনেছিলাম—আপনার আর জ্ঞানার্ণবের।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাইয়েদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। যাত্রাতে দেখ নাই? চারজন গান গাইছে কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে তাহলে যাত্রা ভেঙ্গে যায়।

বিদ্যা। জালের নীচে অনেক পাখী পড়েছে, যদি একসঙ্গে চেষ্টা কোরে একদিকে জালটা নিয়ে যায় তাহলে

অনেকটা রক্ষা হয়। কিন্তু নানাদিকে যদি নানান পাখী উড়বার চেষ্টা করে তা হলে হয় না।

যাত্রাওয়ালা ও ঈশ্বর 'কল্পতরু'। সকাম প্রার্থনার বিপৎ।

"আজ্ঞা, আপনি ভোগের কথা যা বল্লেন, তা ঠিক। ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে শেষকালে বিপদে পড়তে হয়। মনে কত রকম কামনা বাসনা উঠছে, সব কামনাতে ত মঙ্গল হয় না। ঈশ্বর কল্পতরু, তাঁর কাছে যা কামনা করে চাইবে তা এসে পড়বে। এখন মনে যদি উঠে ইনি কল্পতরু, আচ্ছা দেখি বাঘ যদি আসে। বাঘকে মনে করতে বাঘ এসে পড়ল; আর লোকটাকে খেয়ে ফেল্লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঐ বোধ, যে বাঘ্ আসে।

"আর কি বলব, ঐদিকে মন রেখো, ঈশ্বরকে ভুলো না—সরল ভাবে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দিবেন।

"আর একটী কথা,—যাত্রা শেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তা হলে যারা গায় এবং যারা শুনে সকলে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে যাবে।"

যাত্রাওয়ালারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থাশ্রমে ভক্ত-বধূগণের প্রতি উপদেশ।]

দুটী ভক্তদের পরিবারেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এই জন্য উপবাস করিয়া আছেন। দুই জা অবগুণ্ঠনবতী, দুই ভায়ের বধূ। বয়স ২২।২৩এর মধ্যে, দুই জনেই ছেলেদের মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বধূদিগের প্রতি)। দেখ, তোমরা শিব পূজা কোরো। কি করে পূজা করতে হয় 'নিত্য কর্ম্ম' বলে বই আছে, সেই বই পড়ে দেখে লবে। ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পারবে। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জল-খাবার সাজান, এই সকল করতে হলে ঐ দিকেই মন থাকবে। হীন বুদ্ধি, রাগ হিংসা এ সব চলে যাবে। দুই জায়ে যখন কথাবার্ত্তা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্ত্তা কইবে।

[Sri Ramkrishno and the value of Image worship.]

"কোন রকম করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা। একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়, যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই। একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তি ভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

"আগে যা বল্লুম শিব পূজা—এই সব পূজা করতে হয়। তার পর পাকা হয়ে গেলে বেশীদিন পূজা করতে হয় না। তখন সর্ব্বদাই মনের যোগ হয়ে থাকে; সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকে।

বড় বধূ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আমাদের কি একটু কিছু বলে দিবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন শিব পূজা যা বলে দিলাম তাই কোরো। মাঝে মাঝে আসবে—পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে।

বাড়ীতে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম, তা কি হচ্ছে?

বধূ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা উপবাস কো'রে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়।

"মেয়েরা আমার মার এক একটী রূপ কি না; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না; জগন্মাতার এক একটী রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলালকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। ফলহারিণী পূজার প্রসাদ লুচি, নানাবিধ ফল, গ্লাস ভরিয়া চিনির পানা, ও মিষ্টান্নাদি তাঁহারা পাইলেন।

ঠাকুর বলিলেন, তোমরা কিছু খেলে এখন আমার মনটা শীতল হলো; আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরি (তুরীয়ানন্দ) নারাণ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই কলিকাতা হইতে হরি, নারাণ, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Presidency College এর সংস্কৃত অধ্যাপকের পুত্র। বাড়ীতে বনিবনাও না হওয়াতে শ্যাম-পুকুরে আলাদা বাসা করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া আছেন। লোকটী ভারী সরল। এক্ষণে বয়স ২৯।৩০ হইবে। শেষ জীবনে তিনি এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলেন। ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

তিনি ধ্যানের সময় ঘণ্টা-নিনাদ প্রভৃতি অনেক রকম শুনিতে ও দেখিতে পাইতেন। ভূটান, উত্তর পশ্চিমে ও নানা স্থানে অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসিতেন।

হরি (অর্থাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন তাঁর বাগ-বাজারের বাড়ীতে ভায়েদের সঙ্গে থাকিতেন। General Assemblyতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়া আপাততঃ বাড়ীতে ঈশ্বর-চিন্তা শাস্ত্র-পাঠ ও যোগাভ্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দর্শন করিতেন। ঠাকুর বাগবাজারের বলরামের বাটীতে গমন করিলে তাঁহাকে কখনও কখনও ডাকাইয়া পাঠাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের কথা। ব্রহ্ম বোধ-স্বরূপ। তোতা-পুরীর ঠাকুরকে শিক্ষা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

"ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধ-স্বরূপে।"

"যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় না। ব্রহ্ম-জ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে; তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত; তবে সূর্য্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে।

[বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা—ঈশ্বর দর্শন কি; উপায় সাধুসঙ্গ।]

ভক্ত। ঈশ্বর দর্শন কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। Theatre দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দ্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়; আর বাহ্য দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।

"আবার পর্দ্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।

(নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, সাধুদের কিছু গল্প কর।

বন্দ্যোপাধ্যায় ভূটানে দুইজন যোগী দেখেছিলেন, তাঁহারা আধ সের নিমের রস খান; এই সব গল্প করিতেছেন। আবার নর্ম্মদাতীরে সাধুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেই আশ্রমের সাধু পেণ্টেলুন-পরা বাঙ্গালী বাবুকে দেখে বলেছিলেন 'ইস্‌কা পেট মে ছুরি হ্যায়'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, সাধুদের ছবি ঘরে রাখতে হয়; তাহলে সর্ব্বদা ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার ছবি ঘরে রেখেছি; আর পাহাড়ে সাধুর ছবি, হাতে গাঁজার কল্‌কেতে আগুন দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ; সাধুদের ছবি দেখলে উদ্দীপন হয়। শোলার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়; যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়।

"তাই তোমাদের বলি সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) সংসারের জ্বালা ত দেখছ। ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চালের মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে তাকে জ্বালাতন করেছিল।

"সাধুসঙ্গে শান্তি হয়; কুম্ভীর জলে অনেকক্ষণ থাকে;

এক একবার জলে ভাসে, নিশ্বাস লবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি, মাষ্টার প্রভৃতি সকলে কাছে বসিয়া আছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারের কষ্ট ঠাকুর সব জানেন।

[বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা। ভার্য্যা সংসারের কারণ; শরণাগত হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, এক কপ্পিকো আস্‌তে যত কষ্ট। বিবাহ করে, ছেলে পুলে হ'য়েছে, চাকরী করতে হয়; সাধু কপ্পি লয়ে ব্যস্ত; সংসারী ভার্য্যা লয়ে। আবার বাড়ীর সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই—আলাদা বাসা করতে হয়েছে। (সহাস্যে) চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।"

(মাষ্টারকে দেখাইয়া, সহাস্যে) ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন। তুমি কে, না আমি বিদেশিনী; আর তুমি কে, না 'আমি বিরহিনী'। (সকলের হাস্য) বেশ মিল হবে।

"তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।

হরি প্রভৃতি। আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জানো, ভোগ আর কর্ম্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে দিন কাটুক, তার পর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।

"নারদ রামকে বল্লেন, 'রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ-বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেই জন্য অবতীর্ণ হয়েছ!' রাম বল্লেন, নারদ! সময় হউক, রাবণের কর্ম্ম-ক্ষয় হোক্, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।

The Problem of Evil and Hari (Turiananda). ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা।

হরি। আচ্ছা, সংসারে এত দুঃখ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সংসার তাঁর লীলা; খেলার মত। এই লীলায় সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাল মন্দ, সব আছে। দুঃখ, পাপ এ সব গেলে লীলা চলে না।

"চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের (বুড়ীর) ইচ্ছা যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। তারপর—

'বুড়ীর লক্ষের দুটা একটা কাটে
হেসে দাও মা, হাত-চাপড়ী!'

"অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্যার পর, তাঁর কৃপায়। তখন মা আনন্দে হাত তালি দেন, 'ভো! কাটা!' এই বলে।

হরি। খেলায় যে আমাদের প্রাণ যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি কে, বল দেখি। ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

'সাপ হয়ে খাই আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি।' তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন; বিদ্যা মায়ায় ও গুরু রূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন!

"অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্ত্তা; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

"মহাভাব, প্রেম হলে দেখে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই!

"ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে; ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) "ধ্যানের সময় ঘণ্টাশব্দ এখনও কি শোনো?"

বন্দ্যো। রোজ শব্দ শোনা! আবার রূপদর্শন! একবার মন ধরলে কি আর বিরাম হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, কাঠে একবার আগুন ধরলে আর নেবে না। (ভক্তদের প্রতি) ইনি বিশ্বাসের কথা অনেক জানেন।

বন্দ্যো। আমার বিশ্বাসটা বড় বেশী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছু বল না।

বন্দ্যো। একজনকে গুরু গাড়োল মন্ত্র দিছলেন, আর বলেছিলেন, 'গাড়োলই তোর ইষ্ট।' গাড়োল মন্ত্র জপ করে সে সিদ্ধ হোলো।

"ঘেসুড়ে রাম নাম করে গঙ্গা পার হয়ে গিছল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার বাড়ীর মেয়েদের বলরামের মেয়েদের সঙ্গে এনো।

বন্দ্যো। বলরাম কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম কে জানো না? বোসপাড়ায় বাড়ী।

সরলকে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হয়েন। বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সরল; নিরঞ্জনকেও সরল বলে খুব ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমায় নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? সে সরল সত্য কি না, এইটী দেখবে বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্ত-সঙ্গে গুহ্য কথা। শ্রীযুক্ত কেশবসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। বেলা অপরাহ্ন ৫টা হইয়াছে; কাছে অধর ডাক্তার, নিতাই এবং মাষ্টার প্রভৃতি দু একটী ভক্ত বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। দেখ, আমার স্বভাব বদ্‌লে যাচ্ছে।

এইবার কি গুহ্য কথা বলিবেন বলিয়া সিঁড়ির এক ধাপ নামিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন। আবার কি বলিতেছেন—

[God's highest Manifestation in Man. The Mystery of Divine Incarnation.]

"ভক্ত তোমরা, তোমাদের বল্‌তে কি; আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, 'তুমি দেহ ধারণ করেছ সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর।'

"তিনি ত সকল ভূতেই আছেন; তবে মানুষের ভিতর বেশী প্রকাশ।"

"মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীব জন্তু পারে না।

"অন্য জীব জন্তুর ভিতরে ও গাছপালার ভিতরে তিনি সর্ব্বভূতে আছেন; কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।

"অগ্নি তত্ত্ব সর্ব্বভূতে আছে, সব জিনিষে আছে; কিন্তু কাষ্ঠে বেশী প্রকাশ।

"রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, দেখ হাতী এত বড় জানোয়ার, কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না।

"আবার অবতারে বেশী প্রকাশ। রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই যে মানুষে দেখবে উর্জিতা ভক্তি; ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় সেইখানে আমি আছি।

ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

[Influence of Sri Ramakrishna on Sj Keshav Chandra Sen.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কেশব সেন খুব আস্‌ত। এখানে এসে অনেক বদ্‌লে গেল। ইদানীং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দল বল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল।

"আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই।

"কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হোলো; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখ্‌ছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বস্‌ল; তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই।

"এখানে মাঝে মাঝে আস্‌ত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বল্‌লাম সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। আমি তারা এলেই নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।"

[ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম ও মার নাম। ভক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শন]

"আর কেশবকে বল্লাম, 'তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করতে হয়।' তখন ওরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।

"হরি নামে বিশ্বাস আমার আরও হলো কেন? এই ঠাকুরবাড়ীতে সাধুরা মাঝে মাঝে আসে; একটী মুলতানের সাধু এসেছিল; গঙ্গাসাগরের লোকের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এদের বয়সের সাধু। সেই বলেছিল, 'উপায় নারদীয় ভক্তি।"

[কেশবকে উপদেশ—বিষয় আঁসচুপড়ী, সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে সাধন।]

"কেশব একদিন এসেছিল; রাত্‌ দশটা পর্য্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বল্লে, আজ থেকে যাব; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে। কেশব বল্লে, না কাজ আছে, যেতে হবে।

"তখন আমি হেসে বল্লাম, আঁস চুপড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রি করে আস্‌ছে; চুপড়ী হাতে আছে, তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত্‌ পর্য্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; বাড়ীর গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বল্লে, কি গো, তুই ছট্‌ফট্‌ করছিস্‌ কেন? সে বল্লে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছেনা; আমার আঁসচুপড়ীটা আনিয়ে দিতে পার? তা হলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁস চুপড়ী আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে, ভোস্‌ ভোস্‌ করে ঘুমোতে লাগল! এই গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো, হো, করে হাসতে লাগল।

"আর একদিন কেশবকে বল্লাম, সংসারী হওয়া বড় কঠিন—যে ঘরে আচার আর তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরেই বিকারী রোগী কেমন করে ভাল হয়; তাই মাঝে মাঝে সাধন ভজন করবার জন্য নির্জ্জনে চলে যেতে হয়। শুঁড়ি মোটা হলে হাতী বেঁধে দেওয়া যায়, কিন্তু চারা গাছ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই কেশব লেক্‌চারে বল্লে, তোমরা পাকা হয়ে সংসারে থাক।"

"একদিন এখানে এসেছিল। সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা কল্লে। উপাসনার পর আমি কেশবকে বল্লুম, দেখ ভগবানই একরূপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ তন্ত্র এসব পূজা করতে হয়। আবার একরূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়।

"কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। চাঁদের আলোক গঙ্গাকুলে; সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে। আমি বল্লাম, সকলে বল 'ভাগবত ভক্ত ভগবান'

তখন সকলে এক সুরে বল্লে, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান'। আবার বল্‌লাম, বল 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম'। তারা আবার এক স্বরে বল্‌লে 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম'। তাদের বল্লাম, যাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।

"যখন আবার তাদের বল্‌লাম, আবার বল 'গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব'। তখন কেশব বল্‌লে, মহাশয় অতদূর নয়! তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে করবে।

"কেশবকে মাঝে মাঝে বল্‌তাম, তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন বাক্য মনের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তখন বেদে, তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে শক্তি, আদ্যাশক্তি এই সব বলি।

[অধর, মাষ্টার প্রভৃতিকে উপদেশ, 'এগিয়ে পড়'।]

"(ভক্তদের প্রতি), দেখ কেশব এত পণ্ডিত, ইংরাজিতে Lecture (লেক্‌চার) দিত, কত লোকে তাকে মান্‌ত, স্বয়ং Queen Victoria তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে! সে কিন্তু এখানে যখন আস্‌ত, শুধু গায়ে; সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আস্‌ত। একবারে অভিমানশূন্য!

"(অধরের প্রতি) দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডিপুটী, তবু তুমি খাঁদি ফাঁদির বশ। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পরেও আরও ভাল ভাল জিনিষ আছে; রূপার খনি, তার পর সোণার খনি, তারপর হীরা মাণিক। কাঠুরে বনের কাঠ কাট্‌ছিল, তাই ব্রহ্মচারী তাকে বল্লে, 'এগিয়ে পড়'।

শিবের মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে অধর, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা। এমন সময় বিষ্ণু-ঘরের সেবক পূজারী শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে আসিয়া খবর দিলেন শ্রীশ্রীমার পরিচারিকার কলেরা হইয়াছে।

রাম চাটুয্যে (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আমি ত দশটার সময় বল্লুম, আপনারা শুনলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি করবো।

রাম চাটুয্যে। আপনি কি করবেন? রাখাল, রামলাল এরা সব ছিল, ওরা কেউ কিছু কল্লে না।

মাষ্টার। কিশোরী ঔষধ আন্‌তে গেছে, আল্‌ম-বাজারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি, একলা? কোথা থেকে আনবে?

মাষ্টার। আর কেহ সঙ্গে নাই। আল্‌মবাজার থেকে আনবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। যারা রোগীকে দেখ্‌ছে তাদের বলে দাও বাড়লে কি করতে হবে; কমলেই বা কি খাবে।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা।

ভক্তবধূগণ এইবারে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আবার বল্লেন, শিবপূজা যেমন বল্লাম ঐরূপ করবে। আর খেয়ে দেয়ে এসো, তা না হলে আমার কষ্ট হয়। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা কোরো।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

অনেক বেলায় বিলোপ বাসায় ফিরিয়া যাইতেই মলয় বলিয়া উঠিল—ভ্যালা যা হোক! কোথায় ডুব মেরেছিলে?

বিলোপ গাহিয়া উঠিল—"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি!"

মলয় কৃত্রিম বিরক্তিভরা স্বরে বলিয়া উঠিল—তোমার গান রাখো। তুমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলে, আমি মনে ভাব্‌ছিলাম তুমি সাগরজলে ডুবে মরেছ।

বিলোপ গাহিতে লাগিল—

"ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌ব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি?....."

মলয় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত মরে'ও অমর হবে, কিন্তু আমি যে খিদেয় যেন আছি মরি'। চলো খাবার খেয়ে আসি.....

বিলোপ বলিল—না, আমি আর কিছু খাব না, আমি খেয়ে এসিছি।

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথা থেকে খেয়ে এলে আবার! লোণা জলে চুবুনি আর হাওয়া খাওয়া ছাড়া সাগরতীরে আর কিছু খেতে মেলে নাকি?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—সেই বৃদ্ধ.....

মলয় আঁৎকাইয়া উঠিল—ওরে বাপ রে! সেই বুড়োর পাল্লায় আবার পড়েছিলে?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তিনি এক দিন তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন.....

মলয় বলিয়া উঠিল—রক্ষা করো ভাই! বিদেশে এনে বুড়োর খপ্পরে ফেলে দিয়ো না।

বিলোপ হাসিতে হাসিতে বলিল—তিনি বলেছেন তুমি যদি না যাও ত তিনিই আস্‌বেন.....

মলয় ভয়ের অভিনয় করিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ! একেবারে মহম্মদ! পর্ব্বত যদি কাছে না যায় ত তিনিই পর্ব্বতের কাছে আস্‌বেন! কবে কখন আস্‌বেন আমায় আগে থাক্‌তে বোলো, আমি পালিয়ে থাক্‌ব!

বিলোপ বন্ধুকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিল—তিনি কাল ভোরে আস্‌বেন যদি তুমি আজ বিকালে না যাও।

মলয় বলিল—কালকের ঘুমের সুখটানটা কপালে নেই দেখ্‌ছি! ভোরে উঠেই পালাতে হবে। বৃদ্ধ-দর্শনের চেয়ে তোমার সূর্য্যোদয় দর্শন ঢের ভালো—কাল ভোর-বেলা তুমি যখন উঠ্‌বে তখন আমাকে উঠিয়ে দিয়ো, আমিও তোমার সঙ্গ নেবো, বুড়োর কাছ থেকে পালানো ও সূর্য্যোদয় দেখা—এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে। কিন্তু দোহাই ভাই, সমুদ্রতীর ত সুবিস্তৃত, আমাকে সেই দিকে নিয়ে যেয়ো যেদিকে তোমার সেই বুড়োর ছায়া মাড়াবার আশঙ্কা থাক্‌বে না।

বিলোপ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে।

সেই দিন রাত্রিশেষে ভোর-বেলা বিলোপ শয্যা ত্যাগ করিয়া মলয়কে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল, এবং ডাকা-ডাকিতে বিশেষে কোনো ফল না হওয়াতে বন্ধুকে ঠেলা দিতে লাগিল। মলয় অর্দ্ধজাগ্রত হইয়া জড়িত স্বরে বলিল—আঃ! রাত দুপুরে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছ কেন?

বিলোপ বলিল—আরে ওঠো! ভোর হয়ে গেছে।

মলয় বিরক্ত স্বরে বলিল—হোক ভোর।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তা হলে থাকো তুমি, আমি চল্‌লাম। সেই বৃদ্ধ এসে একলা তোমায় পেয়ে.....

মলয় চিত হইয়া শুইয়া একটু স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি না থাক্‌লে সে আর আমায় চিন্‌বে কি করে'? সনাক্ত করবে কে?

বিলোপ হাসিতে হাসিতে বলিল—আমি যে তাঁকে ঘরের নম্বর আর তোমার চেহারার বর্ণনা বলে' এসেছি।

মলয় ভেঙ্‌চানো স্বরে বলিয়া উঠিল—বড় কাজ করেছ! আমার মাথা কিনেছ আর কি?

মলয়ের বিরক্তি দেখিয়া আমোদ অনুভব করিয়া বিলোপ হাসিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না।

মলয় বিলোপকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ভাই সত্য করে' বলো, সেই বুড়ো আস্‌বে? না আমায় মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছ!

বিলোপ গম্ভীর ভাব ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—তিনি আস্‌বেন বলেছেন।

মলয় ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—ধুত্তোর বুড়োর নেই তিন করেছে! আমার আজকের ঘুমটাই মাটি! চলো, আজ তোমার সখের সূর্য্যোদয় দেখা আমার কপালে লেখা আছে, কে খণ্ডাবে বলো। আজ সূর্য্যোদয় দেখা হয়ে যাবে; তার পর খেয়ে-দেয়ে এখান থেকে পলায়ন। বাপ্‌স্! যে-দেশে বুড়ো পেয়ে বস্‌বার ভয় নেই, সেই রকম একটা বিজন দেশে পালাতে হবে।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তুমি যে কেলিশীল জাতকের রাজা ব্রহ্মগুপ্তের মতন বৃদ্ধবিদ্বেষী দেখ্‌ছি? তুমিও ত একদিন বুড়ো হবে?

মলয় মোটা ভাঙা গলায় বেসুরা বেতালা গাহিয়া উঠিল—

"আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—
মোদের পাক্‌বে না চুল!"

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তবে বলো না কেন—

"আমাদের ভয় কাহারে?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কি আমাদের কর্‌তে পারে?"

মলয় গাহিয়া উঠিল—

"ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি হায় হায় রে!
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে' আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!"

বিলোপ কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিল—তবে আর বিলম্ব কোরো না, বেরিয়ে পড়ো; সেই বৃদ্ধ বলেছিলেন ভোরবেলা এসে তোমাকে নিয়ে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে যাবেন।

মলয় তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে হইতে বলিল—সর্ব্বনাশ!

দুই বন্ধুতে সমুদ্রবেলায় গিয়া উপস্থিত হইল। মলয় বিলোপকে বলিল—দেখ ভাই, সেই বুড়োকে দূরে দেখ্‌তে পেয়েই আমাকে ডেন্‌জার্ সিগ্‌ন্যাল্ দিয়ো, আমি উল্টো মুখে পিঠটান দেবো···দোহাই তোমার, বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না, সেই বুড়োর খপ্পরে অতর্কিতে সঁপে দিয়ো না।

বিলোপ একবার উৎসুক দৃষ্টি সমস্ত তটভূমির উপর

বুলাইয়া লইয়া উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল—মা ভৈঃ! আজ তিনি আসেন নি দেখ্‌ছি।

মলয় বলিল—আঃ! পরম সুখবর! বাঁচা গেল! এখন নির্ব্বিঘ্নে গা মেলে বেড়াতে পার্‌ব।

অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই মলয় দেখিল একটি শ্যামাঙ্গিনী তরুণী উদীয়মান অরুণচ্ছবির দিকে স্মিতমুখ ফিরাইয়া প্রশংসমান মুগ্ধ নয়ন দুটিকে সেই শোভার সম্ভারে ডুবাইয়া দিয়াছে; নবারুণের লালিমা সেই মুখের উপর পড়িয়া মুখখানিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া সুন্দরতর করিয়াছে। মলয় সেই মাধুর্য্যচ্ছবি দেখিবামাত্র প্রশংসাভরা স্বরে বলিয়া উঠিল—বাঃ!

বিলোপের দৃষ্টি নবোদিত সূর্য্যের দিকে নিবদ্ধ ছিল; সে মনে করিল তাহার বন্ধু সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিতেছে, তাই সে সূর্য্যের দিক হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিল—কেমন, সুন্দর নয়? এ সৌন্দর্য্য কি কল্পনায় উপলব্ধি করা যায়?

মলয় কৌতুকপূর্ণ স্বরে বলিল—নিশ্চয়ই না। ভাগ্যিস বুড়োর ভয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তাই ত অরুণের সঙ্গে সঙ্গে অরুণার দেখাও পেয়ে গেলাম!

মলয়ের কথায় বিলোপ মুখ ফিরাইয়াই মলয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল মৃদুলা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পার্শ্বে তাহার পিতা, এবং তাহার পশ্চাতে এক রকম তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এক দল যুবক—যেন তাহারা সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু বস্তুত তাহারা মৃদুলার মাধুর্য্যেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বিলোপ এতক্ষণ ত্রিলোক ও মৃদুলাকে দেখিতে পায় নাই। বিলোপের মনের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল, সে সহসা মলয়ের কথার উত্তরে কিছু বলিতে পারিল না।

মলয় বলিতে লাগিল—এই অসংখ্য নরনারীর মধ্য থেকে চোখ ওকেই বেছে বরণ করে' যখন নিলে, তখনই মন বলে' উঠ্‌ল—এই! এই আমার অচেনা প্রেয়সী! এরই প্রণয়ের টানে আমার এই শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত অভিসার-যাত্রা! আমি ত প্রেয়সীকে আবিষ্কার কর্‌লাম; তুমি এইবার ঘটকালি করো।

বিলোপের মনে আশঙ্কার আঘাত লাগিল, কিন্তু সে সেই বেদনা গোপন করিয়া বলিল—কিন্তু ওঁর সঙ্গে যে বুড়ো রয়েছেন।

মলয় ত্রিলোককে একবার দেখিয়া লইয়া আবার মৃদুলাকে দেখিয়া বিলোপকে বলিল—বুড়ো থাকে থাকুক, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি!

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তবে চলো, তোমার ঘটকালি শুরু করে' দি।

মলয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে' আলাপ করা যায় একটা কিছু ফন্দি ঠাউরেছ?

বিলোপ বলিল—খুব সোজা উপায়—সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে' বল্‌ব—এই আমার বন্ধু.....

মলয় ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, ঠাট্টা নয়। ওঁদের সঙ্গে কোনো রকমে আলাপ কর্‌তে হবে।

বিলোপ আশ্বাস দিয়া বলিল—তুমি আমার উপরে নির্ভর করে' থাকো, আমি তোমার সঙ্গে ঠিক আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

মলয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু তুমি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমার প্রেয়সীর মনের সাম্‌নে থেকে আমাকে আড়াল করে' ফেল্‌বে না ত?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—ভয় নেই, আমি ঘটকালি পাকা করে' দিয়ে সরে' পড়্‌ব। চলো।

মলয় কণ্ঠস্বরে সন্দেহ কৌতূহল ও কৌতুক ভরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি আলাপ কর্‌বে নাকি?

বিলোপ বলিল—সত্যি না ত কি?

মলয়ের আগ্রহ সত্ত্বেও দ্বিধা ও সঙ্কোচ আর ঘুচে না; সে ইতস্তত করিতে করিতে বলিল—হঠাৎ গায়ে পড়ে' গিয়ে আলাপ কর্‌লে ওঁরা কি মনে কর্‌বেন.....

বিলোপ হাসিয়া বলিল—ওঁরা মনে কর্‌বেন এর যখন এত আগ্রহ তখন এর প্রণয় ক্ষণিকের মোহ নয়।

মলয় সন্দেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু আলাপ ত কর্‌বে তুমি, আর প্রণয়ের আগ্রহ থাক্‌বে আমার মনের গোপনে?

বিলোপ এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব গোপন রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—

আরে আমি ত তোমার উকিল মাত্র, উকিলের সব কথা, আর কাজের ফলভাগী হয় তার মক্কেল।

মলয় ইতস্তত করিতে করিতে বলিল—আচ্ছা, চলো তা হলে।

বিলোপ মলয়কে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া ত্রিলোককে নমস্কার করিয়া বলিল—এই আমার বন্ধু.....

বিলোপ যেরূপ ভাবে মলয়কে পরিচিত করিয়া দিবে বলিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই পরিচয় দিতেছে দেখিয়া মলয় ভয় পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বিলোপের হাত চাপিয়া ধরিল ও মৃদুস্বরে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল—এই, এই, তুমি কর্‌ছ কি! এ রকম.....

ত্রিলোক ও মৃদুলা একসঙ্গে মলয়ের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই মলয় অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল; সে দেখিল তাহারা দুজনেই উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছে। মলয় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বিলোপের উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল—আহাম্মকটা আমাকে কী অপদস্থই কর্‌লে! কিন্তু তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর না দিয়া ত্রিলোক বাবু অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, মৃদুলার মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। মলয়ের মনে হইল বিলোপের গালে এক চড় মারিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সকল লজ্জা হইতে পরিত্রাণ পায়—উহাদের ঐ হাস্য তাহাকেই ত উপহাস করিল। কিন্তু পরক্ষণেই ত্রিলোক বাবু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আজ সকালেই ঘুম ভেঙেছে তা হলে! জীবনে কি এই প্রথম সূর্য্যোদয় দর্শন ঘট্‌ল?

ত্রিলোক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মৃদুলার মুখ আবার হাস্যোদ্ভাসিত হইল।

মলয় ত্রিলোকের প্রশ্নে ও হাস্যে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল; সে স্থির করিতে পারিতেছিল না ইহারা কি বলিতেছে, কেন বলিতেছে, এই বিদ্রূপের অর্থ কি। সে থতমত খাইয়া মূঢ়ের মতন বিলোপের মুখের দিকে চাহিল!

বিলোপ একবার মৃদুলাকে দেখিয়া লইয়া ত্রিলোককে বলিল—হ্যাঁ, আজ ওঁর জীবনে প্রথম অরুণালোক-সম্পাত হয়েছে!

ত্রিলোক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়া মলয়কে চমকিত করিয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন অসম্ভব ঘটনা ঘট্‌ল কি করে'?

বিলোপ বিমূঢ় বন্ধুর মুখের দিকে একবার ও মৃদুলার স্মিত মুখের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—ভবিতব্যের লেখা! কপালে সূর্য্যোদয় দেখা লেখা আছে, কে খণ্ডাবে বলুন!

ত্রিলোকের আবার অট্টহাস্য। তিনি মলয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবার নামটি কি?

মলয় এই প্রশ্নে থতমত খাইয়া বলিল—আজ্ঞে আমার নাম?

ত্রিলোক হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হ্যাঁ, বিলোপ বাবুর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়ে গেছে; তাঁর বন্ধুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খবর আমরা পেয়েছি; তার বেশী জান্‌তে পারি নি.....

ত্রিলোকের আবার হাস্য।

মলয় বিলোপের দিকে অর্থভরা একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নম্রভাবে বলিল—আমার নাম শ্রীমলয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

মলয়ের নাম শুনিয়াই ত্রিলোক চমকিত হইয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, যেন কোনো হারানো আত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন এমনি ভাবে উন্মনস্ক হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবার কি করা হয়।

মলয় বলিল—আমি এটর্ণির কাজ শিখ্‌ছি।

এই কথাতেও ত্রিলোক আর একবার চমকিয়া উঠিলেন, যেন সন্ধানের সূত্র ক্রমশ জট খুলিয়া বাহির হইতেছে; তিনি বিস্ময়-কৌতূহলভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটর্ণির কাজ! কোন্ এটর্ণির আপিসে?

মলয় বলিল—আমার বাবার আপিসেই।

ত্রিলোক আবার চমকিত হইয়া গম্ভীরতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁর নাম?

মলয় বলিল—শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার.....

ত্রিলোক অকস্মাৎ আবার উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ও! তুমি আদিত্যর ছেলে!

তারপর ত্রিলোক মৃদুলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—মৃদু, সেই আমার সতীর্থ সুহৃদ আদিত্যর ছেলে মলয়।

ত্রিলোকের এই কথায় মলয় ও বিলোপের দৃষ্টি মৃদুলার মুখের উপর গিয়া পড়িল।

মৃদুলার মুখ আনন্দে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—বুঝেছি।

মলয়ের মনের মধ্যে মধুর ধ্বনিতে একটি মিষ্ট নাম বাজিতে লাগিল—মৃদু! মৃদু! মৃদু! এই মৃদুর কাছে সে একেবারে অপরিচিত নয়, এই পরম সৌভাগ্যে তাহার মন নৃত্য করিতেছিল।

ত্রিলোক মলয়কে বলিলেন—তুমি আমার অত্যন্ত আপনার লোক—তুমি আদিত্যর ছেলে! তোমাকে ত বাবা আমি হোটেলে থাকতে দিতে পারিনে। আমি এখানে আছি, তুমি হোটেলে থাকবে কি? তুমি এখনই আমাদের সঙ্গে চলো আমার বাড়ীতে। আমার বাড়ী বিলোপ বাবুর দেখা আছে, উনি গিয়ে জিনিসপত্তর সব হোটেল থেকে এখনই নিয়ে আসুন। বিলোপ বাবু, আমার আতিথ্য স্বীকার করতে হবে; কোনো কুণ্ঠা সঙ্কোচ করা চল্‌বে না, কারণ সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুঃ! জিনিসপত্তর নিয়ে এখনি আসা হয় যেন, আমরা অপেক্ষা করে' থাকব, আমার বাড়ীতেই চা খাওয়া হবে। চলো বাবা মলয়, চলো, অনেক বেলা হয়ে গেল, চা-টা খাবে চলো।

এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে মলয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; মৃদুলার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিবে, মৃদুলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার পরম সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু মৃদুলা অবিবাহিত ত? এই কথা মনে হইতেই মলয় চকিতে একবার মৃদুলার সিঁথির দিকে ও বাঁ-হাতের দিকে দেখিয়া লইল—সিথিতে সিঁদুর নাই। তবে কি মৃদুলা বিধবা? এই কথা মনে করিতেই মলয়ের মনটা অস্থির উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তাই হওয়া সম্ভব, নহিলে এত বয়স পর্য্যন্ত কোন্ হিন্দুর মেয়ে অবিবাহিতা থাকে? যদি হিন্দু না হয়? হিন্দু না হইলে তাহার পিতার সতীর্থ কখনই তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেন না, তাঁহার জানা থাকার কথা তাঁহার সতীর্থ কিরূপ গোঁড়া হিন্দু।

মলয় যখন এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ছিল, তখন বিলোপ ভাবিতেছিল—মজা হইল মন্দ না! মৃদুলাকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লাগিয়াছিল; মলয়েরও তাহাকেই ভালো লাগিল। আমি মলয়কে মৃদুলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে গেলাম, মলয় মৃদুলার পরমাত্মীয়, আমি এখন মলয়ের সঙ্গী বলিয়া তাহাদের অত্যাজ্য অতিথি, কিন্তু আমি অনাবশ্যক, হয়ত বা অনভীপ্সিত। আমি ত্রিলোক বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম আমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে, কিন্তু তিনি বরাবর প্রথম পুরুষে কথা চালাইয়া তুমি ও আপনি দুই-ই বাঁচাইয়া চলিতেছেন; আর মলয়ের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতে তাহাকে অসঙ্কোচে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন! এক যাত্রায় চমৎকার পৃথক্ ফল!

ত্রিলোকের আহ্বান শুনিয়া মলয় স্মিতমুখে বিলোপের দিকে চাহিল, তাহার মুখের ভাবে সে যেন বিলোপকে বলিতে চাহিতেছিল—মেঘ না চাহিতেই জল!

মলয়ের দৃষ্টির উত্তরে বিলোপ হাসিয়া বলিল—তুমি ওঁদের সঙ্গে যাও, আমি হোটেলের ডেরা-ডাণ্ডা তুলে নিয়ে আসি।

মলয় একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে যাইতেছিল—তোমার সঙ্গে আমিও.....

অমনি ত্রিলোক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—বিলোপ বাবু একাই একশ! তোমার যাবার আর দরকার কি? বাসায় গিয়ে আমি বরং আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি.....

বিলোপও ত্রিলোকের সঙ্গে সঙ্গে মলয়কে বলিল—তুমি গিয়ে আর করবে কি? সবই ত আমিই করব, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে ত! কেবল দৃষ্টি দেবার জন্যে তোমার যাবার দরকার নেই।

ত্রিলোক বিলোপের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—আমি ত আগেই বলেছি, তোমার যাবার দরকার হবে না। চলো তুমি আমাদের সঙ্গে। বিলোপ বাবু, বিলম্ব যেন না হয়, আমরা অপেক্ষা করে' বসে' থাকব.....

বিলোপ চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিমুখ ফিরাইয়া বলিল—আমি শীগ্‌গিরই আস্‌ব।

একাকী হোটেলে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বিলোপ ভাবিতেছিল—এখন সে মলয়ের তল্পীদার। ত্রিলোক বাবু

তাঁর চাকর পাঠাইয়া দিবেন মলয়ের তল্পীদারকে সাহায্য করিতে! মলয় তাহার বন্ধু, তাহার কাজ করিতে তাহার অগৌরব হয় না, যদি সেই কাজ সে স্বেচ্ছায় করে। অপরিহার্য্য বলিয়া যেখানে তাহার নিমন্ত্রণ, সেখানে যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না; কিন্তু সে যাইতে আপত্তি করিলে মলয়ের যাওয়াও হইবে না, এবং তাহাতে মলয়ের মন প্রসন্ন থাকিবে না; অতএব অরুচিকর হইলেও বন্ধুর প্রীতির খাতিরে সে ত্রিলোকের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিবার আয়োজন করিতে চলিল। (ক্রমশঃ)

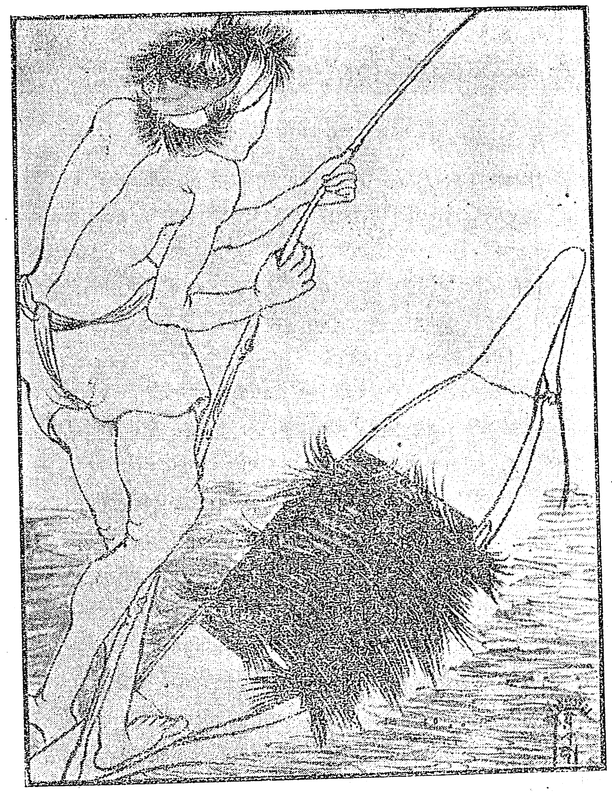

নৌকার মাঝি শিল্পী—শ্রীরণদা উকিল

শিশু-পালন

ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

শিশুর প্রয়োজনীয়তা।—শাস্ত্রে লিখিত আছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। আধুনিক সমাজ ইহা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা। শিশু ভিন্ন অন্য কেহই বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু যদি সেই শিশু সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশ-রক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা—কোন কাজই হয় না। যদি সে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হওয়া যে কি নিদারুণ, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ—পিতামাতার সে যে কি জীবন্ত-দহন—তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহারাই জানেন—অন্যের ধারণা করা সম্ভবপর নয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শিশু এরূপ হয় কেন? শিক্ষার দোষে।

শিশুর শিক্ষা।—যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতেই আহার, বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে 'পালন' করা হয় না। সন্তান যথারীতি 'পালন' করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-গঠনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তানও সৎ হয় না—হইতে পারে না। গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু 'মা' হওয়া সহজ নয়। "জননি! যদি তুমি সুসন্তানের 'মা' হইতে চাও, প্রথমে নিজেকে সংশোধিত করিয়া পরে তোমার কোলের শিশুর শিক্ষা-বিধানে যত্নবতী হও।" বাল্যে মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তোমার সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে; কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম দিন হইতে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা—সুশৃঙ্খলতা শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবেই। তা'ই, আমার সকাতর নিবেদন—'মা' যদি তুমি সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাও, যদি তোমার সন্তানকে বংশের গৌরব—জাতির গৌরব—দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাও, তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও, তোমার বংশ ধন্য হউক;

সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি গৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।"

শিক্ষারম্ভের প্রকৃত কাল ও স্থান, প্রকৃত শিক্ষা, বাল্যের শিক্ষা।—আঁতুড়ে জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃ-মাতৃ-সন্নিধান ও পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। বাল্যকালে শিক্ষা যত সহজে হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত সহজে হয় না। ভাল বা মন্দ, বাল্যের শিক্ষা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত দীর্ঘস্থায়ী হয় না—হইতে পারে না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়—সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল কলেজে অর্থকরী বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আজকাল পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে ও নিজ পরিজন মধ্যে শিশু যে শিক্ষা পায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফল হইতে দেখা যায়। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছি, শিশু যখনই যাহা চায়—সে যখনই যে আবদার ধরে, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, স্নেহবশতঃ পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন তখনই তাহাকে সেই দ্রব্য দিয়া থাকেন বা তাহার সেই আবদার পূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নপর হ'ন। এরূপ করিলে শিশুর লালসা ক্রমশই বাড়িয়া যায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবন বড় ক্লেশময় হয়। বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে; দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন সৎপ্রবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে; এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি যাহাতে তাহার মনে উদয় না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল পিতামাতা—আত্মীয় স্বজন তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই অসৎপ্রবৃত্তিগুলি শিশুর নির্ম্মল হৃদয়ে কিরূপ ভাবে জাগাইয়াছেন তাহা ক্রমশঃ বলিব।

শিশু যখন প্রথম পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব গুরুমহাশয়ের উপরও কতকাংশে নির্ভর করে; কারণ তিনিও একজন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক। পাঠশালাতে শিশুর গুরুকরণ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত মাতৃগুণ লাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকে "মা" হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয় যথোপযুক্ত গুরুগুণ-বিহীন হইয়াও সেইরূপ অনেকেই গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। "মা"ই হউন আর পাঠ-শালার গুরুমহাশয়ই হউন—যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তিনি অপরের, বিশেষতঃ ভাল-মন্দ-জ্ঞানশূন্য শিশুর, চরিত্র-গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম ক্রোধাদি রিপু দমন করিতে অক্ষম, তিনি অপরকে রিপুদমন করিতে শিক্ষা দিবেন কিরূপে? কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন করা যায় না। অপরের চরিত্র গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—নিজের চরিত্র গঠন করিয়া সেই চরিত্র অপরের সম্মুখে স্থাপন করা। পিতামাতা—আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বাল্যের শিক্ষক-গণের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের চরিত্রই—তাঁহাদের শিক্ষাই, শিশুতে দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। এ সম্বন্ধে আর আর যাহা বলিবার আছে "নৈতিক শিক্ষার" আলোচনাকালে তাহা বলা হইবে।

শিশুর স্বাস্থ্য।—শাস্ত্রে আছে "শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের যতগুলি কর্ত্তব্য আছে তন্মধ্যে শরীর অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে। কেন না সুস্থ শরীরই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রধান সহায়। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপরই বিশেষভাবে ন্যস্ত। সে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। তখন তাহার শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তৎসমস্তই মায়ের হাতে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত—উষ্ণ ইত্যাদি অভাব-কষ্ট শিশু কথা কহিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এমন কি—যদি মলমূত্র ত্যাগ করে, অন্যে যতক্ষণ পরিষ্কার করিয়া না দেয়, ততক্ষণ তাহাকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হয়—সে এত অসহায়। ক্ষুধার তাড়না, রোগের যাতনা, শীত-উষ্ণাদি দৈহিক ক্লেশ ব্যক্ত করিবার তাহার মাত্র এক অস্ত্র আছে। সে অস্ত্র—কান্না। এই কান্না মাতৃ-হৃদয়ে যেমন প্রতিঘাত দেয়, তেমন আর কোথাও হয় না। এই জন্যই বলিয়াছি সন্তানের রক্ষার্থই ভগবান্ একাধারে মাতৃ-হৃদয়ে বুকভরা স্নেহ, প্রাণ-ভরা ভালবাসা ও অপার্থিব আত্মত্যাগ পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞা মা শিশু কাঁদিলেই মনে করেন যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। তাই শিশু যখনই

কাঁদে তখনই তিনি তাহাকে স্তন্য-পান করান বা দুধ খাওয়ান। এরূপ করা শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট-কর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি শিশুর যাবতীয় অভাব-কষ্ট, সে একমাত্র কান্না দ্বারাই প্রকাশ করে—এ সকল প্রকাশ করিবার তাহার অন্য উপায় নাই। এ কথা সকল মায়েরই সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার! কেন না শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য 'মা' যত দায়ী, তত আর কেহই নন্। তাহাকে সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া গঠিত করিতে হইলে মায়ের হৃদয় করুণ অথচ দৃঢ় হওয়া চাই। কথায় বলে "ছেলে মানুষ করিতে হইলে তাহাকে হাতের আন্দাজে খাওয়াও আর বাঘের নজরে দেখ।" যে মায়ের হৃদয় কেবল করুণ কিম্বা দৃঢ়, বুঝিতে হইবে, শিশু 'পালন' করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। শিশুকে সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য তাহার আহার পরিধানাদি বিষয়ে যে সকল নিয়ম পালন করা একান্ত প্রয়োজন তাহা ক্রমশঃ বলা হইবে।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

১৪

দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গার ঠিক উপরেই শিবু একখানি পরিষ্কার বাংলা দেখিয়া আসিয়া পাপিয়াকে খবর দিলে, পাপিয়া অমলের কাছে কথাটা পাড়িল, বলিল,—আমারি বাড়ী সেটা, এমনি পড়ে আছে—যাবে সেখানে?

অমল কহিল,—তুমি যদি বল, তাহলে যেতেই হবে আমায়। কিন্তু, এখানে সব আমার চেনা—এই হাওয়া, ঐ নদীর ঢেউ, পাখীর গান—সেখানে অন্ধ আমি—এ-সবের সঙ্গে কোনো পরিচয়ই যে হবে না চপলা!

পাপিয়া কহিল,—তবে থাক্।

—রাগ করলে?

—না।···

তার পর চুপচাপ! অমল কহিল,—একটা বড় সাধ ছিল, চপলা...

—কি?

—তোমার নামে লেখা কবিতাগুলি বই করে ছাপাবো···ভেবেছিলুম, তোমার দৃষ্টি তো কোনদিন পড়বে আমার পানে···! আমার পানে তুমি চেয়ে দেখবে, এ যে বড় দুরাশার, বড় দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা—সে আকাঙ্ক্ষা করার সাহস আমার ছিল না তো! তাই ভেবেছিলুম, কবিতাগুলি ছেপে একেবারে বই করে তোমায় পাঠাবো...কলকাতায় কত বইয়ের দোকান আছে, তারা লেখা নিয়ে ছাপে! তা আমি তো এ বইয়ের জন্যে এক পয়সার প্রত্যাশা করিনে···শুধু দুখানি ছাপা বই চাইতুম...একখানি তোমায় পাঠাতুম, আর একখানি আমি রাখতুম— বাকী বই, যারা ছাপতো, তারাই বেচে তাদের ছাপার দাম তুল্‌তো... কিন্তু তা হলো না···

—নাই বা হলো! আমি তো এসেছি, ধরা দিয়েছি... তোমার হাতে লেখা এই কবিতাও পেয়েছি তো! তোমার হাতে লেখা অক্ষরের চেয়ে কি ছাপার অক্ষরের দাম বেশী হতো?

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল, ডাকিল,—চপলা—

পাপিয়া কহিল,—কেন?

অমল কহিল,—ভগবান মানুষকে কখনো সব সুখে সুখী করেন না!···আমার দুর্লভকে পেলুম···তবে অন্ধ হয়ে! বলিয়া একটু থামিল, পরে হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কিন্তু অন্ধ না হলে তোমারি কি দয়া হতো··· তুমি কি আসতে...!...তাই ভাবি, অন্ধ হয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই—আমি তোমায় পেয়েচি...তুমিই আমার চোখের দীপ্তি, আমার আলো...

পাপিয়ার বুক দুঃখে ক্ষোভে অভিভূত হইয়া উঠিল! এ কি ঝড়ের সঙ্গে যে তার লড়াই চলিয়াছে, সর্ব্বক্ষণ! আর সেই চপলা...যার জন্য এ একেবারে উন্মাদ, অন্ধ হইয়াও যার চিন্তায় এত সুখী···সেই চপলা এখন··? হয়তো তার মাড়োয়ারী বাবুটার গায়ে ঢলিয়া তার মুখে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অপূর্ব্ব মায়া বিস্তার করিয়াছে, তুচ্ছ দু'খানা গহনার লোভে!...অভিনয়! চপলা ষ্টেজে উঠিয়া শুধু দুই দণ্ড ও কি অভিনয় করে! পাপিয়া এখন যে অভিনয় করিতেছে এখানে, চব্বিশ ঘণ্টা, সর্ব্বক্ষণ, অবিরাম ...তার যে তুলনা নাই! এই সর্ব্বনেশে ভূমিকা লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বুকে ছুরির ঘা খাইয়া রক্তাক্ত হইয়া কি এ ভয়ঙ্কর অভিনয়··!

পাপিয়া কোন কথা কহিতে পারিল না—অশ্রুর বাষ্পে দুই চোখ তার ঝাপসা হইয়া আসিল। অমল কহিল,—একবার একটি মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এ চোখের দৃষ্টি খোলে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তোমায় আমার ঘরে দেখতে পাই! তোমার স্পর্শ অনুভব করছি প্রতি মুহূর্ত্তে···তবু একবার যদি তোমায় এ ঘরের মাঝে দেখে তারপর জন্মের মত আমি অন্ধ হই,—যুগ-যুগ ধরে আমায় অন্ধ জীবন বইতে হয়, তাহলেও কোনো দুঃখ থাকবে না আমার!...তা যদি সম্ভব হতো...!

পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া যদি অমল দেখিত, এ তার সাধের প্রাণের চপলা নয়, পাপিয়া... সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে কি যে হইত, সে কথা ভাবিয়া পাপিয়া আবার শিহরিয়া উঠিল।

অমল কহিল,—কিন্তু তুমি কত কাল আমার এখানে পড়ে থাকবে চপলা?...কত দিন আমায় এখন বাঁচতে হবে, তার ঠিক নেই—কত দীর্ঘ দিন...আমার এই কুৎসিত অন্ধতার ভার এমনি করে বইবে তুমি···এ যে আমার প্রাণে সইচে না, চপলা—

—তার জন্যে তুমি ভেবো না...আমি তো স্বেচ্ছায় এ ভার নিয়েছি—এ ভারী বলেও মনে হচ্ছে না!... এতে আমি যে কি সুখ পাই! পাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

—সুখ...! অমল হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কি বলচো তুমি চপলা! সুখ...?

—হ্যাঁ, সুখ! অসহ্য সুখ! তোমার সেবায় প্রাণ ঢেলে অসহ্য সুখে আমি সুখী হয়েছি...

—কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি···

—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই···আমি নারী···নারীর কাজই যে সেবা, মমতা, স্নেহ...

—তুমি দেবী, চপলা...

রাক্ষসী, রাক্ষসী! পাপিয়ার মন ক্ষুব্ধ অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিল, তোমার চপলা দেবী নয়! সে যে কত বড় রাক্ষসী, অন্ধ তুমি, তার কি বুঝিবে!

পাপিয়া কহিল,—বেলা পড়ে এসেচে, তোমার খাবার সময় হলো।—

অমল কহিল,—শুধু সেবা?...যে রাজভোগ নিত্য মুখে তুলে দিচ্ছ, এর যে অনেক দাম···এত পয়সা তুমি আমার জন্যে খরচ করচো...

পাপিয়া সুদৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—হ্যাঁ, করচি...কি তুচ্ছ খরচের কথা বলচো···! আমি...কথাটা বলিতে গিয়া সে থামিয়া পড়িল। এ সে কি বলিতেছিল? ছি! তার এ দুর্ব্বলতা কি কখনো ঘুচিবে না? এই অভিমান, এই ক্ষোভ, এই রোষ···নিজেকে এমন করিয়াই যদি সে বলি দিতে আসিয়াছে তো ছোট্ট অভিমানটুকুকে এখনো ছাড়িতে পারিবে না? এখনো সেটাকে আঁকড়াইয়া রহিবে? এ কি নীচ মন তার!...না, এ অভিমান আর নয়!

পাপিয়া ক্ষিপ্র পায়ে উঠিয়া গেল। অমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাপিয়া অদূরে ঘরের কোণে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিল। তারপর তরকারী কুটিতে কুটিতে অমলের পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।—ও মুখ কি সার্থক-পুলকেই না প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—কপালে দীপ্তির কি রেখা জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ফুটিয়াছে—অধরে হাসির রেখাতেও সে দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে···! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, হায় রে, তার মত দুর্ভাগিনী কি আর কেহ আছে!

দুই-চারিদিন পরে অমল পাপিয়াকে ধরিয়া কলিকাতার কয়েকটা বইয়ের দোকানে চিঠি লেখাইল; সঙ্গে সঙ্গে কবিতার নকল করিয়া খাতাও পাঠাইল, যদি তারা সেগুলা লইয়া বই ছাপায়। যথাসময়ে সকলেরই জবাব আসিল,—এ-সব পাগলামির ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার তাদের মোটেই অবকাশ নাই!...এগুলা যা হইয়াছে, তা কবিতা নয়, উন্মাদের প্রলাপ! এ কথায় অমল একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল—তার অন্ধ নয়নের কোণে জল-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। দেখিয়া পাপিয়ার প্রাণটাও হা-হা করিয়া উঠিল—কিন্তু তৃপ্তিও যে একটু না হইল, এমন নয়।...বেশ হইয়াছে! তোমার চপলার পূজা যে এমন ঘা খাইয়াছে—এ বেশ হইয়াছে!···

কিন্তু আর একটা জায়গা হইতে জবাব এখনো বাকী আছে।

অমল কহিল,—সত্যবান লাইব্রেরী এখনো কোনো জবাব দেয় নি...তারা বোধ হয় নিতে পারে—কি বল, চপলা ?

পাপিয়া কহিল,—পারে বৈ কি। সবাই কি একরকম !

অমল কহিল,—কবিতাগুলো কি সত্যই কিছু হয়নি চপলা ?...ওগুলো কি সত্যই উন্মাদের প্রলাপ ? বল, তুমি বল...

পাপিয়া কহিল,—চমৎকার হয়েছে। কবিতা কি সকলের বোঝবার ! তা হলে আর ভাবনা কি ছিল···

অমল হাসিয়া কহিল,—কবিত্বং দুর্লভং লোকে···

পাপিয়া কহিল—তা না তো কি !

তবু শেষ আঘাতটিকেও ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সত্যবান লাইব্রেরীর চিঠিও আসিল। শুনিয়া অমল প্রদীপ্ত উৎসাহে কহিল,—পড়, পড়,—নিয়েচে কি না···

পাপিয়া চিঠি খুলিয়া পড়িল।—এও যে ছুরির ফলায় লেখা নির্ম্মম জবাব ! সব-চেয়ে নির্ম্মম ! সত্যবান লাইব্রেরী লিখিয়াছে,—

আপনার কবিতাগুলি ফেরত দিলাম। এ যে অমূল্য রচনা···এ ছাপিবার লোক এ দেশে মিলিবে না ! বিলাতে পাঠাইবেন। একদিন ইহার জোরে নোবেল প্রাইজ আপনার হাতে আসিবে। ইতি...

অমল কহিল,—তুমি চুপ করে রইলে কেন ? চেঁচিয়ে পড়···পড়চো না যে ! এরাও ফেরত দেছে, না...? আমি তা জানি...নিরাশার কালো কালি তার মুখে যেন কে নিমেষে লেপিয়া দিল ! সুগভীর ব্যথা এমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল যে পাপিয়া তাহা লক্ষ্য করিল ! ঐ ব্যথিত চিত্তে আবার আঘাত লাগিবে...আহা ! করুণায় তার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—না, না, ভালো চিঠি···এরা বই ছাপবে...।

—ছাপবে···? অমলের মুখের কালি বিদ্যুতের আলোয় চকিতে কোথায় সরিয়া গেল !

পাপিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

—কি লিখেচে, পড় পড়,···

পাপিয়া অমলের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর পড়িল,—

মহাশয়, আপনার কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে। আজ-কাল এমন কবিতা বড় দেখা যায় না। আপনার কবিতাগুলির অর্থ আছে এবং তার ভাবও খুব স্পষ্ট। এ বই আমরা ছাপিব। এ সম্বন্ধে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ইতি···

অমল সোচ্ছ্বাসে পাপিয়ার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল,—চপলা...

পাপিয়া কথা কহিল না—স্থির নেত্রে শুধু তার পানে চাহিয়া রহিল।

অমল কহিল,—আজ অন্ধ করে ভগবান আমায় এত সুখ দিচ্ছেন !...আমার সব কামনাই সার্থক হয়ে উঠচে... বলিয়া সে হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আমার নীরব পূজা যখন তোমায় বিচলিত করেছে, তখনই তো তা সার্থক হয়েছে···এ তো ফা'ও !..তা তুমি তাদের লিখে দাও... আমি অনুমতি দিলুম। আমি এক পয়সা চাই না বইয়ের দামের জন্য ! শুধু দু'খানি বই যেন তারা ছাপা হলেই পাঠিয়ে দেয়।···অমল আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পাপিয়া অবিচল নেত্রে তার সে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিল।... তার চোখের সামনে হইতে সব আলো কোথায় যেন মিলাইয়া যাইতেছিল ! এমনি খেলা খেলিয়াই তাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে...শুধু মিথ্যা—আগাগোড়া মিথ্যা দিয়া ! অথচ তার যেটুকু সত্য, যেটুকু খাঁটী—সেটুকু প্রাণপণে তাকে গোপন রাখিতে হইবে !...ভগবান, ভগবান, বুক যে ভাঙ্গিয়া যায় ! এ কি দুশ্ছেদ্য বন্ধনে তাকে আঁটিয়া বাঁধিতেছ...! আর যে সহা যায় না, প্রভু ! সহিবার সীমাও তো একটা আছে ! সে সীমা···

১৫

পাপিয়াকে একবার বাড়ী ফিরিতে হইল। টাকার দরকার—আরো ছোট-খাট নানা দরকার আছে। শিবুকে দিয়া খপর লইয়া সতর্ক হইয়াই সে বাড়ী আসিল। বাড়ীর লোক অমনি সহস্র প্রশ্নে তাকে ঘিরিয়া ফেলিল,—মানগোবিন্দ পাগলের মত আসা-যাওয়া করিতেছে—এক মুহূর্ত্ত সে সুস্থির হইতে পারে না...পাপিয়ার এ লুকোচুরি করার মানে কি ?...পাপিয়া যেন হাঁফাইয়া উঠিল। সকলকে বিদায় দিয়া সে একবার একা নিজের নির্জ্জন ঘরে বসিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে বুঝিবার চেষ্টা করিল।

যে তাকে চায়না, তার পিছনে এমন সর্ব্বত্যাগী, এমন ভিক্ষুক হইয়া কেন সে ফিরিয়া মরিতেছে ! তার একটু সুখের জন্য, এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই যে গভীর কাতরতা,...কেন এ···! তার যা কামনা, তা তো কোন দিনই মিটিবে না ! অথচ চপলার ছদ্ম আবরণে সোহাগের ঐ যে নানা কথা শোনা, আদর গ্রহণ করা...এতে বুক যে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে...পলে পলে মরণাধিক যন্ত্রণা সে ভোগ করিতেছে !...সে তো কতবার বলিয়াছে,—চপলা একটা তুচ্ছ গণিকা মাত্র, দাম লইয়া এই দেহ সে ভাড়ায় খাটাইয়াছে—যে আসিয়া পয়সা দিয়াছে, তারি কণ্ঠ ধরিয়া চপলা তার হইয়াছে—কত কুৎসিত, নীচ তার মন ! ভান অভিনয়ে প্রেমের লীলা দেখাইয়া কত লোককে সে চমৎকৃত করিয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে, আবার যখনই তাদের দিক হইতে আদায়ের সামান্য ত্রুটি ঘটিয়াছে, অমনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাদের বিদায় দিয়াছে, এবং নূতন লোকের মন জোগাইবার জন্য আবার সুচারু সাজে সাজিয়া, মিথ্যা কথার ফাঁদে নূতনকে ভালো করিয়াই বন্দী করিয়াছে !...এই মন-জোগানোর কাজে কোনো মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাকী রাখে নাই ! আগাগোড়া মিথ্যা অভিনয় করিয়া করিয়া তার ভিতরে সত্য যেটুকু ছিল, সেটুকুকে কবে যে সে বাহির করিয়া দিয়াছে, তার কোন ঠিকানাও নাই—এখন অন্তরে-বাহিরে মিথ্যাচারী হইয়াই সে পড়িয়া আছে ! ...তবু এই মিথ্যাকেই অমল এমন করিয়া আদর করিবে, পূজা করিবে ...!

অমল তবু বলিতেছে—এই মিথ্যাই তার কাম্য, এই মিথ্যার পায়েই সে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছে, এই মিথ্যাই তার সব ! এ মিথ্যা ছাড়িয়া এত বড় বিশ্বের কোথাও যদি এতবিন্দু সত্য থাকে, অমল তা চায় না, চায় না, চায় না !···এ কি সর্ব্বনেশে সৃষ্টিছাড়া মোহ অমলের !

···কিন্তু সে যাই হোক, নিজে যে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল, —সেবা করিয়া নয়, এই ছদ্ম মিথ্যা ভূমিকার অভিনয়ে তার দেহ-মন যে বিপুল শ্রান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে !···আর এ যে ভালো লাগে না, ভালো লাগে না গো···

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে বসিল।···ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—না, তার দূরে থাকিবার উপায় নাই ! তাকে ফিরিতেই হইবে ! অমলের ঐ নিষ্ঠাই তাকে সেখানে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হোক্ এ মিথ্যা অভিনয়, প্রকাণ্ড ছলনা··· তবু ঐ অন্ধ ব্যথিতের কাছ হইতে এই ভূমিকার ছদ্ম বেশ পরিয়া চপলা সাজিয়া যেটুকু সে পায়, তা যে প্রাণের নিষ্ঠায় ভরপূর, তা যে সত্য, সার,···সেটা রূপ-বিলাসীর মোহ নয়, মাতালের নেশার ঘোর বা পয়সার পণ্যও নয় !...সেই খাঁটি বস্তুটুকু পাইবার জন্য আহত রক্তাক্ত হইলেও তার মন সেইটুকুরই কাঙাল যে ! এই নিষ্ঠাই যে তাকে বিচলিত করিয়াছে, তাকে বিপুল ঐশ্বর্য্যেভরা রাণীর আসন হইতে জীর্ণ কুটীরে ভিখারিণী দাসীর আসনে টানিয়া বসাইয়াছে ! তাতেই সুখ !···তাতেই সে যে সুখ পাইয়াছে, তার আর তুলনা নাই !...মনটা মাঝে মাঝে নৈরাশ্যের ব্যথায় ঝরিয়া পড়িবার মত হয়, বেদনায় টাটাইয়া ওঠে, ক্ষোভের ঝড়ে মনটা কাণায়-কাণায় ভরিয়া যায়···তা হোক,...তবু উপায় নাই, কোন উপায় নাই।···

কিন্তু তার দিক হইতেও যে এতখানি নিষ্ঠা, এতখানি সত্য সেবায় অমলকে সে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, এর কি কোন দাম নাই !...অমল কি এটা বুঝিবে না···? তার চোখের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু মন···? মন তো অন্ধতায় ঢাকিয়া যায় নাই ! যদি সে কোনদিন বুঝিতে পারে, যাকে সে হেলায় অনজ্ঞায় উপেক্ষায় বিঁধিয়া কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে উপেক্ষার ক্ষোভ গ্রাহ্য না করিয়া সে-ই আসিয়া তার এ দুর্দ্দিনে সেবায় তাকে তৃপ্ত করিয়াছে, কোনদিকে তার কোন অভাব রাখে নাই···এবং সে চপলা নয়, চপলা নয়, পাপিয়া... পিয়ারী বিবি ! তার সেবায় নিজেকে ঢালিয়া দিতে পাপিয়া আজ সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে···আর এই সেবাই সে তার বাকী জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ...স্বেচ্ছায়, আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে...তাহা হইলেও কি তার প্রতি—সে যা তাই—এই পাপিয়ার প্রতি অমলের বিমুখ মন প্রসন্ন হইবে না···!···ভাবিতে ভাবিতে আশার পুলকচ্ছটায় পাপিয়ার মন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল !···

তা যদি হয়...আঃ ! তাহা হইলে এই ছদ্ম ভূমিকার কুৎসিত খোলসটা টানিয়া দূরে ফেলিয়া প্রাণে মনে কেবলি সত্যের দীপ্ত রাগ মাখাইয়া তার সেবাকে সে আরো সুন্দর, আরো সার্থক করিয়া তুলিতে পারে...!

চপলার উপর তার রাগ ধরিল। এত-বড় পাষাণী সে—

বিলাসের যত-মস্ত উপাসনাই করুক, তবু সে নারী তো! নারীর প্রাণটাকে একেবারেই সে এই কুৎসিত জঘন্য লালাসার বিষে জর্জ্জরিত করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে...! পাষাণী, পাষাণী, শয়তানী সে...!...কিন্তু তার কথা যাক...! পাপিয়া এখন কি করিবে? কিসের আশায় সে এমন অন্ধ আবেগে সেখানে ছুটিতে চায়!...মরীচিকা... মরীচিকা—আলেয়ার আলোয় মাতিয়াই থাকিবে সে চিরদিন ..!

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিল।...তাছাড়া উপায়ও তো নাই! বিলাসের আহ্বানে যে-পথে সে প্রথম যাত্রা সুরু করিয়াছিল, সে পথে শুধুই আলেয়া! ধন, জন, ঐশ্বর্য্য .. ? কি তুচ্ছ বস্তু এগুলা!...মনকে তার যোগ্য খোরাকে বঞ্চিত করিয়া কি তুচ্ছ ধন-জনের পিছনেই সে ছুটিয়াছিল! প্রথম যৌবনে জীবন যখন প্রাণের মধ্যে দীপের শিখা জ্বালিয়া দিল, সে আলোয় চারিধার যে আলো হইয়া উঠিয়াছিল... হায় কোথায় গেল সে দীপের সে স্নিগ্ধ আলো!.. ঝড়ের মত লোকের পর লোক আসিয়াছে, হাতে নগদ দাম লইয়া... আর সে এই জীবন-পুষ্পটিকে লইয়া চড়া দামে বাজারে বেসাতি করিয়াই চলিয়াছিল...! সেই সুন্দর শুভ্র প্রাণটাকে বাজারের ভিড়ে কি ধূলা, কি কালি মাখাইয়াই না মলিন কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছে...!

তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল...সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি আজ প্রথম যৌবনের সেই শুভ্র নির্ম্মল মুহূর্ত্তটিকে ফিরাইয়া পাওয়া যাইত, ভগবান! সে আজ দুর্লভ, অতীত, সুদূরের ..একটা জন্ম দিলেও বুঝি সে মুহূর্ত্তটিকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না!...

অবসাদে পাপিয়ার মন ভরিয়া উঠিল। নির্জীবের মত বালিশে শ্রান্ত শির রাখিয়া পাপিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।...

তারপর বহুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া সে দেখে, কৌচে বসিয়া মানগোবিন্দ। মানগোবিন্দের চোখের দৃষ্টি বিষাদের ব্যথায় শুষ্ক, মলিন। পাপিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদিল।... আবার সেই পুরানো নাগপাশের বাঁধন, বিলাসের শিকল তার দুই পা বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে! ধড়-মড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল। মানগোবিন্দ ডাকিল,—পিয়ারী...তার স্বর যেন কোন্ বহুদূরের অতল কোণ হইতে ভাসিয়া উঠিল।...হারানো স্মৃতির রেশের মতই সে ডাক!...

পাপিয়া কহিল,—কি?

মানগোবিন্দ উঠিয়া তার হাত ধরিল, করুণ আর্ত্তস্বরে কহিল,—আমি কি কোনো অপরাধ করেচি পিয়ারী যে, এ-ভাবে আমায় দগ্ধাচ্ছো!...

উচ্ছ্বসিত স্বরে পাপিয়া কহিল—না, না...তবে বলেচি তো ছুটী, ছুটী! ওগো দুদিনের ছুটী দাও আমায়! তোমার তৃপ্তির জন্য একেবারে কিছু না রেখে ঢেকে আমি আমার সব তোমায় সমর্পণ করেছি, তার জন্য দু'দিন আমায় ছুটী দাও। বাড়ীর চাকর-বাকরও দুদিন ছুটী চাইলে পায়...সে ছুটী আমি কি দুদিনের জন্যও পেতে পারি না...?

মানগোবিন্দ কহিল,—তাহলে এ বিচ্ছেদ চিরদিনের নয়...? বল,...আশা দাও...

পাপিয়া কহিল,—যদি বলি, না—বিশ্বাস করবে?

মানগোবিন্দ কহিল,—তোমার কথা বিশ্বাস করবো বৈ কি! কোনদিন অবিশ্বাস করেছি?

পাপিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে জানে, এখানে এখন 'হাঁ' বলিলে মানগোবিন্দ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিবে,—তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন শিকলে বাঁধিবে যে, তার মুক্তির আর কোন আশা থাকিবে না! উপায়.. ?

সে বলিল,—আমাকে বিশ্বাস...? নিত্য যে ছলনার কারবার করচে—মিথ্যা দিয়ে যার আগাগোড়া ভরা... তাকে বিশ্বাস? এ যে পাগলের কথা...

মানগোবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল, কহিল,—তবু তোমায় বিশ্বাস করবো! আমি যে তোমায় ভালবেসেছি পাপিয়া...শেষের দিকটায় মানগোবিন্দর স্বর আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিল, পরে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—বিশ্বাস যদি কর, তাহলে বাধা দিয়ো না। আমায় একটু একলা নিজের মনে থাকতে দাও।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মানগোবিন্দ কহিল,—তাই হোক পাপিয়া!...আমিও ঢের ভেবেচি এ সম্বন্ধে। ভেবে কি দেখেচি, জানো?...তোমায় যে এতদিন ভালোবেসে সুখী হয়েছি, সে সুখ তোমার জন্যে নয়, আমি যে

ভালবাসতে পাচ্ছি, এই ভেবে। তোমায় জিনিষ দিয়ে টাকা-কড়ি দিয়ে সুখ পেয়েছি এই ভেবে যে, তোমায় এ-সব দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—দিতে পারায় সেই তৃপ্তি! তোমার মুখে হাসি দেখে সুখী হয়েচি—কেন না, ও হাসি আমার ভালো লেগেচে বলে!—আমার প্রাণের বাসনা চরিতার্থ হচ্ছে, এই সুখেই আমি বিভোর ছিলুম। এ ক'দিনের অদর্শনে ভেবে দেখলুম, এই যে ভালো বেসেচি, সুখ পেয়েচি, এ তো নিজেকেই তৃপ্ত করেচি মাত্র... যখনই দরকার বোধ করেচি, তোমার মুখ থেকে হাসি লুঠ করেছি, গহনা ঘুষ দিয়ে খুশী আদায় করেচি...কিন্তু এ কথা তো কখনো ভাবিনি যে তুমি এ প্রাণের হাসি হাসচো কি না, এ হাসি হাসতে তোমার কোথাও বাধচে কি না! মনে এ প্রশ্নও তুলিনি কোনদিন যে, এ হাসি বুকের রক্ত নিঙড়ে তুমি আমার ক্ষুধিত তৃষিত চোখের সামনে মনের সামনে ধরে দিচ্ছ! তোমায় দিয়ে নিজের সুখই পেয়েছি শুধু পাপিয়া, নিজের সুখ পেয়েই সব পেয়েচি—তোমার মুখের পানেও চাইনি, তোমার সুখও চাইনি কোনদিন...

মানগোবিন্দ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া অবাক হইয়া গেল। মানগোবিন্দ এত বড়! ...এই যে মধুপিয়াসীর দল নিত্য আসিয়া ভিড় বাধাইয়া কাণের কাছে গুঞ্জন তোলে,—ভাবিয়া দেখিবার যাদের শক্তি নাই, শুধু মুখের গুঞ্জন-গানটাকেই যারা সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে, তাই দিয়াই যাদের আগাগোড়া তৈরী...মানগোবিন্দ তাদের দলে নয়! তা নয় সে, সত্য! তা হইলে সে জোর করিয়া পাপিয়াকে করতলগত করিয়া রাখিত!...মানগোবিন্দর উপর শ্রদ্ধায় তার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

মানগোবিন্দ কহিল,—তুমি ছুটী চাইছো, আরামের জন্য...বেশ, ছুটী মঞ্জুর!...এতদিন আমায় কত সুখে যে সুখী করেছ, যে-ভাবে চেয়েছি, সেই ভাবে তৃপ্তি দিয়েছ... কখনো তোমার মনের দিকে তাকাইনি। সেখানে যে কোন অনুযোগ উঠতে পারে,তা ভাবিও নি!...এ কি ভালোবাসা ...শুধু দস্যুর মত তোমায় লুণ্ঠন করেছি, ক্রেতার মত মূল্য দিয়ে তোমার প্রীতি পণ্য ভেবে তা জোর করে কিনে উপভোগ করেছি...তুমি গণিকা, পয়সার দাসী, পয়সা ফেললেই তোমায় কায়-মনে অধিকার করবো...এই ভেবে তোমার ভিতরটাকে উপেক্ষা করে উপরটাকে নিয়েই তুষ্ট হয়েচি, তৃপ্তি পেয়েচি! ছি, এ কি মানুষের কাজ!...তুমি যে নারী, কোন দিন সে কথা আমি ভুলেও ভাবিনি। পাপিয়া, এই অদর্শনে তুমি আমার মনুষ্যত্বকে চেতনা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছ, তার জন্য তোমায় শত শত ধন্যবাদ দি...তোমার ছুটী মঞ্জুর করলুম। আরো শোনো, তোমায় যা যা দিয়েছি, তোমার নারীত্বের মূল্য-হিসাবে তা কতটুকু, কত তুচ্ছ! এ সব তোমারই...তবে আমায় এটুকু অনুমতি দাও যে, এই ঘরে যেন শ্রান্ত হয়ে আমি জুড়োতে আসতে পারি...আর কখনো যদি মনে পড়ে, তাহলে আমার কাছে আবার এসো! কোন দরকার মনে কর তো আমায় ডেকো!...জেনো, তোমায় খাঁটী ভালোবাসা বাসার জন্য একটা হৃদয় এখানে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমার সে আহ্বানটুকু পাবার আশায় বসে থাকবে, চিরকাল, যুগ যুগ ধরে। ...দেহটা কিছু নয় পাপিয়া...তোমার ঐ মন যেদিন স্বচ্ছন্দ সহজভাবে গ্রহণ করার যোগ্য হবো, জানি, সেদিন তোমায় আমি প্রাণের মধ্যে সত্যই পাবো!...

পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিয়া রহিল, তেমনি স্থির অবিচল দৃষ্টিতে।...এ কি সম্ভব! এই মানুষ, যাকে সে শুধু পয়সা আর গহনা উপার্জ্জনের একটা নির্জীব যন্ত্র মাত্র মনে করিয়া চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, মনের দ্বারেও যাকে ঘেঁষিতে দেয় নাই কোন দিন...এত বড় মানুষটা তারি বুকের কোণে লুকাইয়া ছিল!...হায়রে মধুপিয়াসীর দল, তোরা এমন মূঢ় যে, এ বুঝিস না, পতিতা, গণিকা হইলেও আমরা নারী! নারী পুরুষত্বের পায় চিরদিন নিজেকে বিকাইবার জন্য অধীর আগ্রহে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে,—তোরা দেহটা লইয়া এমনি প্রমত্ত থাকিস যে দেহের আড়ালে মন বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, তার খেয়ালও রাখিস না, সে-মনের সন্ধানও নিস না! পৈশাচিক তাণ্ডব লীলায় নারীর প্রাণ ছেঁচিয়া তার দেহের সৌরভ লুঠিতে আসিস, যৌবনের মধু আহরণ করিতে আসিস! মূঢ় বাতুলের দল...তার ফলে পাস্ কি? কঙ্কালের কুৎসিত অট্টহাস আর ঘৃণার জঘন্য পরশ! এ মুহূর্ত্তে কাছ হইতে চলিয়া গেলে পর-মুহূর্ত্তে তোদের স্মৃতিও এখানে পড়িয়া থাকে না—তোদের মত নূতন

অতিথির মূঢ়তার বুকের উপর আমরা চপল নৃত্য জুড়িয়া দি!...

মানগোবিন্দ বলিল,—কি ভাবচো পাপিয়া?

পাপিয়া কহিল,—ভাবচি···তুমি এত বড়, তা তো এতদিন জানতে পারিনি:..

মানগোবিন্দ কহিল,—আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি পাপিয়া, আমার মনের এ ভাব দেখে। আমি যে নিজের সুখ ছাড়া আর কারো সুখের কথা ভাবতে পারি, এ আমিও জানতুম না!...চিরদিন নিজের সুখ চেয়ে এসেছি, আর সে সুখ পাবার জন্য অপরকে মাড়িয়ে ঠেলে যদি ছুটতে হয় তো তা ছুটতে দ্বিধাও করিনি কোনদিন... কিন্তু তুমি এই ক'দিনের অদর্শনে আমায় নতুন করে গড়ে তুলেছ!...প্রথম প্রথম কি মনে হতো, জানো...? প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল,—কি?

মানগোবিন্দ বলিল,—ভাবতুম, দুনিয়া ওলোট-পালোট করে তোমায় খুঁজে বার করি···তারপর তোমায় সাজা দি! রাজার ঐশ্বর্য্য এনে তোমার পায়ে ঢেলে দিছি, এত সুখে তোমায় রেখেছি আমি,—আর তুমি আমার পাশ কেটে সরে যাবে...! কিন্তু একটা ঘটনা হলো,—মনের এই জ্বালা নিয়ে যখন অস্থির আকুল, তখন আমার এক ছেলের খুব অসুখ হলো। আর সে অসুখে সে বায়না নিলে, আমায় তার চাই, সর্ব্বক্ষণ! শিশুর সে অস্থিরতায় তার পাশেই পড়ে রইলুম...তার সে যাতনা দেখতে দেখতে মনটা কখন যে বদলে গেল···তোমার সন্ধানে নিবৃত্ত হলুম, ভাবলুম, যদি এততেও তাকে ধরে রাখতে না পারলুম,তাহলে এ টানা-হেঁচড়া করে কি ফল! সে তাহলে পাবার নয়!...

পাপিয়ার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। সে একেবারে মানগোবিন্দর পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তস্বরে কহিল,—আমায় মাপ কর। তোমার দেওয়া সব তুমি ফিরিয়ে নাও গো···আমি বেইমান, বিশ্বাসঘাতক... তোমার এ দান গ্রহণের যোগ্যতা আমার নেই...এ দানের বোঝা নিয়ে তার অপমান করারও আমার কোন অধিকার নেই!···

মানগোবিন্দ পাপিয়ার হাত ধরিয়া উঠাইল, কহিল,—না পাপিয়া, সে কথা তো আমি বলিনি। আমি শুধু বলচি, অন্ধতা ঘুচিয়ে তুমি আমার চোখ ফুটিয়েছ!···তোমার কাছে এসে, তোমায় পাশে পেয়ে, কত সুখই পেয়েছি আমি! তবু আজ মনে হচ্ছে, সে সুখ কি ঠিক সুখ!...যার কাছ থেকে বন্যার মত এ সুখ পাচ্ছি, সে স্বেচ্ছায় সে-সুখ দিচ্ছে, না, সে-সুখ আমি জোর করে আদায় করছি!···তাতে সুখে সুখ থাকে না, পাপিয়া!...তাই বলছিলুম, যদি কোনদিন স্বেচ্ছায় আমার সুখের জন্যে নিজেকে তুমি আমার হাতে তুলে দিতে পারো···বলেচি তো, সেই সুখের আশায় আমি প্রতীক্ষা করে থাকবো!...যদি এই প্রতীক্ষা করেই আমার জীবনের সব দিন কেটে যায়, তবু কাতর হবো না··· নিরাশও হবো না আমি, পাপিয়া···করুণ প্রাণের এ অধীর আকুলতা কি ব্যর্থ হবার?···না।

পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। নয়, ব্যর্থ নয়! প্রাণের অধীর আকুলতা তবে ব্যর্থ হয় না!···তার...তারও তবে আশা আছে!...

পাপিয়া মানগোবিন্দর পায়ের কাছে প্রণাম করিল, বলিল,—বেশ, আমিও কথা দিচ্ছি, যেদিন নির্ম্মল শুদ্ধ মন নিয়ে তোমার এ মনুষ্যত্বের পূজা করবার জন্য একটুও চঞ্চল হবো, সেদিন আসবো, তোমার পায়ে নিশ্চয় সেদিন ফিরে আসবো!...আর এই যে ছুটী আমায় দিলে তুমি, এর জন্য, নারী আমি, পতিতা নারী—তবু ভগবান যদি আমায় ঘৃণা না করে আমার ডাক শোনেন, তাহলে তাঁর পায়ে আমার অন্তরের প্রার্থনা জানাচ্ছি, তোমার জীবন সার্থক হোক্, পূর্ণ হোক, পরিতৃপ্ত হোক্!...

কথাটা বলিয়া পাপিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। মানগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল,—তাহলে এ আমাদের চিরবিদায় নয়...?

পাপিয়া কম্পিত দৃষ্টিতে মানগোবিন্দর পানে চাহিল,—ও চোখে কি বিশ্বাস, কি তৃপ্তি···! সে কোন কথা না বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মানগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর শয্যায় দেহভার লুটাইয়া দিয়া অবোধ বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৯)

অমৃতকুণ্ডে-পাওয়া ওভারকোট আঁটা, "লাগাম-লাগানো মোজা" পায়, স্বদেশ-প্রাণ বাবু তিনটির কর্ম্মপরিচয় পাইবার জন্য সত্যই একটু কৌতূহল ছিল। নির্দ্দিষ্ট স্কুলটিও ছিল আমাদের বাসার নিকটেই। বেলা আট্‌টার মধ্যে প্রধান প্রাতঃকৃত্য—চা পানটা কচুরী অনুপান সহ সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। জয়হরিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যাবে কি?" সে বলিল "আমাকে ত' যেতেই হবে, এঁদের জন্যে ভদ্রলোকদের কাল ক্ষুণ্ণ করেছি, আজ কি আর না বলা চলে।"

বলিলাম, "এদের জন্যে কেন?"

"রাঙা আলু যে লোহার সিন্দুকে রাখবার জন্যে লোক কেনে তা কি করে বুঝব বলুন। যাক্—এরা এখন এলে হয়!"

পথে আর কথা বাড়াইলাম না। ইস্কুল কম্পাউণ্ডে গা দিয়া বলিলাম, "তাঁরা যদি আজ কিছু না বলেন ত' যেওনা।"

"সে কি মশাই, ভদ্রলোকের এক কথা—আবার বলবেন কি?"

তখন হলে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ও কথা বন্ধ করিতে হইল।

দেখি তিরিশ চল্লিশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁরা সবই পোষ্ট-আফিস মজলিশের মেম্বার; তদ্ভিন্ন ইস্কুল মাষ্টার প্রভৃতিও আছেন। চেয়ারগুলি সবই ভর্ত্তি, বেঞ্চে যথেষ্ট স্থান আছে। টেবিলের আস-পাশের চেয়ারে বাবু তিনটি উপস্থিত। বোধ হইল একজন কিছু বলিতেছিলেন, চোখোচোখি হইতেই সহাস্য ইঙ্গিতেই আহ্বান করিলেন। চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধ করায় জয়হরি "বাপরে!" বলিয়া একটি ছোট্ট নমস্কার নিবেদন করিয়া টেবিলের নিকটস্থ বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। আমি ধীরে জানাইলাম—"বড় কাহিল আছি, ফেরবার পথে "হোমো গ্লোবিউল্" নিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া আমিও বেঞ্চ লইলাম। বাবুটি আর জেদ্ না করিয়া একটু হাসিয়া জানাইলেন, "এটা "কুণ্ডু-কেবিন্" নয়!" তাহার পর তাঁহার প্রারব্ধ বক্তৃতা চলিল।

শুনিব কি, সামনের চেয়ার হইতে এক চেহারা এক সেলাম আর "একটু ভাল করে শুনে লবেন বাবু"—লাভ হইল। এই ঘটনায় ভাল করিয়া শোনা অপেক্ষা তাহাকে আমার ভাল করিয়া দেখার কাজটাই আরম্ভ হইয়া গেল। লোকটি গৌরবর্ণ, হাড় ও শিরা-প্রধান, বিরল কেশের উপর ফেজ ক্যাপ্, কটা গোঁপ দাড়ী—যেন গজাবার মুখেই বাধা পাইয়াছে ও স্থানে স্থানে ঝরিয়া গিয়াছে! কপাল কপোল মায় মুখ চোখের দুই পাশ গিলে করা,—বেশ Furrowed বা finely corrogated। গায়ে গরম খাকী কোট। এক হাতে হলদে পেড়ে নোট্ বুক, অন্য হাতে আধখানা পেন্সিল্।—বয়েস পঁয়ত্রিশও হতে পারে—পঞ্চান্ন বল্লেও কেউ সন্দেহ করবেন না।

আমি অবাক হইয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। দেখি চক্ষু বুজিয়া নোট-বুক ভর্ত্তি করিয়া চলিয়াছে,—ক্ষমতা অসাধারণ! আবার লেখা অপেক্ষা পেন্সিল্ চলিতেছে গায়েই বেশী। কখনও দুই রগে, কখনও গালের দুই পাশে, কখনও গলায়; কখনও কানে, কখনও টুপীর ভিতর, কখনও আস্তিনের মধ্যে! আবার নোট-বুকে ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি মিনিটে সে এতগুলি কাজে ব্যস্ত। এ কে? এদিক ওদিক ফিরিয়া দেখি—লোকটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চুপি চুপি তাহার আলোচনাই চলিয়াছে। একজন বলিতেছেন, বুঝছেন না, লোকটা কোকেনের কুম্ভকর্ণ,—ও জিনিষের Symptomই ওই।" এমন সময় একটা জোর "hear" "hear" শব্দ হওয়ায় আমি বক্তৃতার দিকে কান দিলাম। বক্তা বলিতেছেন :—

"জগতে লোকে কি চায়,—শান্তি। ইংরাজীতে একটা সেরা কথা আছে—one who laughs last laughs best—মরবার সময় যে হাসতে পারে তার হাসিই হাসি ও সে হাসি লাভের কাছে কাশীলাভও লাগে না। কিন্তু সে হাসি লাভ করবার উপায় আমাদের পনের আনা লোকের জানা নেই। আমরা আমাদের গরীব দেশের দুস্থ ভ্রাতাদের জন্য সেই হাসির ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছি। এখন আপনারা আমাদের হিতেচ্ছায় সহায় হউন, ভগবান আপনাদের সেই বুদ্ধি দিন—এই আমাদের প্রার্থনা। কয়েকটি দেশপ্রাণ হিতৈষীর হেফাজতে "দারিদ্র্য দমন বীমা সংঘ" নামে একটি খাঁটি স্বদেশী সংঘ খোলা হয়েছে, যার রাশ-নাম "স্বদেশী সোসিও ইকনমিক প্রপেগেণ্ডা।" এখন এগিয়ে আসুন, আমাদের এই সংঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তির সম্বল সঞ্চয় করুন। আর বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। একটা Premium দিয়া (পিণ্ডদান করে) মলেও স্ত্রীপুত্র-দের হাসি মুখ দেখে,—দেশের টাকা দেশে রেখে, হাসতে হাসতে রওনা হতে পারবেন। আমরা অন্ততঃ দশ হাজার টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর,—ডাকাতি করেও যা জমা করতে পারবেন না। দশহাজার টাকা হাতে তুলে দেয় এমন দেশ-প্রাণ লোক আর পাবেন না।

"মলেই টাকা। রবিবাবুর মত বিশ্বমানব তানাত কখনই বলতেন না "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।"

"মৃত্যু মৃত্যু বলে' পূর্ব্বে একটা মিছে ভয় ছিল বটে, কিন্তু বাঙলাদেশের লোক এখন বুঝেছে, মৃত্যুর মত বন্ধু আমাদের আর নাই। তারা বেশ জেনেছে, তারা জন্মেই মরে আছে, কেবল হাড় কখানা চরে বেড়ায় আর চোখের জলে সেগুলোকে জুড়বার বৃথা প্রয়াস পায়। তাই কবি বলেছেন—"মরে বেঁচে কিবা ফল—আগে চল—আগে চল।" এখানে আগে মানে উর্দ্ধে অর্থাৎ ঠিকানায়। (hear hear)

"আমার এই আজানুলম্বিত দক্ষিণহস্ত সম প্রিয় সহচর করুণানন্দ সেদিন সহসা শপথ করে বসেছে,* এতেও যদি আপনাদের সুমতি না হয়, সে নারী বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে। ভগবান্ আপনাদের সে বিপদ হতে রক্ষা করুন। আবার আমার করি-শুণ্ড-লাঞ্ছন রাম-হস্ত-সদৃশ এই যে রামকিঙ্কর চুপটি করে বসে রয়েছে, ওকে আপনারা চেনেন না। ও একটি ডিনামাইটের পুঁটলি। আমাদের সদুদ্দেশ্য দেশের লোক যদি না বোঝে, আমাদের সদুপদেশ যদি না গ্রহণ করে, ও ঘরে-বাইরে আগুণ লাগাবে বলে কড়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। যাক্—সে সব কথার এখন্ সময় আসেনি। না এলেই আপনাদের মঙ্গল।

"এখন আশা করি দেশের মুখ চেয়ে আর আপন আপন স্ত্রীপুত্রের মুখ চেয়ে আপনারা সকলেই এই বীমাকে বরণ করে নিয়ে শান্তিলাভ করতে অগ্রসর হবেন। মনে রাখবেন, যতদিন না আপনারা প্রত্যেকে মরচেন ততদিন দেশের—প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্রের সুখ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। আমাদের একটি মাত্র Premium দিয়ে গেলেই হবে। আর ইতস্ততঃ করবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু।

চায়ের-দোকানে-পাওয়া এই ত্রিমূর্ত্তির দেশের কাজের পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ করুণানন্দ ও রামকিঙ্করের নিদা-রুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় মিটিং গা নাড়া দিল,—কারণ Post officeএ window deliveryর (চিঠি বিলির) সময় আসন্ন। একজন বায়ুভুক্ প্রৌঢ় উকীল দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেশে অল্পের মধ্যে এমন সুমধুর কাজের কথা কমই শোনা যায়। আপনাদের স্বদেশ-সেবা সফল হউক। আমাদের অর্থাৎ যাঁদের মৃত্যু কাম্য তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের কাজ হয়েই গেল, এখন আপনাদের একটু কষ্ট স্বীকার করে লোকের বাড়ী বাড়ী যাওয়াটা আবশ্যক হবে। কারণ আমাদের জীবন-স্বত্বাধিকারী ও মরণ-উপস্বত্বভোগীরা সেখানে থাকেন। তাঁদের অনেকেই দশ হাজার টাকার bargainটা (দাঁওটা) সাগ্রহে এগিয়ে নেবার জন্যে আপনাদের সদুদ্দেশ্যের সম্যক্ সহায়তা করতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে তাঁদের ইচ্ছা ভগবৎ-ইচ্ছা অপেক্ষা বলবৎ;—আপনাদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না। আমি আপনাদের কাজের মধ্যে খাঁটি মহাপ্রাণতার স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাচ্ছি, কারণ আমাদেরও ওই কাজ। কোর্টে হলে এই পরামর্শটি ছাড়বার জন্যে চল্লিশটি টাকা নিতুম, কিন্তু কাকের মাংস কাকে খায় না। এখন আপনাদের ধন্যবাদান্তে আমরা চল্লুম।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং করতালি দিতেই

একটা করকাপাত হইয়া গেল। সভাও ভঙ্গ হইল।

(৪০)

সহসা আমার হাঁটুতে হস্তক্ষেপ! দেখি সেই মূর্ত্তি ব'লচে "মেহেরবাণী করে দু'মিনিট বসেন বাবুজী, বড় একটা বেওকুবী হয়ে গিছে, গল্‌তিটে শুধুরে লি।"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লে "কর্ত্তা প্রাচীন লোক, আপনাকে কইতি আর সরম কি; বান্দা তো আপনার বাচ্চা! মোদের কাম রেতেই বেশী, লিদ্রের ফুরসদ্ নেই,—কামেরও ঠিকঠিকানা নেই।—সার্ভে ং (surveying), ফুটোগ্রাপী বি, টেলিগ্রাপী বি, এক্ষেনে সর্টহাণ্ড রিপোর্টারের (shorthand reporterএর) কামে আস্‌ছি। বহুত ইলেম জাস্তি হয় জনাব। আজ লিদ্রের ঝোঁকে হুঁস ছিল না। ইলেমে ইলেমে টক্কর লেগে সব গড়বড় করে দিছে। সর্টহাণ্ড সুরু করলাম, তারপর তাখছি টেলিগ্রাপীর "টরে টক্কা" লাগাইছি,—ইটার মধ্যে উটা ঘুসে গোল পাকিয়ে দিছে! দুটাই ইলেক্ আর লোক্তার ইলেম্ কি না, দুই শয়তানই এক দরজার! তোবা তোবা—ব্যাবাক টরে টরে টক্কায় নোটবুক ভরচি!"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া, মুখে চিন্তার ভাব আনিয়া বলিলাম "তাইত, এতটা পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল!"

সে বলিল "আপনাদের দুয়ায় আজ লাগাৎ বান্দার পরিশ্রম কখনো বৃথা হয় নি,—ও সব ঠিক্ করে লবার ইলেমও গোলাম আলি জানে। ও আর ভরে লতি কতক্ষণ! জনাব ত সব্ শুনেচেন। মেহেরবাণী করে দুচারটে কথা মদদ্ (সাহায্য) করলেই বাকী সব গোলাম লেগিয়ে লেবে। ও সব পুলিটিক্কেল বক্তারদের রা মোদের বহুত জানা আছে হুজুর,—একটা লেগিয়ে দিলেই চলে যায়। দুচারটে জবর জবর লবজ্ পালেই হবে।"

বলে কি! এতে পলিটিক্স্ পায় কোথায়! তাহাকে বলিলাম, "ওতে তো পলিটিক্সের কিছু পেলুম না; বক্তা তো বললেন 'সত্বর সকলে জীবনবীমা করে ফেলুন; মলেও স্ত্রীপুত্রের উপায় থাকবে। দশ হাজার টাকা ডাকাতি করেও মিলবে না। আবার যে যত শীঘ্র মরবে তার তত লাভ! ওঁদের—খাঁটি স্বদেশী সঙ্ঘ, দেশের মঙ্গলের জন্যে দেশপ্রাণ লোকদের ওই সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তিতে স্বর্গলাভ করবার দরকার হয়েছে। নচেৎ, ওঁর বন্ধু করুণানন্দ নারী বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে বাধ্য হবেন, আর ওঁর দ্বিতীয় সঙ্গী রামকিঙ্করটি—একটি ডিনামাইটের পুঁটলী, সে রাগলে লঙ্কাকাণ্ড করবেই। তবে তাঁদের সঙ্ঘের মারফত্ সকলে জীবন উৎসর্গ করলে দেশটা অগ্নিকাণ্ড এড়াতে পারে।"

গোলাম আলি বাধা দিয়া বলিল, "বহুত সেলাম বাবুজী—আর লয়; পেল্লায় মাল হাত লাগছে। ইতেই তাজমহল বন্‌তি পারে। সঙ্ঘ আছে, তাশের মঙ্গল মজুদ্, জীবন উচ্ছগ্য আছে, ডাকাতী আছে, স্বর্গ লাভের লালচ আছে, ডিনামাইট রইছে, অগ্নিকাণ্ড রইছে—প্রতিজ্ঞাভি রইছে! আপনি পুলিটিক্স কারে কন কর্ত্তা? মোরা চেহারা দেখলিই মালুম পাই। এখন রিপোর্ট ছকৃতি আধাঘণ্টাও লাগবেক না। বহুত স্যালাম বাবু।"

আমি মনে মনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেবের কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা হয়,—এ রিপোর্ট যাবে কোথায়?"

গোলাম আলি সাহেব বলিলেন "নসিব বাবু সাহেব—নসিব; কাযের কি কদর আছে জনাব। খোদা মালিক, ইনাম্ থাক্‌লি জঙ্গলেও রুটি মিলবে! এখন প্রাইবেট্ কাম লিয়ে আছি। আকবরে রিপোর্ট পেটিয়ে দিই। জবর চিজ্ পালি বিশটাকাও মেলে। গোলামের উপর বড় বড় কাগজের এতবার আছে। তারা সমজদার আছে, লায়েক লোক চট্ চল্‌তি পারে। আপনাদের দুয়াতে ভালই চলে যায়। জনাবের ইখানে কোথা থাকা হয়? আপনি রিপোর্ট দেখলিই বান্দার ইলেম্ বুঝতি পারবেন,—একবার লয়ে যাব।"

জয়হরি উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল, সে সত্বর ও সটান বলিল—"আমাদের বাসা খুঁজছেন? উইলিয়ম টাউনে জিজ্ঞেসলেই হবে—রায় সাহেব কোথা থাকেন।"

লোকটা শুনিয়া দুহাতে সেলাম করিয়া বলিল, "গরীবের গোস্তাকী মাপ করবেন, বান্দার বহুত বেয়াদবী হয়ে গিছে,—তা আপনি তো মোদেরই বড় ভাইজান লাগেন্। বান্দা নিশ্চয় হাজির হবে। রিপোর্ট বেনিয়ে আজকের ডাকেই ভেজিয়ে দিব। এখন ইজাজত দেন।"

এই বলিয়াই লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া সে চলিয়া গেল।

আমার ভাবনাটা দু-ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। জয়হরি যে এতটা বোঝে ও এমন জবাব দিতে পারে—সেটা এইমাত্র আমার কাছে ধরা পড়িল ও আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিল। ততোধিক আশ্চর্য্য হইলাম ব্রাহ্মণীর বিচক্ষণতায়, তিনিই আমার রক্ষাকবচরূপে এই সহকারীর সিলেক্‌শন্ করিয়াছিলেন। গোলাম আলির সম্বন্ধে কিছুই বুঝিলাম না। লোকটা বোধ হয় পূর্ব্বে কোথাও ভাল চাকরি করিত, নানা ইলেমের গরমে সেটি খতম্ হওয়ায় মাথা খারাপ হইয়া থাকিবে। কাজটায় বোধ হয় তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল—মজ্জাগত ধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল, তাই অভ্যাসটা যায় নাই—অভিনয়েও আনন্দ পায়।

সে পশ্চাৎ ফিরিতেই জয়হরি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "ওঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করচেন, আমি তবে চললুম ;—আরও দুজন আছেন,—ব্যাপারটা খুব বড়িয়াই হবে দেখছি।"

বলিলাম "ওঁদের অপেক্ষা না করিয়ে এতক্ষণ গেলেই হত।"

জয়হরি বলিল, "বলেন কি মশাই। আপনাকে ওই গোলেবকাউলির পাল্লায় ফেলে,—ওকে বিশ্বাস আছে! মুখখানা যেন পট্‌পটির মাদুর ; ও সোজা লোক নয় মশাই।"

তাহার এরূপ আশঙ্কার নিশ্চয়ই আরও সব অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ ও প্রমাণ ছিল এবং তাহা শুনিতে উপভোগ্যও হইত ; কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করিয়া বলিলাম, "সকাল সকাল ফিরো—বেপরোয়ার মত খেও না।"

সে বলিল, "আপনি সে ভয় রাখবেন না। তবে যেরকম আহারটা হবে বুঝতে পারছি তাতে একটু গড়াতেই হবে। তারপর চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার শেষ করেই ফিরব,—ধরুন সাড়ে চারটে। আপনি এখন সোজা বাসায় যান। দেখবেন ওঁরা যেন আজ উপরি হাঙ্গাম টাঙ্গাম না করে বসেন।"

বলিলাম "উপরি হাঙ্গামটা আবার কি ?"

জয়হরি—"ওই সেই যে রেড্—"

বলিলাম "আচ্ছা এখন যাও।"

সে দ্রুত গিয়া দেশপ্রাণদের দলে মিশিল। দেখি সত্যিই আরও দুইটি যুবক জুটিয়াছে। তাহারা রওয়ানা হইবার পর আমিও বাসায় ফিরিলাম। রাঙা আলু যে কোন্ গুণে জয়হরির এতটা অস্বস্তির কারণ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতেই পারিলাম না।

স্বর্ণ-বলয়

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু গোবিন্দ বসি আনন্দে
জপিছেন বিভু নাম।
শিষ্য আসিয়া হেনকালে তাঁর
চরণে করে প্রণাম।
নয়ন মেলিয়া কুশল প্রশ্ন
শুধালেন প্রভু তারে।
শিষ্য কহিল, গুরু তব ওই
দেব বাহু শোভিবারে—
দুর্লভ দুটী স্বর্ণ-বলয়—
এনেছি মূল্যবান।
কহিলেন গুরু, কিবা প্রয়োজন—
দীন-জনে কর দান।
জেদাজেদি করি শিষ্য ভক্ত
গুরুর যুগল করে—
দিল পরাইয়া সোণার কাঁকন।
দেখি কয়দিন পরে—
একখানি হাত শূন্য তাঁহার,
বিনয়ে প্রভুরে বলে,
কোথা গেল প্রভু অপর বলয় ?
কহিলেন প্রভু, জলে
পড়িয়া গিয়াছে আজিকে প্রভাতে
তটিনীতে গিয়া স্নানে।
জল হ'তে বালা তুলিতে শিষ্য
ডুবুরি ডাকিয়া আনে।
কহিলা বিনয়ে, কোথায় পড়িল
দিন প্রভু দেখাইয়া।
আনন্দে গুরু হাসিয়া তখন
অপর বলয় নিয়া,
ফেলিয়া গভীর তটিনী সলিলে,
কহিলা, হোথায় জলে।
লজ্জা পাইয়া শিষ্য লুটিল
প্রভুর চরণ তলে।

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ, এম, এ, ঈ ; এম, আর, এ, এস (লণ্ডন)

এ দেশের নিখিল সভ্যতার পরিচয় দেশের বেদে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে ও ধর্ম্ম-দর্শন-ন্যায়-গণিতাদি যাবতীয় শাস্ত্রে এবং চিত্রাদি কলাবিদ্যায় পাওয়া যায়। তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি এবং উৎকর্ষের অবিসম্বাদী প্রমাণ তাহার প্রাচীন কালের মন্দির, মসজিদ, দুর্গ ও প্রাসাদগুলির স্থাপত্যকলা হইতেই মিলিয়া থাকে। হিন্দুযুগের ভারতের প্রাচীন মন্দির ও সৌধাবলীর

দিলবারা নাটমন্দির

অধিকাংশই তুর্কীদের ভারত লুণ্ঠনকালে এবং পরবর্ত্তী কালের পাঠান এবং মোগল বাদশাহদিগের ঈর্ষা এবং ধর্ম্মান্ধতার ফলে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত। যে কয়টী রক্ষা পাইয়াছে, সেগুলি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের হিন্দুযুগের অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। মোগলযুগে দেশী স্থাপত্যকলার একটি নূতন ধারা প্রবাহিত হয়—প্রধানতঃ হিন্দু-স্থাপত্যের, বাঈজান্তাইন স্থাপত্যকলা হইতে উদ্ভূত আরবীয় স্থাপত্যের এবং পারস্যের স্থাপত্যের আংশিক সংমিশ্রণে। তাজমহল সেই নব শিল্পের মুকুটমণি—মধ্যযুগের 'হিন্দু-মোস্লেম' সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

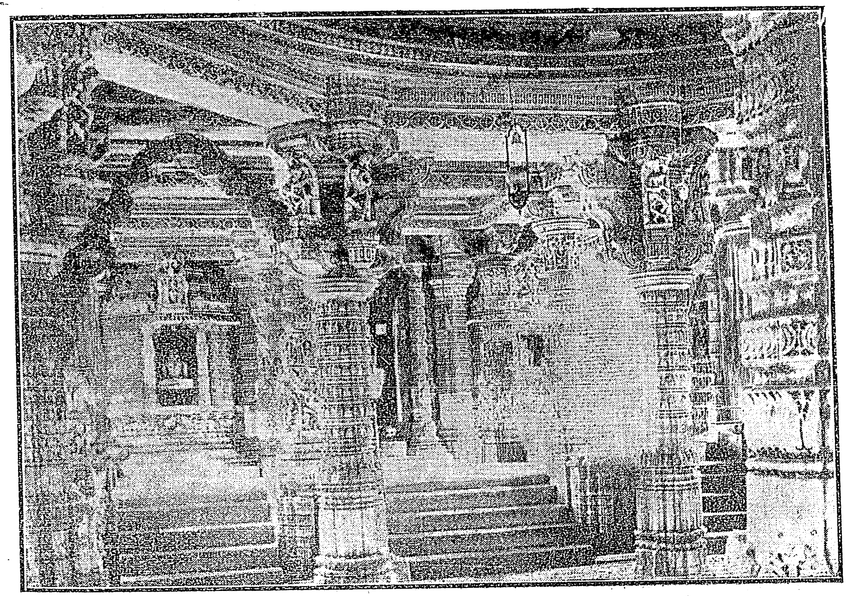

দক্ষিণ ভারতের তেলুগু, তামিল ও কানাড়া প্রদেশের সুদূর জনপদে—বীরপ্রসূ রাজপুতানার ঊষর মরুপ্রাঙ্গণে—আরো দূরে, বহুদূরে, যথায়—অসিধারী মুসলমান সেনানীর সমাগম হয় নাই, অথবা যে সকল নিরালা বেলাভূমিতে কালা পাহাড়ের ধ্বংসলীলা হিন্দুর দেবালয়ের বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ নাই, অনন্যসাধারণ কারুকার্য্য সমন্বিত অশেষবিধ হর্ম্ম্যচূড়া, দেউল ও মঠ অদ্যাপি যে সকল স্থানে দেখা যায়—তাহাদের শিল্পের শোভা, পুণ্যের প্রভা পরিম্লান হয় নাই—তপোবনপ্রসূত, সাম গান বৌদ্ধ-জৈন গাথা ও দ্রাবিড়ের মহাসঙ্গীত-মুখরিত, শঙ্খ ঘণ্টা

মঙ্গলারতির পূতস্মৃতি-বিজড়িত সেই অজন্তা ও এলোরা, মহাবলিপুর ও মদুরা ও জৈসল্‌মের ও আবু, খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বর, দ্বারকা ও মুধেরা অদ্যাবধি আমাদের হিন্দুরাজত্বের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনযুগের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেবল মাত্র ভারতে, সাঁচিস্তূপের মঙ্গলতোরণে, অথবা নীলাম্বুর তীরবর্ত্তী কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরে ভারতের স্থাপত্যের সীমা আবদ্ধ নহে, বহির্ভারতের কাম্বোজের আঙ্কর থোম বা নগরধাম, অপিচ যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরের অতুলনীয় কারুকার্য্য

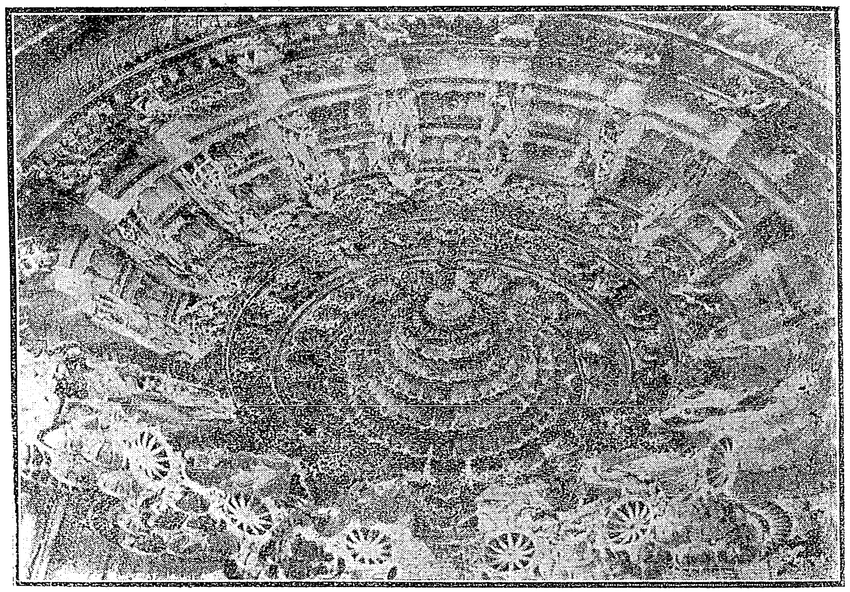

দিলবারা নাটমন্দিরের চন্দ্রাতপ

নিরীক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, সেই প্রশংসা উক্ত দেশদ্বয়ের সভ্যতার জননীর হিসাবে অন্ততঃ আংশিকভাবেও ভারতেরও প্রাপ্য। চীন, কোরিয়া ও জাপানী শিল্পেও ভারতের শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান।

ভারতের সভ্যতা ও স্থাপত্যকলা বহু প্রাচীন কালের; কিন্তু, প্রাচীন শিল্পের আদর্শ স্বরূপ, খৃঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতকের মৌর্য্যযুগের কয়েকটী মূর্ত্তি ও প্রাসাদ স্তম্ভাদির ভগ্নাবশেষ অপেক্ষা প্রাচীনতর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অন্যবিধ নিদর্শনের অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রাচীন-কীর্ত্তি-সংরক্ষণী বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ও তাঁহার সহকারিগণ সিন্ধুদেশের লারকাণা জেলায় সিন্ধুনদতীরস্থ মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থান খনন করিয়া যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে, খৃঃ পূঃ ত্রিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও এদেশে বাস্তুশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল। মোহেন্-জো-দড়োর মৃত্তিকা-স্তূপ ও পুরাতন ভিত্তি খনন করিয়া তিনি অগ্নি-দগ্ধ-ইষ্টকে-নির্ম্মিত অট্টালিকা, সুমসৃণ টালি, সোপান ও মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সেগুলি জটিল নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচায়ক। প্রাচীনতম বাবিলোনীয় বাস্তুশিল্পের সহিত তাহাদের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, ভারতের সিন্ধুতীরস্থ প্রাচীন সভ্যতা ও বাবিলোনীয় সভ্যতা পরস্পর সম্পৃক্ত। মোহেন্-জো-দড়ো ও দক্ষিণ পঞ্জাবের হারাপ্পা নগরের পুরাতন ভিটায় প্রাপ্ত এই যে সভ্যতার নিদর্শন আমরা পাই, তাহা আর্য্য জাতির সৃষ্ট নহে, আর্য্য-পূর্ব্বযুগে

দ্রাবিড়দের সৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যর জন মার্শাল বলিয়াছেন যে, পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশের অধিবাসীরা সুগঠিত সহরে বাস করিতেন। তাঁহারা পরিণত সভ্যতার অধিকারী এবং উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন। তাঁহাদের লিখন-প্রণালীরও উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল।

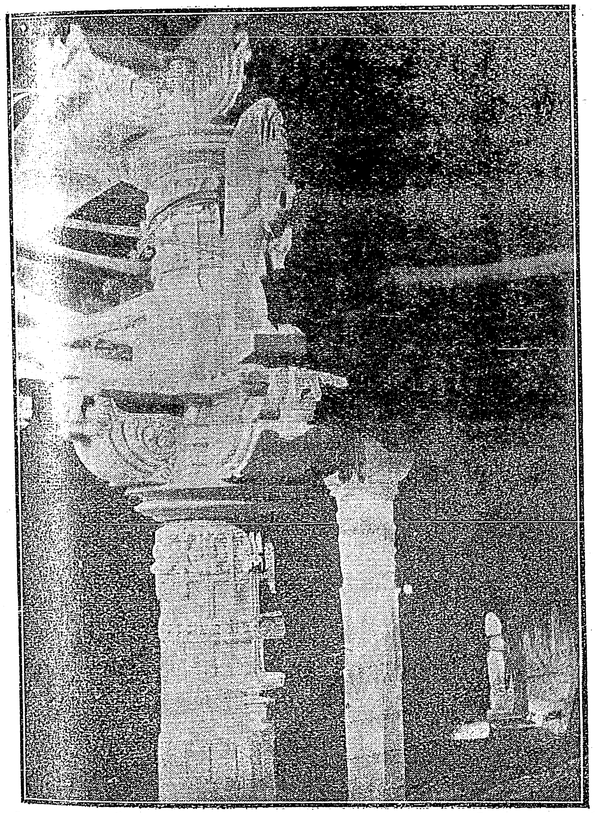

দিলবারা মন্দিরের স্তম্ভ

ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের প্রসঙ্গে মহামতি ফার্গুসন বলিয়াছেন, "ভারতের শিল্পীরা অতীব বিশালকায় সৌধ নির্ম্মাণ করণেও বিমুখ হইতেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অথবা জটিলতম কারুকার্য্যগুলি অবলীলাক্রমে সমাধা করিতেন ...সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরিকল্পনায় তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শিল্পী সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যত্র পরিদৃষ্ট হইবে না।"

হ্যাভেল প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতের স্থাপত্য-কলার প্রশংসা বহু উচ্চভাবে করিয়াছেন। ভারতের মুসলমান নরপতিগণ হিন্দু, তুর্কী, পাঠান, মোগল, শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সমবেত মনের ভাব বাস্তু-শিল্পে ফুটাইয়াছিলেন। আগরা, দিল্লী ও রাজস্থানের কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজপ্রাসাদগুলি এরূপ সুঠাম, সুন্দর ও কার্য্যের উপযোগী যে, দেশী বিদেশী সুধিমণ্ডলী সকলেই আমাদের জন্মভূমির এ নয়নাভিরাম স্থাপত্য-শিল্পের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মোগল-যুগের সেই সকল প্রাসাদ, সৌধ ও বিভিন্ন প্রদেশের বহুবিধ প্রাচীন দেউল, মঠ, মসজিদ ও রাজভবন প্রভৃতি দেখিবার ও আধুনিক কালের নির্ম্মিত প্রাসাদ মন্দিরগুলির সহিত তুলনা করিয়া পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ লেখকের ঘটিয়াছিল। বড়োদার প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস ভবন রাজপ্রাসাদের প্রধান চূড়া, ইন্দোরের আধুনিক বিচার ভবন, সিন্ধিয়া রাজের উজ্জয়িনীস্থ রাজপ্রাসাদ, যোধপুরের 'রায়কা বাগ্ প্যালেস' রেলষ্টেসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী সরকারি কার্য্যভবন, বীকানের মহারাজের নূতন 'পবলিক অফিস' ও সেনা-নিবাসগুলি, হায়দরাবাদস্থ নিজামের রাজপ্রাসাদ, মহীশূরের চিকিৎসাগার, মান্দালয় রাজপ্রাসাদের উপকণ্ঠবর্ত্তী সরকারি কার্য্য-গৃহ এবং এই ধরণের আধুনিক আবাসগুলি, প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রানুমোদিত মনোরম মন্দির সৌধাদির তুলনায় নিকৃষ্ট দেখায়। উক্ত দেশের শাসক-সম্প্রদায় দেশীয় স্থপতিগণের সাহায্যে প্রাচীন আদর্শে ভবনগুলি নির্ম্মাণ করাইতে পারিতেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা বিদেশী এঞ্জিনীয়র এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে অর্দ্ধ-শিক্ষিত এদেশের ওভারসিয়র দ্বারা বিদেশী বাস্তু-শিল্পের সামঞ্জস্যহীন ব্যর্থ অনুকরণে প্রবৃত্ত

হইলেন। কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকার শিক্ষিতেরা এই সকল নবীন সৌধের প্রতি দৃকপাত করেন না, তাঁহারা আগরা, উদয়পুর, জয়পুর, উজ্জয়িনীতে আসিয়া থাকেন খাঁটী দেশী সহরের নামে আকৃষ্ট হইয়া।

সুদূর ব্রহ্ম-চীন-সীমান্তের মিচিনা প্রদেশের ছায়া-শীতল আম্র-কাননের বৌদ্ধ সংঘারামে এবং তুষার-মৌলি হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত মহাতীর্থ বদরীনারায়ণে—সর্ব্বত্রই য়ুরোপীয় আদর্শের বাসভবন পরিদৃষ্ট হয়। সমগ্র ভারতের মধ্যে কেবল মাত্র জৈসল্‌মেরই খাঁটী হিন্দু ধরণের সহর। সেটী ভীষণা 'থর' মরুভূমির ঠিক মধ্যস্থলে এবং বারমের রেলষ্টেসন হইতে ৯৮ মাইল দূরে বলিয়া মুসলমান অথবা ইংরাজ যুগের ছাপ লেখক সেখানে দেখেন নাই। করগেট লৌহ অথবা কাচের সার্সি দেখেন নাই। স্থানীয় ষ্টেট এঞ্জিনীয়র মহাশয় তাঁহার বন্ধু বিশেষ। কয়মাস পূর্ব্বে তিনি লোহার গুদাম নির্ম্মাণ করাইবার জন্য লেখকের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। লেখক বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বিদেশী ছাপে সুন্দর সহরটীকে কলঙ্কিত না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত খ্রীষ্টান স্থাপত্য-শিল্প আসিয়া দেশের মানুষদের ও শিল্পের বংশলোপ করিতেছে। সভ্যতার অনুকরণে ভারতীয় শিল্পাত্মার কি বিসদৃশ পরিণামই হইয়াছে! দেশের শিল্প অধুনা পাশ্চাত্যের শিল্পের মিশ্রণে বিকৃত। ফলে, এ কালের রাজা নবাবদের প্রাসাদের এইরূপ অধঃপতন। লেখক গ্রীক, গথিক অথবা রেণেসাঁস যুগের শিল্প-রীতির নিন্দাবাদ করিতেছেন না। বিভিন্ন জাতীয় আদর্শ হিসাবে সেগুলি সত্যই নিখুঁত ও অতীব সুন্দর। তাহাদের আদর্শ এদেশে থাকিলে প্রতিযোগিতায় সুফল হইবে। তাহাদের ধ্যান করিলে ভারতের শিল্পীরা জ্ঞান লাভ করিবেন। কিন্তু বিদেশী শিল্পের রীতিগুলি অথবা উহাদের সংমিশ্রণ জাত বর্ত্তমান কালীন অর্থবিহীন, শোভাহীন, বর্ণশঙ্কর অট্টালিকাসমূহই যে দেশ অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে শ্লাঘার কথা নহে। কলিকাতার ধনকুবেরগণ কি কারণে পোর্টুগীজদের ও প্রথম যুগের ইংরাজদের আনীত য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া থাকেন? যেন তাঁহাদের নিজস্ব জাতীয়

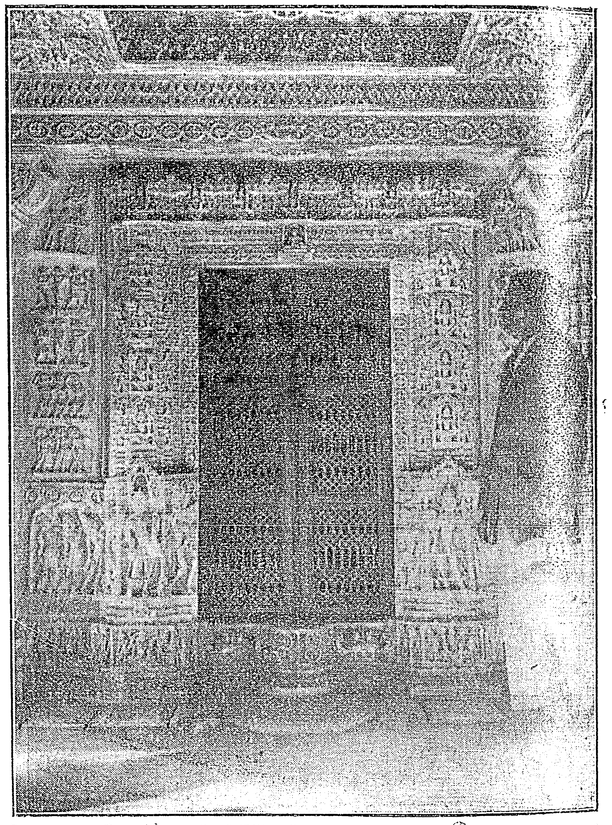

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার—দিলবারা

জিনিস কিছুই ছিল না—তাঁহারা বিদেশীর কাছেই গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছেন! ভারত-শিল্পের অনুরাগী আমাদের অনেকে দেশী ধরণে গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন মনস্থ করিয়াও দেশের বিশুদ্ধ স্থাপত্যকলা হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। আবার আমাদেরই দেশের জিনিস ইংরাজ শিল্পীরা যখন তাঁহাদের নিজেদের মনের মত গঠনে রূপান্তরিত ও

বিচিত্রিত করিয়া আমাদেরই বণ্টন করেন, তখন সেই কর্ম্মটী যুগপৎ দুঃখদায়ক ও হাস্যকর হইয়া পড়ে।

লেখক যখন বীকানের রাজার এঞ্জিনীয়র ছিলেন—মহারাজের আরাবল্লী পর্ব্বতশিখরস্থ আবুর রাজপ্রাসাদ তাঁহার অধীন ছিল। প্রাসাদটী হিন্দু ভাবের এবং আবুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও রমণীয়। তৎপার্শ্বেই আলোয়ার মহারাজের প্রাসাদ। দার্জ্জিলিং সিমলার সাহেবী বাংলোর

দালানের ছাদে কারুকার্য্য

মত। তাহা এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ বিদেশী ধরণের অন্য বাড়ীগুলি বীকানের রাজপ্রাসাদের কাছে, এবং সন্নিকটের প্রসিদ্ধ দিলবারা মন্দিরের কাছে কিরূপ ম্লান দেখায়, তাহা যাঁহারা আবুতে গিয়াছেন তাঁহারা জানেন। লেখক শুনিয়াছিলেন যে, আবুতে আলোয়ারের মহারাজা বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তাঁহার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবেন এবং তাহার নক্সা ও ইঞ্জিনীয়র ঠিক করিতে বিলাত গিয়াছেন। সম্প্রতি সেই আবুর প্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য সহকারী ইঞ্জিনীয়র আবশ্যক বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। যদি বিদেশী ধরণের প্রাসাদ তৈরী হয় ত বড়ই দুঃখের কথা বলিতে হইবে। রাণা প্রতাপের আরাবল্লী,—তাহার শিখরে কুম্ভরাণার প্রতিষ্ঠিত অচলগড় দুর্গ ও গোপাল-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান। বিশ্ব-বিশ্রুত দিলবারা মন্দির এই আবুতেই। মহারাজা বাহাদুর সে মন্দির নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। রাজা যদি দেশের শিল্প রক্ষা না করেন, গরিব প্রজা কি করিবে?

বিদেশী ধরণের নূতন শিল্প আসিয়া আমাদের পিতামহদের প্রিয় বাস্তুশিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র আসিয়া ঢাকাই মসলিনেরও এই অবস্থাই করিয়াছে। তাহারা আমাদের জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক গতি বিনষ্ট করিতেছে। আমাদের নূতন গৃহে আমাদের গৃহদেবতা আসিয়া অধিষ্ঠান করিতে পারেন এরূপ পীঠস্থান নাই। কলিকাতার ধনকুবেরগণ বহু অর্থব্যয়ে বাগানবাড়ী ও বাগান প্রস্তুত করাইয়াছেন। কিন্তু কই, সেই সকল বাগানে গমন করিলে প্রাচীন ভারতের বিলাস-উদ্যানের কোনও প্রতিচ্ছবিই ত লক্ষিত হয় না! সংস্কৃত সাহিত্যে নরপতি ও শ্রেষ্ঠীদের বিলাস-ভবনের যে উজ্জ্বল বর্ণনা আছে, তাহাতে সমগ্র চিত্রটী চক্ষের সমক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। অধুনাতন ভারতে সেই প্রাচীন উদ্যান বা বাসভবন প্রস্তুত করণের ধারা বিলুপ্ত হইতেছে। রাজপুতানায় প্রাচীন কালের উদ্যান-রচনার পদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। মোগলেরা আসিয়া তৎসহ পারস্যের ও মধ্যএসিয়ার উপাদান যুড়িয়া দিলেন। ফলে, মোগলযুগের অপূর্ব্ব শোভন উদ্যান রচনা—তাহার পরিচয় উত্তর ভারতের প্রাচীন

নগরীতে এখনও পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের যন্ত্রধারাগৃহ, প্রেক্ষাগার, মণিশালাপট্ট, তমালবীথিকা, বেণুকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ, পারাবত-রব-মুখরিত বলভী, তাহাদের সংস্কৃত নামের মোহ মাধুরিমা লইয়া কেবলমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থেই অধিষ্ঠিত আছে; কিন্তু মধ্যযুগের মোগল ভারতের বাগিচার ফোয়ারা, বারাদরী, আঙ্গুরীবাগ, যশ্‌মিনবাগ, আসমান-চবুত্রা, অটারী বা রেওটী, সেই প্রাচীন ভারতের উদ্যান-বাটীরই জিনিস—মাত্র ভিন্ন নামে সেই দিন পর্য্যন্ত আমাদের ধনীদের বাগানে বিরাজ করিত। ইংরাজি বাগানের, অর্থাৎ ইটালীয় ও ফরাসী খেয়ালের বাগানের অনুকরণে আমরা এই সব প্রাচীন ধারা বর্জ্জন করিয়াছি। সেইহেতু এক্ষণে ধনীদের উদ্যানে 'প্লাষ্টারে'র গ্রীক ধাঁজের মূর্ত্তি, জুতাপায়ে-উড্ডীয়মানা,—'সিমেণ্টের' পরী, লোহার 'রেলিং' লোহার 'বেঞ্চ,' গ্যাসপোষ্ট, কর্জ্জন গার্ডেনের 'কাষ্ট্‌ আয়রণের' বা ঢালাই-লোহার ফোয়ারা প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুর বেসুরা সমাবেশ—যেন অধুনাতন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের হস্তিনার রাজোদ্যানের দৃশ্যপট। উদয়পুরে, যোধপুরে (মন্দোর), বীকানেরে ও কাশীর রামনগরে—আজও পর্য্যন্ত প্রাচীন ধরণের উদ্যান আছে, যাহা আমাদিগকে চাঁদের আলোর স্বপ্নের রাজত্বে লইয়া যায়। কালে তাহারাও হয়ত লোপ পাইবে।

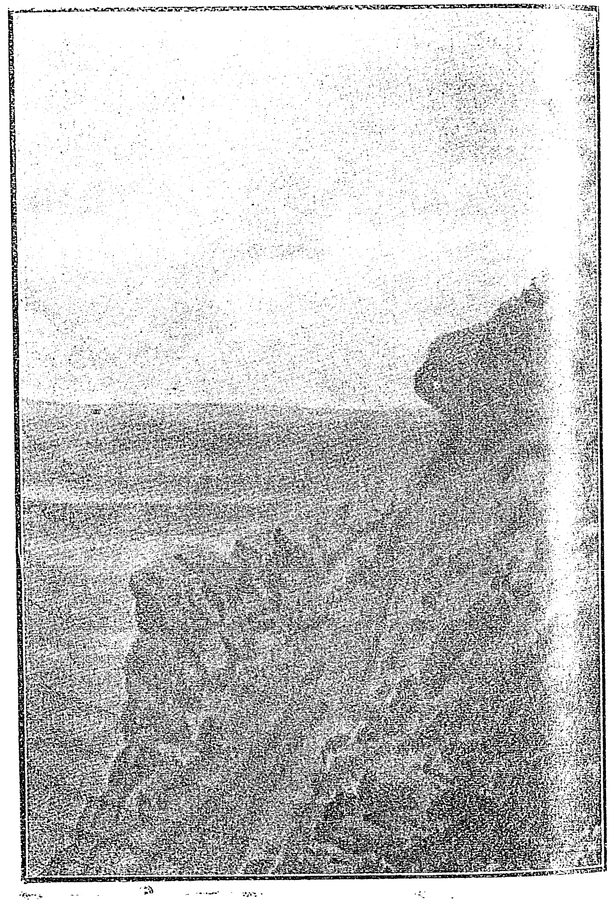

আরাবল্লী পর্ব্বত

উদয়পুরের মহারাণার সূর্য্যমূর্ত্তি-বিচিহ্নিত, কিরীট-কলস-ঝরোখা-চবুত্রা-অলঙ্কৃত, রথাকৃতি, পাষাণ-প্রাসাদে, অথবা অতুলনীয় তাহার 'চিত্রশালায়' যে সুগভীর বিশালতা, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য গম্‌গম্‌ করিতেছে, কলিকাতার মল্লিক-বাড়ীর 'করিন্থিয়ান ক্যাপিটল' সমন্বিত রিদেশী ফ্যাসানের সৌধমালায় বা তন্মধ্যস্থ বহুমূল্য ঝাড়, ফানুস, ইটালিয়ন মর্ম্মর-মূর্ত্তি ও ফরাসী চিত্রশোভিত হলঘরে তাহা অনুভূত হয় না। চিতোর দুর্গে, পদ্মিনীর জলপ্রাসাদের দীর্ঘিকা-বলোকনকারী ফুলদার গবাক্ষ পরিদর্শন করিয়া মার্ব্বেল প্যালেসের' লোহার রেলিং সংযুক্ত বারাণ্ডা দেখিলে প্রাণে ব্যথা লাগে। দিলবারার নাটমন্দিরের ফুটন্ত কমলের অনুকৃতি পাষাণ চন্দ্রাতপের নিম্নকার, অথবা ঝড়োদা-রাজের দরবার-গৃহের, পাষাণময়ী—সঙ্গীতমুখরা অপ্সরার হাস্য-লাস্য-ভঙ্গিমাভরা বন্ধনী বা 'ব্রাকেট'গুলি স্বর্গের সুষমা উৎসারিত করিয়া দিতেছে। আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত ভারতীয় প্রাসাদের 'ষ্টেটরুম' বা 'ড্রয়িংরুমে' তাহার

অভাব আছে। আমাদের উদ্যানে ঢালাই লোহার কৃত্রিম ফোয়ারা এবং গ্রীকদেবী আফ্রোদিতী বা ভিনাসের মর্ম্মরের মূর্ত্তি শোভা পায় না। তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম হিমালয় হইতে উদ্ভূত 'গোমুখী জলধারা'রূপী গঙ্গা এবং মথুরার তক্ষণ-শিল্পীর ত্রিভঙ্গিঠামে নৃত্যরতা 'মালবিকার' ভাস্কর্য্যই বাঞ্ছনীয়।

কাশী, গয়া, দিল্লী, শ্রীনগর, উদয়পুর, জয়পুর, জৈসলমের, আহম্মদাবাদ, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি প্রাচীন সহরের প্রাচীন মহল্লাতে যে মনোহর, প্রাচীন-ভারতীয় ভাবটী দেখা যায়, তাহা সেই সকল সহরের আধুনিক কালে গঠিত পল্লীতে অথবা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি এ-যুগের সহরে পরিদৃষ্ট হয় না। উজ্জয়িনীর বিশাল প্রাচীর, উন্নত তোরণ—এবং সিন্দূররঞ্জিত, ও প্রজ্জ্বলিত-গন্ধ-তৈল-প্রদীপের কালিমালিপ্ত কুলঙ্গি-সমন্বিত পাষাণের সিংহদ্বার পরিবেষ্টিত, বণিক মহল্লায় বা চৌকে উষ্ণীষধারী-গন্ধ-বিক্রেতাদের সারি সারি মনোহারী বিপণিশ্রেণী ও উজ্জয়িনীর সেই বক্র, সঙ্কীর্ণ, পাষাণ পথোপরি আলোক ও ছায়ার লুকোচুরি-খেলা এবং অলঙ্কার-পরিহিত, অর্দ্ধশয়ান বৃষবরের অলস নেত্র ও উন্মন রোমন্থন যিনি অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভারত-স্থাপত্যের, ভারতের Town Planningএর প্রাণ কোথায়!

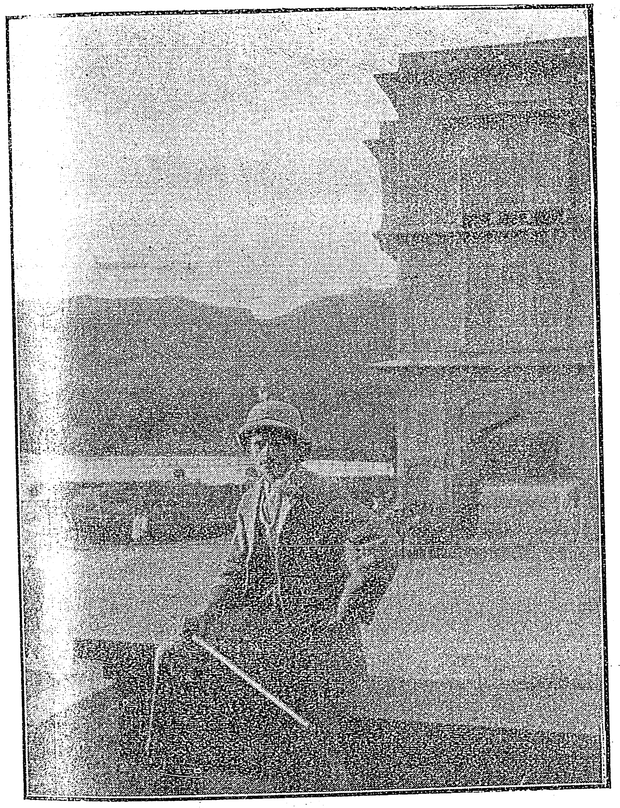

বীকানের মহারাজের আবু প্রাসাদের গাড়িবারান্দা

ভারতের নূতন শহরে জীবনের স্পন্দন নাই, বারাণসীর কচুরিগলির প্রাণ-মাতানো দেশী ছাপ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই—তাহারা য়ুরোপের সস্তা সংস্করণ। বিংশ শতাব্দীর সৃষ্ট টাটার জেমশেদপুর শহরে যেন কেমন একটি একঘেয়ে ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরিকদের যেন সমাজ, ধর্ম্ম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, চেতনা নাই। ইহাতে আধুনিক কলকারখানার সভ্যতার উৎকট তাণ্ডব আছে, তাণ্ডবান্তে অবসাদের ভাবও আছে,—নাই আনন্দ-কূজন, নাই সৌন্দর্য্য,—নাই স্নিগ্ধ ভাব। যেন ধরিত্রীর সঙ্গে শহরের সদ্ভাব নাই। সেই একঘেয়ে, সমান্তরাল, সোজা, বিস্তৃত পথ; একঘেয়ে বাংলো বাড়ী; রসবর্জ্জিত একঘেয়ে "এংগ্লো ইণ্ডিয়ার" ভাব। আলোক-স্তম্ভের বৈদ্যুতিক আলোক-শিখা দেশবাসীদের রুগ্ন চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। রাক্ষসের মত লোহার কারখানার ভয়াবহ চিমনীগুলি প্রতিনিয়ত ধূমোদ্গীরণ করিয়া শহরবাসীদের শাসাইতেছে। রৌদ্রাতপ হইতে পান্থদের রক্ষা করিবার জন্য রাজপথে পাদপ-বীথিকার সুবন্দোবস্ত হয় নাই। আমাদের কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী-ধামই, বা বাংলাদেশের প্রাচীন শহর-গণ্ডগ্রামগুলিতে যেখানে পুরাতন পল্লী ও ইমারতাদি

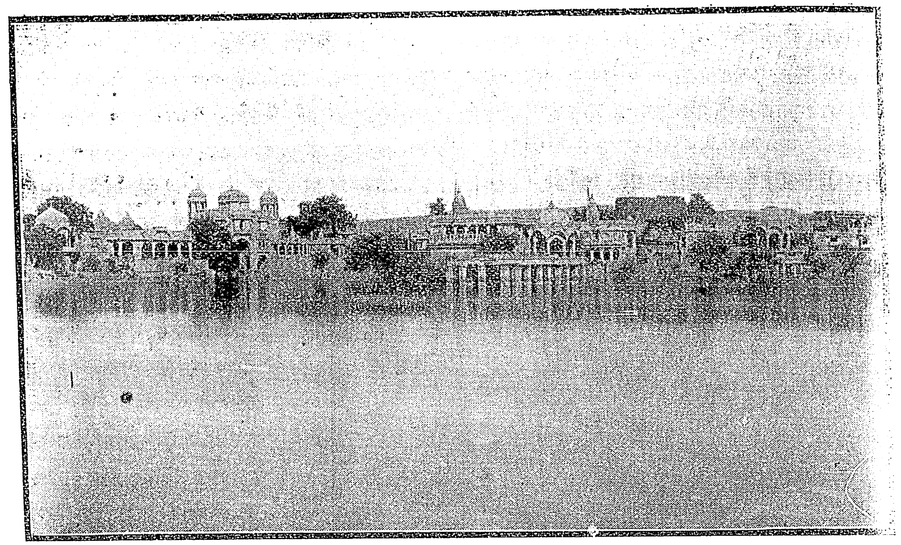

জৈসলমের হ্রদ

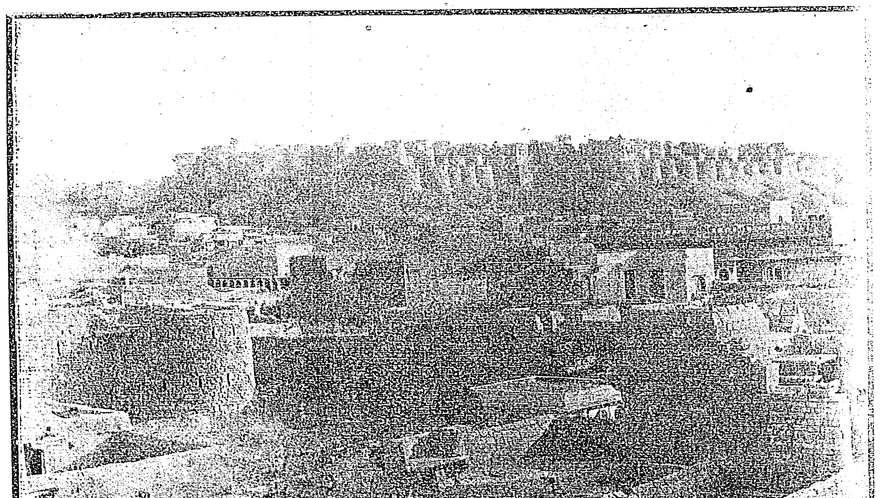

জৈসলমের দুর্গ

এখনও বিদ্যমান, সেইরূপ স্থানগুলিই, ভারতের জাতি-ধর্ম্মের, জলবায়ুর ও রৌদ্রতপ্তা প্রকৃতির অনুকূল।

ভারতবর্ষের নগরপালদিগের কার্য্যসভাগুলি শহরে এই বিংশ শতাব্দীর শ্রীসম্পদ ও স্বাস্থ্য আনয়ন করিবার জন্য উৎসাহের উচ্ছ্বাসে প্রাচীনকালের শত শত শতাব্দীর পরীক্ষিত, সুফলপ্রদ প্রণালীতে গঠিত আমাদের গৃহপল্লীগুলি

ভূমিসাৎ করিয়া নূতন ধরণের রাস্তা ঘাট, জলনিকাশ ও আলোকের ব্যবস্থা এবং কলিকাতা ও বোম্বাইএর বিশ্রী ধরণের অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ভিনিস, নেপলস, ফ্রাঙ্কফোর্ট এবং এডিনবরা প্রভৃতি পাশ্চাত্য শহরের প্রাচীন কালের পল্লীগুলির সেই কালের ভাব অটুট রাখিয়া, তাহাদের একেবারে ভূমিসাৎ না করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেরূপ অভিনব প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়, এ দেশে এখনো সেরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। নগরপালদিগের অনুষ্ঠানে এই প্রকারে যদি আরো অর্দ্ধ শত বর্ষ গত হয়, তাহা হইলে ভারতে দেশী পল্লী বলিতে কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না—য়ুরোপীয় স্থাপত্য-রীতিতে রচিত বাটী-ঘরে ভারতবর্ষ নিজের শোভা, কৌলিন্য-মর্য্যাদা ও অস্তিত্বে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। যে ভারতবাসীদের পিতা-মহেরা আবু, ভুবনেশ্বর, তাজমহল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে।

কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না। ভারতবাসীর মন পুনরায় তাহার পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রিক্‌থের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই চলিয়াছি। আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রণালী ও আদর্শের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যেটুকু পরিশ্রম করিয়া আমরা ফরাসী গথিক অথবা আধুনিক ইংরাজী স্থাপত্য-কলা শিক্ষা করিতেছি—বৌদ্ধ, জৈন, রাজপুত ও মোগলযুগের স্থাপত্য-রীতি শিক্ষা করিতে আমাদের তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম, কালক্ষেপ অথবা অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

নগরের সৌধমালা হইতেই নাগরিকদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হয়—তাহারা চিরসুন্দর এমন একটি পারিপার্শ্বিক ভাব সৃজন করে, যাহা নগরবাসীর মহতী আকাঙ্ক্ষার

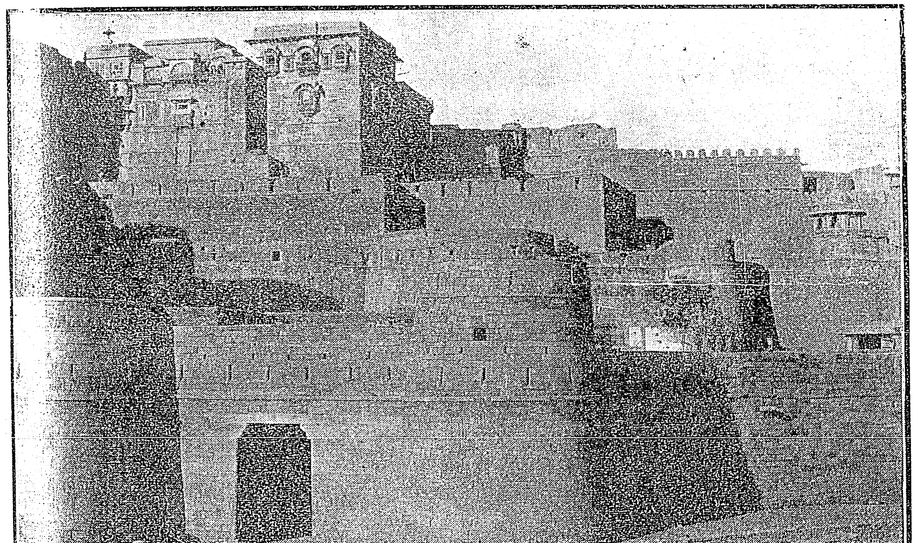

জৈসলমের দুর্গে রাণী-মহল

পক্ষে তৃপ্তিকর। সৌধমালা হইতেই শিল্পী নগরবাসীদের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি পরিব্যক্ত করেন।

বাংলার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। দেশী ধরণের বাটী এ দেশে বিরল বলিলেই চলে। বাংলায় পাথর মিলে না। সেই কারণে, দুই চারিটি পাথরের মন্দির ব্যতীত, প্রাচীন যুগে বাংলার মন্দিরগুলি ইষ্টকে নির্ম্মিত ও ইষ্টকের উপর খোদাই মূর্ত্তি ও নক্সার দ্বারা শোভিত হইত। প্রাচীন কালের অধিকাংশ মন্দিরই এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তখনকার বাস-ভবন এবং কোনো কোনো মন্দির, কাষ্ঠেও

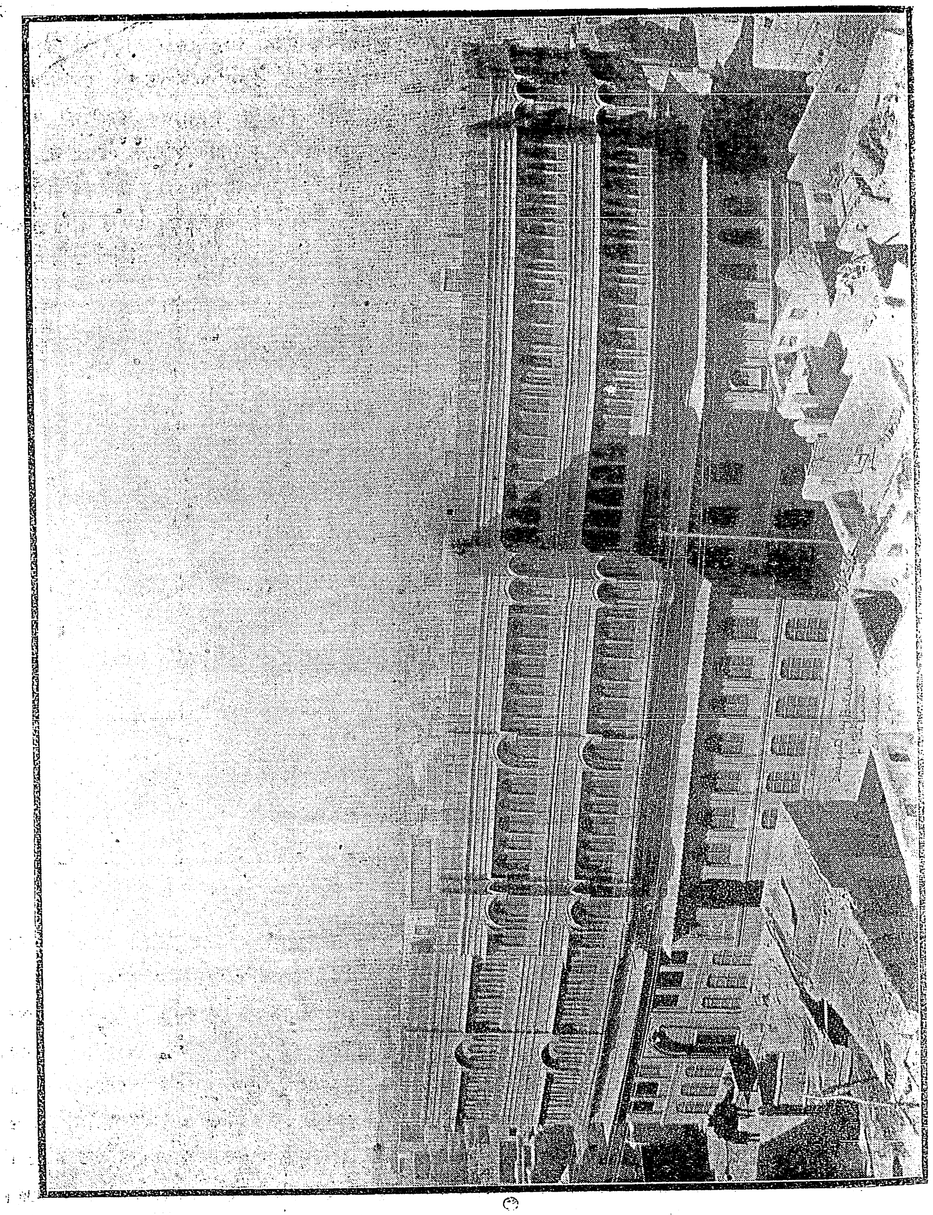

হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—লেখকের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত

নির্ম্মিত এবং রমণীয় কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত হইত। সেইরূপ কারুকার্য্য চণ্ডীমণ্ডপের দারুস্তম্ভে সে দিন অবধি আমরা ক্ষোদিত করাইয়াছি ভুবনেশ্বর ও তাজমহল বাংলায় নাই; সে কারণে বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করিবার মত উচ্চশ্রেণীর দেশীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন বাংলায় পাওয়া যায় না। পোর্ত্তুগীজেরা তাঁহাদের দেশের স্থাপত্য এ দেশে আনিয়াছিলেন, তাহা, এবং দক্ষিণ য়ুরোপীয় ধরণের আবাস-ভবন এখন বাংলা অধিকার করিয়া আছে।

নগরের সৌধমালা হইতে সকল দেশের স্থাপত্য-শিল্পের ছাত্রেরা তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও নৈতিক জীবনের উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। দেশী ধরণের বাটীতে শ্রীমানেরা বাস করুক এবং দেশী অট্টালিকার মাঝে যে রাজপথ তাহাতে বিচরণ করুক, তাহারা ভারত-প্রকৃতির অনুকূল হইবে, পিতামহদের মত সবল, দীর্ঘজীবী ও জ্ঞানী হইবে।

সে ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে কলিকাতা শহরের নূতন রাস্তা "সেণ্ট াল য়্যাভিনিউ"টি নিষ্ফল হইয়াছে। বাঙালী, হিন্দুস্থানী অথবা মাড়বারী কাহারও পক্ষে উক্ত রাজপথে জাতীয় জীবনের অনুকূল ও ভারতীয় ভাবের উদ্দীপক আবহাওয়া নাই। প্রচুর অর্থব্যয়ে পাঁচ, ছয়, সাততলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু মাত্র একখানি বাটী ব্যতীত অন্যান্য বাটীগুলি শ্রীহীন, অর্থহীন। লণ্ডন শহরের ব্যাঙ্ক ও সরকারি অফিস প্রভৃতির যে সকল চিত্র কলিকাতায় আসে, তাহাদের অনুকরণে এ সকল বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অনুকরণ-বিদ্যায় যে দোষ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। লণ্ডনের সেই সকল হর্ম্ম্যনিকেতনে যে সৌষ্ঠব, বিশালতা এবং বলিষ্ঠ ও মনোহারী ভাব বিস্ফুরিত হইয়াছে, এই সকল অট্টালিকায় সে রকম ভাব কোথায়?

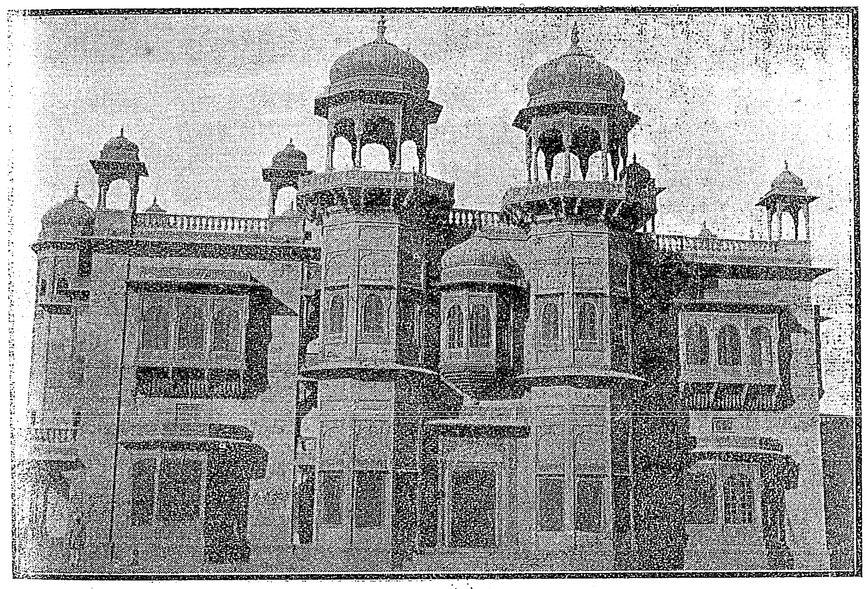

আধুনিক হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—লেখকের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত

বিলাতের শিল্পীরা দেশ-বিদেশের স্থাপত্য-প্রণালীর ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন; এবং ধ্যান করিবার, ধারণা করিবার ও আরাধ্য বস্তুটী কার্য্যে পরিণত করিবার মত উচ্চ শিক্ষা, সংযম, শক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী তাঁহারা। পরাধীন ও দুর্ব্বল আমাদের "Architects, Builders or Contractors" মহাশয়েরা, শিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যক্রমে,

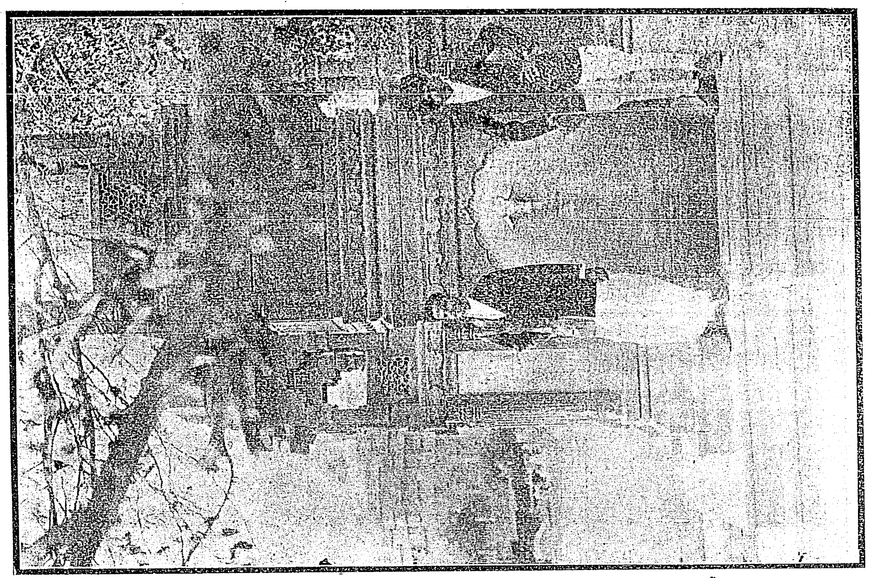

[illegible]—মন্দিরপ্রাঙ্গণে লেখক দণ্ডায়মান

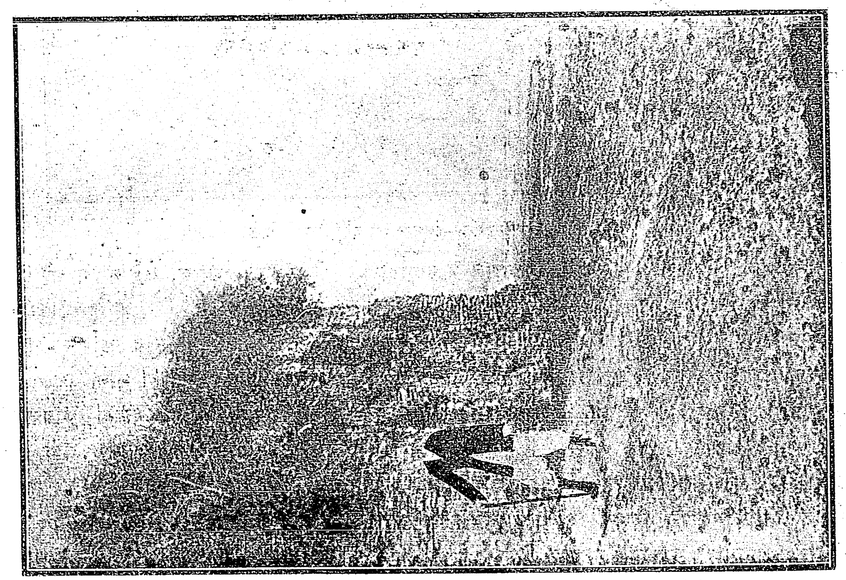

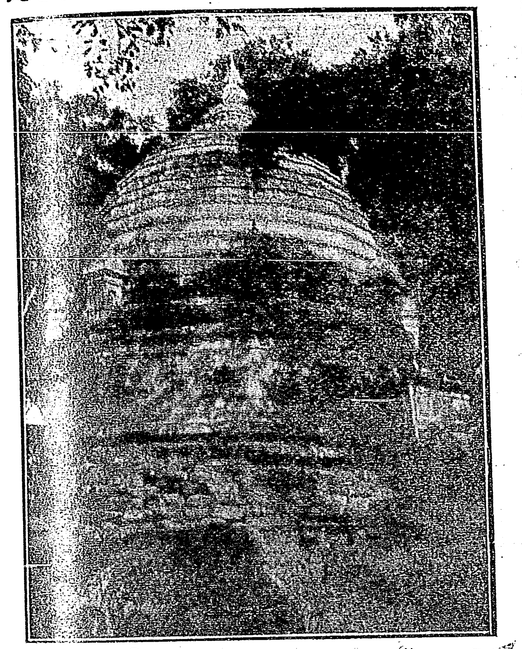

সুন্দরবনের জঙ্গলমধ্যে ভিন্ন মন্দির

কামাখ্যার মন্দির

ইংরাজের অনুরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ, বৃত্তি, বিত্তালয় ও প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন না। সুতরাং বিদেশীয় ভবনের চিত্রের অথবা সাহেব শিল্পীর নক্সার নকল করা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

শিবপুরে অথবা সরকারি অন্যান্য এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দেশীয় স্থাপত্য-বিত্তা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। দেশের যুবক দেশের শিল্প শিক্ষা করিতে পাইলেন না—এতদপেক্ষা লজ্জার, পরিতাপের ও অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান লেখক বড়োদার কলাভবন, জয়পুরের শিল্প-বিত্তালয় প্রভৃতি দেশীয় অনুষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। সেখানে দেশীয় স্থাপত্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে, সমগ্র ভারত-বর্ষের অভাব মোচন করিতে হইলে, ওইরূপ শিক্ষাগার অনেকগুলি স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন। বর্ষে বর্ষে সহস্র শিল্পীর কার্য্যক্ষেত্রে আসা চাই। সকল প্রদেশে সেরূপ অনুষ্ঠান করা ভারত সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। হ্যাভেল প্রমুখ ভারতের হিতৈষী অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তিই এ সম্বন্ধে বহুবার সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

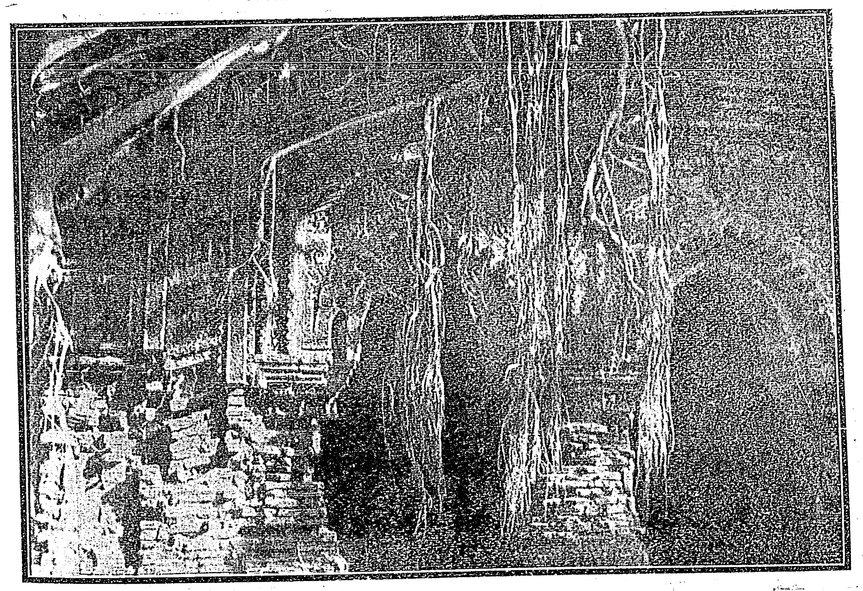

পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির

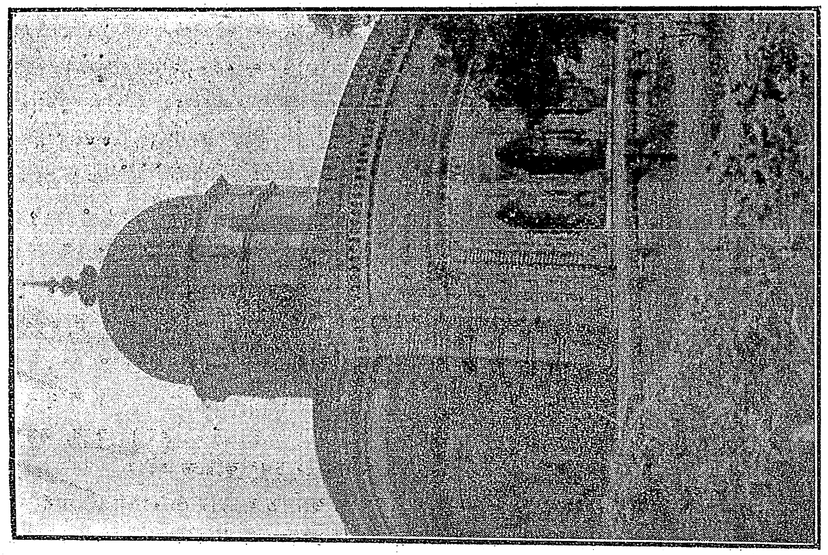

বিষ্ণুপুরের মন্দির (১)

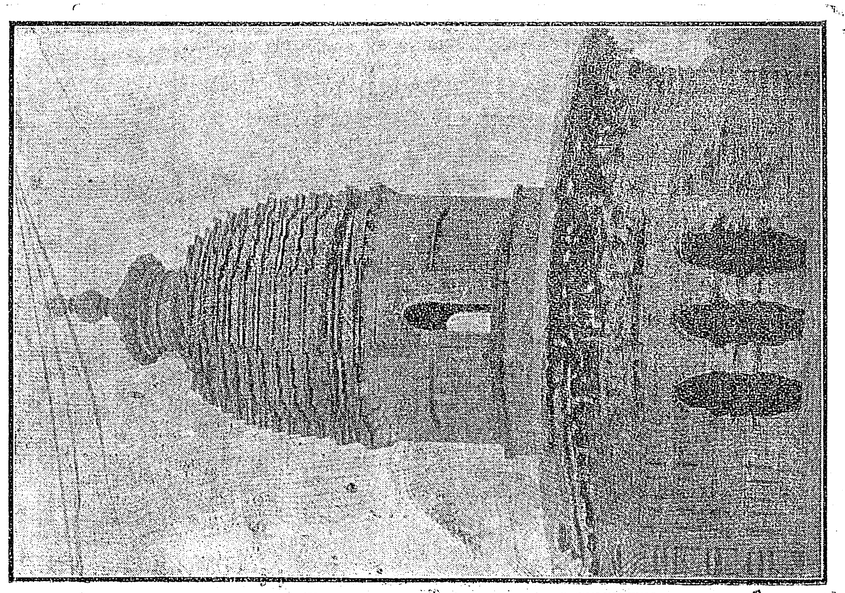

বিষ্ণুপুরের মন্দির (২)

সরকার কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত তো করেনই নাই, উপরন্তু অধিকতর উৎসাহেই নূতন নূতন বিদেশী ধরণের বাটীর প্রচলন করাইতেছেন, যদিও দেশবাসীর অর্থেই সরকারি বাটী নির্ম্মিত হয়। তবে লক্ষ্ণৌএর মেডিকেল কলেজ, মথুরার হাসপাতাল এবং বোম্বাই প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ম প্রভৃতি কয়েকটী দেশী ধরণের অট্টালিকা প্রস্তুত করানো হইয়াছে বটে, কিন্তু কেবল এইটুকু করাইয়াই সরকার দেশবাসীকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেগুলিও বিশুদ্ধ ভারত-শিল্পের অনুযায়ী নহে, য়ুরোপীয় ভাবের সহিত মিশ্রিত। বড়োদা, জয়পুর, বীকানেরে এরূপ ধরণের অনেক বাটী আছে।

গভর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কস বিভাগে এবং রেলওয়ে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অথবা ম্যুনিসিপালিটীতে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পাশ করা এঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হয়। জয়পুর, বড়োদার ছাত্রেরা সেখানে চাকরী পাইবেন না। এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া সরকার ভারত-স্থাপত্য-শিল্পকে নির্ম্মূল করিতেছেন। মাঝে মাঝে কেবল শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়া দেশী শিল্পীকে রৌপ্যপদক দানে উৎসাহিত করিলেই সরকার বাহাদুরের দ্বারা দেশী শিল্প সংরক্ষণ সম্ভবপর হইবে না। শিল্পীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য। ভুবনেশ্বর ও তাজমহল যে মিস্ত্রীরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা আজ কৃষিকার্য্য করিতেছেন। লেখক আবু, ভুবনেশ্বর, জৈসলমের প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকজন বাস্তু ও তক্ষণ-শিল্পীর নাম ধাম লইয়া আসিয়াছেন। অতি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী তাঁহারা। আবুর মন্দিরের বন্ধনীর যে আলোক-চিত্রটী এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইল, সেটী আবুর উক্ত শিল্পীর প্রস্তুত। সরকার বাহাদুর তাঁহাদের দৈনিক এক টাকা দেড় টাকা

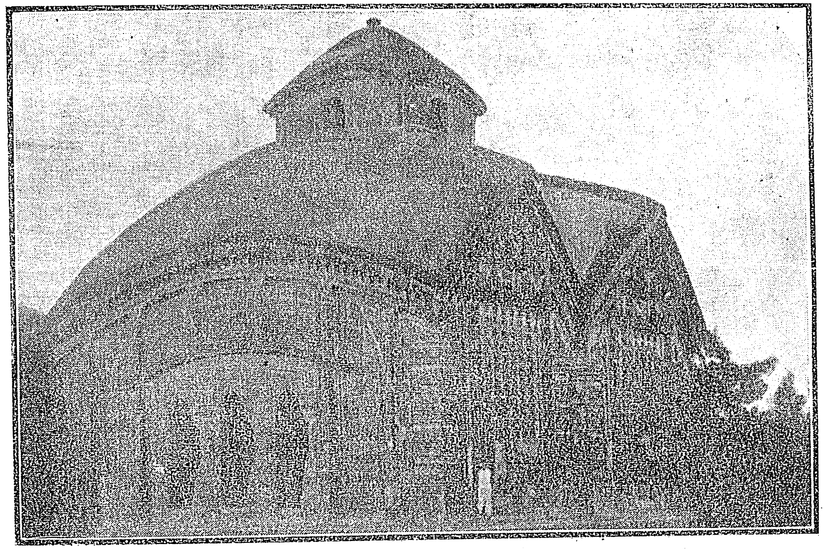

বিষ্ণুপুরের মন্দির (৩)

হিসাবে বেতন দেন। দুই টাকা রোজ পাইলে তাঁহারা কলিকাতায় আসিতে পারেন। কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটীর উচিত বড়োদা, জয়পুর, বোম্বাইএর জিজিভাই আর্ট স্কুলের ছাত্রদের ওভারসিয়র, এঞ্জিনীয়র রূপে এবং বিদেশী ও দেশীয় শিল্পে অভিজ্ঞ City Architect রূপে নিযুক্ত করা এবং দূর হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া স্থানীয় মিস্ত্রীদের শিখানো। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে। কৌন্সিলররা কি করিতেছেন? তাঁহারা সংগঠনী শক্তি দেখান! প্রত্যেক ভারতবাসীর এ বিষয়ে আন্দোলন করা উচিত। বেঙ্গল টেকনিকাল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা যাদবপুরের বাড়ীগুলি

পরিকল্পনা করিবার পূর্ব্বে কি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের চিত্র ধ্যান করেন নাই? রবীন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দুকুমার এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন? বাংলায় দেশী স্থাপত্য সম্বন্ধে একটি বিদ্যালয়, কয়েকখানি গ্রন্থ ও একখানি স্থাপত্যশিল্প সংক্রান্ত পত্রিকা বিশেষ আবশ্যক। পত্রিকায় গৌড়, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের ও বাংলার প্রাচীন কালের ঘর বাড়ীর আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা এবং সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। কি কি মসলা কি পরিমাণে মিশাইয়া এবং কি ভাবে প্রাচীন কালে বাটী নির্ম্মিত হইত, বৃদ্ধ মিস্ত্রীদের ও দেশবাসীদের নিকট হইতে সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত করা আবশ্যক। প্রাচীন কালের বাটী ও ছাদ এ কালের অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও স্থায়ী হইত। সরকারের বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা বা specificationগুলি বিলাতের specificationএর অনুকরণ। এ দেশের জলহাওয়ায় তাহা প্রযোজ্য নহে। দেখা গিয়াছে যে, সরকারী বাড়ীর নূতন ছাদে জল চোঁয়ায়, খিলান ফাটিয়া যায়। সহস্র বৎসরেও কিন্তু সে কালের গাঁথুনি শিথিল হয় নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার অজন্তা গুহা মন্দিরের চারুচিত্রাবলী অদ্যাপি মলিন হয় নাই।

কলিকাতা সহর ইংরাজী ধরণের বাটীতে পরিপূর্ণ। ইংরাজ এঞ্জিনীয়াররা তাঁহাদেরই দেশের স্থাপত্য-কলা শিক্ষা করিয়া এ দেশে চাকরী করিতে আসেন; তাঁহারা ইংরাজী ধরণেরই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারেন। এ দেশী বাটী নির্ম্মাণ করাইবার পূর্ব্বে এ দেশীয় স্থাপত্য শিক্ষা করার প্রয়োজন। ইংরাজ স্থপতি এত পরিশ্রম করিবেন কেন? আর শুধু পুস্তক পাঠ করিলেই হইবে না, বাটী নির্ম্মাণ কালে

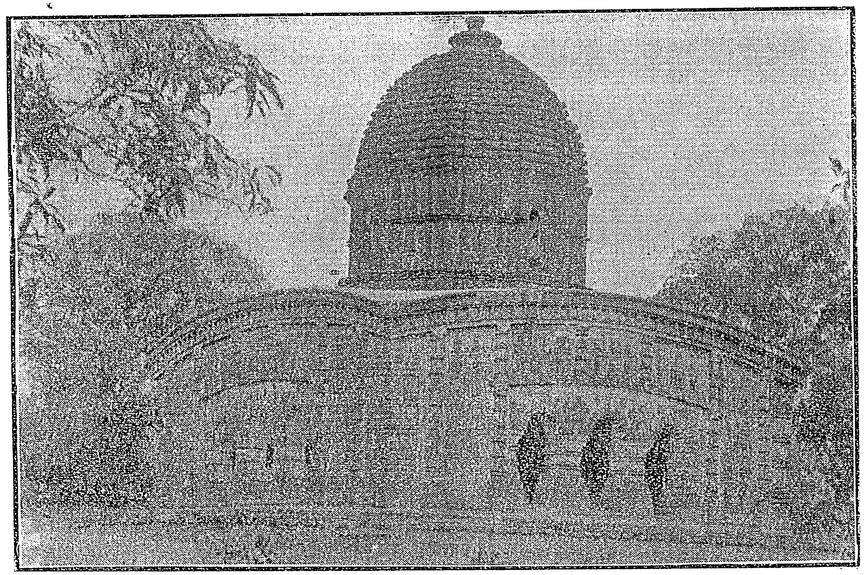

বিষ্ণুপুরের মন্দির (৪)

দেশী সহকারীদের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের আত্মগরিমা ক্ষুণ্ণ হইবে যে!

অনেকে ভাবেন যে, ভারতীয় ছাঁদের বাটী প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যয় হয়। এবং প্রস্তর ব্যতিরেকে দেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। লেখক সরকারি পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে আট বৎসর ছিলেন। স্থাপত্য কার্য্যে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বিশেষরূপে তিনি বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, Reinforced concrete সাহায্যে দেশী

ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করিলে, বড় বাজারের মামুলি ধরণের অলঙ্কৃত, বাটী নির্ম্মাণের খরচের তুলনায় খরচ কমই হইবে। অথচ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য বাটী প্রস্তুত হইবে। তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়রের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদেরও সেই মত। দেশী ধরণের বাগান করানোও অসম্ভব অথবা বহুব্যয়সাপেক্ষ নহে।

বিদেশী শিক্ষা ও রাজনীতি কৌশলের ফলে আমাদের চিত্ত এতদূর বিকৃত হইয়াছে যে, সহজ কাজও আমার অসাধ্য বলিয়া ভাবি। আমরা ভায়ে ভায়ে মিলিত হইতে চাই না, পরস্পরকে সাহায্য করি না। সাহেবদের সে দোষ নাই, তাই তাঁরা এত বড়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মহাত্মা কবীর

শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল

কাশীধাম হিন্দুর পরম পবিত্র, তীর্থোত্তম স্থান। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—ত্রিলোকে—হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর পক্ষে এমন পবিত্র স্থান আর নাই। কাশীধামে যাইবার জন্য, বাস করিবার জন্য, দেহপাত করিবার জন্য, হিন্দু লালায়িত।

কাশীধাম কেবল নরমানবের নয়, অমরগণেরও অভিলষিত স্থান; কাশীধাম কেবল নরমানবের নয়, অমরগণেরও আবাসভূমি। কাশীধামে কেবল মুনি ঋষি, যোগী তপস্বী, সাধু সজ্জন বাস করেন না, দেবগণও কাশীধামের অধিবাসী। এইজন্য কাশীধামে পাপ নাই, পুণ্য আছে, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে, মলিনতা নাই, নির্ম্মলতা আছে, অপবিত্রতা নাই, পবিত্রতা আছে, সঙ্কীর্ণতা নাই, ঔদার্য্য আছে—এই জন্য কাশীধামে বাহ্যাভ্যন্তর সমস্তই শুচি, পূত, পবিত্র, সুন্দর, মনোরম। দূর হইতে "কাশী কাশী" বলিতে বলিতে নিষ্পাপ হইয়া সংসারী মানব যখন কাশীতে প্রবেশ করে, কলুষনাশিনী ত্রিতাপহারিণী, কাশীতল-বাহিনী, সুখদা, মোক্ষদা, তরলতরঙ্গিণী সুরধুনীর সুমধুর নাম "যোজনানাম শতৈরপি" উচ্চারণ করিতে করিতে নিষ্পাপ সংসারী মানব কাশীধামে যাইয়া সেই পূত সলিলে যখন অবগাহন করে, বল দেখি, কাশীধামে পাপ রহিল কোথায়, কি প্রকারে? জন্মজন্মান্তরের কলুষরাশি কাশীধামে নাশ হয় বলিয়াই কাশীক্ষেত্র মহশ্মশানক্ষেত্র, কাশীধামে দিব্যজ্ঞানজনিত পরম আনন্দ লাভ হয় বলিয়াই কাশীধাম আনন্দকানন।

কাশীধামে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত স্মরণ করাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়,—শুনাইয়া দেয় সুদূর অতীতের পুণ্য পবিত্র কোন ঘটনা, ধর্ম্মবিজড়িত কোন অপূর্ব্ব কাহিনী, ইতিহাস-বর্ণিত কোন অমর অধ্যায়। মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, চতুঃষষ্টিযোগিনীর ঘাট, কেদারঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যাইলে, প্রহ্লাদ ঘাট, নারদ ঘাট, হনুমান ঘাট, তুলসী ঘাটে যাইলে, পঞ্চগঙ্গা ঘাট, ভোন্সলা ঘাট, মানমন্দির ঘাট, অহল্যা বাইয়ের ঘাট, শিবালা ঘাটে যাইলে, তোমার মনে কোন্ কথার উদয় হয় বল দেখি? কপিল ধারা, কোনার্ক কুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড, সারনাথ, শঙ্করের মঠ, তুলসী দাসজীর অখাড়া, পঞ্চক্রোশির পথ, কবীরচৌরা—কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়, বল দেখি? ফলতঃ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—যুগচতুষ্টয়ের—কীর্ত্তিস্মৃতি, কীর্ত্তিচিহ্ন কাশীধামে বিদ্যমান। ফলতঃ, কাশীধামে অতীত বর্ত্তমানবৎ দণ্ডায়মান, ভূত চক্ষের সমক্ষে ভাসমান। কাশীধামে ভূত ও বর্ত্তমানের এই মিলন বড়ই মধুর, বড়ই প্রীতিপ্রদ—অপিচ হিন্দুর, ভারতবর্ষের, ভবিষ্যতের ভিত্তি।

উপরে যে কবীরচৌরার উল্লেখ করিলাম, তাহা কাশীধামের একটী মহল্লার নাম। সে মহল্লায় সুরম্য প্রাসাদশ্রেণী সুশোভিত যে শ্বেত সুপ্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহার নামও কবীরচৌরা। চৌরা (চৌরাহ) অর্থ চৌপথ। মহাত্মা কবীরের নামে এই মহল্লা এবং পথের নাম—কবীরচৌরা।

এখন কবীর কি ছিলেন, কোন জাতি—হিন্দু না মুসলমান? নাম অনুসারে তিনি মুসলমান, জোলা জাতীয় মুসলমান ছিলেন। তাঁহার জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে নানা মত। "ভক্তি মাহাত্ম্য" গ্রন্থমতে, পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে জন্মে বস্ত্রক্রয়ার্থী হইয়া তিনি এক দিন এক জোলার বাড়ীতে যান। সেখানে বস্ত্র না পাইয়া নিজ আলয়ে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া পীড়িত হন। কিছুদিন পর তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্তকালে সেই বস্ত্রবিক্রেতা জোলার কথা স্মরণ করিতে করিতে তিনি তনুত্যাগ করেন। তাহাতেই পরজন্মে জোলাকুলে তাঁহার জন্ম হয়। অন্তকালে যে যে ভাবনা লইয়া মরে, পরজন্মে তাহার তদনুরূপ জন্ম হইয়া থাকে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

রাজর্ষি ভরত তাঁহার প্রিয় মৃগশাবকের কথা স্মরণ করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগত্ব লাভ করেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫

মৃত্যুকালেও যিনি কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমারই স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

কেবল কি তাহাই ?

যং যং বাপি স্মরণ্ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥ ৮।৬

হে কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে কেবল যে আমাকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই মদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে তাহা নয়। যে যে বিষয়ে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সেই চিরাভ্যস্ত ভাব লইয়া তনুত্যাগ নিবন্ধন সে সেই ভাবই পাইবে।

জীবদ্দশাতেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কাঁচপোকার ভয়ে ভীত হইয়া তৈলপায়িকা নিয়ত কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে জীবিতাবস্থাতেই নিজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কাঁচপোকার ভাবাপন্ন হইয়া যায়। নন্দীকেশ্বর সদাশিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কালে জীবিতাবস্থাতেই তিনি শিবরূপী হইয়াছিলেন। কবীরও বলিয়াছেন—

হরি সে লগ রহ ভাই।
তু বনত্ বনত্ বন যাই ॥
হরিতে লেগে থাক ভাই।
হ'তে হ'তে হ'য়ে যা'বে তাই ॥

যাহা হউক, কবীর জোলাকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

আবার "ভক্তমাল" গ্রন্থে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে আর একটী বিবরণ পাওয়া যায়।

একদা বিখ্যাত বৈষ্ণব রামানন্দের এক ব্রাহ্মণ শিষ্য স্বীয় বালবিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুগৃহে যান। কন্যা প্রণতা হইলে, "পুত্রবতী হও" বলিয়া রামানন্দ কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করেন। রামানন্দ জানিতেন না কন্যাটী বিধবা। কিন্তু ঋষি বাক্য অব্যর্থ। তিনি বলিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে কন্যাটী—হউক না কেন বিধবা—একটী পবিত্র গর্ভধারণ করিয়া এক পরম সাধু সন্তান প্রসব করিবে। যথাকালে কন্যা গর্ভবতী হইল, যথাকালে সন্তান প্রসূত হইল। কিন্তু লোকাপবাদ ভয়ে কন্যাটী সদ্য প্রসূত পুত্রটীকে কাশীর সমীপবর্ত্তী লহরতলাও নামে একটী সরোবরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। পরে নিমা নাম্নী জনৈক মুসলমান জোলা রমণী পুত্রটীকে লইয়া লালন পালন করে। এই জোলা রমণী পুত্রটীর নাম রাখে কবীর।

কবীরপন্থীগণ কবীরের এই জন্মবৃত্তান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কাশীর নিকট লহরতলাও সরোবরে পদ্মপত্রের উপর শিশুটী ভাসিতেছিল। কিন্তু পদ্মপত্রের উপর শিশুটী কখন, কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, অথচ জানিতে কৌতূহল হয়। যাহা হউক, নুরী নামক জনৈক জোলা নিজপত্নী নিমাসহ ঐ তলাও-তট দিয়া যাইতেছিল। নিমা শিশুটীকে সরোবর হইতে লইয়া আসে। শিশু নিমাকে বলে—আমায় কাশীতে লইয়া চল। শিশুর বাক্যে নুরী ও নিমা তাহাকে কোন উপদেবতা ভাবিয়া ভয় পায় এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শিশু তাহাদের ভয় অপনোদন করিলে তাহারা তাহাকে নিজ আলয়ে আনিয়া তাহাকে লালন পালন করে।

জন্মবৃত্তান্ত যাহাই হউক, কবীর নিজে বলিয়াছেন, তিনি জোলাকুলোৎপন্ন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবীর প্রাদুর্ভূত হন। ঠিক কোন সনে,—বৃদ্ধ ইতিহাস সে বিষয়ে নির্ব্বাক, অন্ততঃ অস্ফুটবাক্। কাহারো কাহারো মতে সম্ভবতঃ ১৪৪০ সনে কাশীধামে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকাল। সে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতে ব্যস্ত। একদিকে ধর্ম্ম জগতে সাদি, হাফিজ প্রভৃতি প্রগাঢ় দার্শনিক কবিগণের প্রবল প্রভাবে ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইতেছিল, অপরদিকে ভয়প্রদর্শন, দণ্ডবিধান, পদ ও অধিকার প্রদান, মুসলমানেতর জাতির নিকট হইতে জিজিয়া নামক কর গ্রহণ—এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছিল। এই কারণ-সমষ্টি উত্তর পশ্চিমের এবং বঙ্গদেশের নিম্ন শ্রেণীর বিস্তর হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, হিন্দুসমাজ দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে, অপর ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া হিন্দু বিপদ গণিলেন! হিন্দু তখন শাস্ত্র সঙ্কলন শাস্ত্রব্যাখ্যা, শাস্ত্রপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ দুর্ব্বোধ শাস্ত্রবাক্য বুঝিবে কেমন করিয়া? সুতরাং তাহাদিগকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ভাষায় বুঝাইবার জন্য যাঁহারা ব্রতী হইলেন, তাঁহাদের নাম হইল সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীদল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে যাইয়া সাধারণ ও অসাধারণ সকলকেই বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন—সমস্ত ধর্ম্মই মূলতঃ এবং স্থূলতঃ একই, মমস্ত ধর্ম্মই একেশ্বরবাদী। প্রত্যেক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড পরস্পর পৃথক, এমন কি বিরুদ্ধ, হইতে পারে, আচার অনুষ্ঠান পরস্পর পৃথক হইতে পারে; কারণ কর্ম্মকাণ্ডই বল, আর আচার অনুষ্ঠানই বল, উহা দেশকাল পাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, গুণ কর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ও বিভাগ; কিন্তু মূলতঃ এবং স্থূলতঃ যাবতীয় ধর্ম্মের লক্ষ্যই এক, পুরাণ ও কোরাণের একই উপদেশ—সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। যিনি অর্জ্জুনকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া স্বীয় বিরাট রূপ, অনন্ত রূপ প্রদর্শন করাইয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন, সে বিরাট রূপের মধ্যে কেবল হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থান নয়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত—সেই বিরাট-রূপী, সেই অনন্ত-রূপী ভগবানকে রামই বল আর রহীমই

বল, ব্রহ্মই বল আর আল্লাই বল, তাহা কেবল নামান্তর মাত্র, পদার্থান্তর নয়; তাহা ভেদসূচক নয়, তাঁহার অসীমত্ব, অনন্তত্ব-সূচক, তাহা একেরই বহুনাম, বহুসংজ্ঞা। সন্ন্যাসীদল দেশময় সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, ছড়াইয়া দিলে, তখনকার মত ধর্ম্মবিপ্লব থামিয়া গেল। এই সন্ন্যাসীদলের মধ্যে রামানন্দ স্বামী এবং তদীয় শিষ্য কবীরই প্রধান। উভয়েই বৈষ্ণব—বিষ্ণুর পরম ভক্ত। উত্তর-ভারতে উভয়েই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শ্রীরাম নাম প্রদান করিয়া, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের গতিরোধ করিলেন, অপিচ ধর্ম্মজগতে একটী যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

কবিরের গুরু কাশীবাসী রামানন্দস্বামী। রামানন্দ হিন্দু, কবীর মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। মুসলমানের মধ্যে এ প্রথা নাই। অথচ হিন্দুর নিকট একজন মুসলমান দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহা বিচিত্র নয় কি? বিশেষতঃ যে সময়ে মুসলমান হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতেছিল, সেই সময়ে। এমন কি, কবীরকে হিন্দুভাবাপন্ন দেখিয়া তৎকালে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদী তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রাণহানিকর শাস্তি প্রদান করেন—কখনো গভীর নদীবক্ষে, কখনো জ্বলন্ত অনল মধ্যে, কখনো বা মত্ত মাতঙ্গের পদতলে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতেও কবীর একটুও বিচলিত না হওয়াতে—বরং প্রহ্লাদের ন্যায় প্রতি বিপদ হইতে অক্ষত দেহে রক্ষা পাওয়াতে,—বাদশাহ বুঝিলেন, কবীর সিদ্ধ মহাপুরুষ। তখন তিনি কবীরের নিকটে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, মুসলমান হইয়া হিন্দুর নিকট মন্ত্রগ্রহণাভিলাষী হওয়া বিচিত্র নয় কি? ভাবিয়া দেখিলে, আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। কবীর ব্রাহ্মণ-বিধবা-কন্যাজাত, এই ঘটনাটী স্বীকার না করিলেও, তিনি পূর্ব্বজন্মে সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা মানিয়া লইতে কোন আপত্তি দেখিতেছি না। হিন্দু জন্মান্তরবাদী, সুতরাং পূর্ব্বসংস্কারবাদী। পরজন্মে তন্তুবায়ের কুলে কবীরের জন্ম হইলেও, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তিনি অল্প বয়স হইতেই জ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্বসংস্কার হিন্দুর নিকটে মন্ত্র লইবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই তিনি রামানন্দের নিকট মন্ত্র লইতে যান।

কিন্তু রামানন্দ যবনকে মন্ত্র দিতে অসম্মত হন। নিরুপায় হইয়া এক দিন রাত্রিতে কবীর রামানন্দের আশ্রম-দ্বারে যাইয়া শয়ন করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রামানন্দ স্নান উদ্দেশ্যে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইবেন বলিয়া আশ্রম হইতে যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি তাঁহার পদযুগল যবনদেহ স্পর্শ করিল, নয়নযুগল যবনমুখ অবলোকন করিল। তিনি অমনি "রাম রাম" বলিলেন। যবন কবীর ভাবিলেন—ইহাই ত মন্ত্র, এই মন্ত্রই আমায় দিলেন। তখন রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—

প্রথমহি রূপ জোলাহা কীন্হা।
চারিবরণ মোহি কাহু ন চীন্হা ॥
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরু পূজা কছু হমকো লেহু ॥

জন্মাবধি আমার জোলার রূপ। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণের কেহই আমায় চিনিতে পারে নাই। হে গুরু রামানন্দজী! আমায় দীক্ষা দিন এবং আমার নিকট হইতে গুরুপূজাস্বরূপ কিছু গ্রহণ করুন।

গুরু-শিষ্যে ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় তর্ক-বিতর্ক হইত। তর্কে গুরু কখনো কখনো পরাজিত হইতেন, অন্ততঃ উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইত। কালে মতভেদনিবন্ধন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। কাহারো কাহারো এই মত। বিশেষ প্রমাণ অভাবে এই মতটীকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ গুরু ও ব্রহ্মে যাঁহার অভেদজ্ঞান, তিনি গুরুবিদ্বেষী কখনই হইতে পারেন না।

কবীর গুরুগোবিন্দ দৌ এক হয় দুজা হয় আকার।
অংশমিটে হরিভজে তব পাওয়ে করতার ॥

গুরু গোবিন্দ দুইই এক, কেবল আকার-ভেদ মাত্র। ভজন দ্বারা ভেদবুদ্ধি লোপ পাইলে একত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

গুরুকো মানুষ জানত তে নর কহিয়ে অন্ধ।
হোয় দুখী সংসারমে আগে যমকা ফন্দ ॥

গুরুকে যে ব্যক্তি মানুষ বলিয়া জানে, সে অন্ধ। এ সংসারে দুঃখ ভোগ করিয়া, পরে সে যমের ফান্দে পড়ে।

গুরু সমান দাতা নহি যাচক শিষ্য সমান।
চারলোককি সম্পদ সো গুরু দিনহি দান ॥

গুরুর সমান দাতা এবং শিষ্যের সমান যাচক নাই। যে ভগবান চারিলোকের সম্পদ, গুরু শিষ্যকে সেই সম্পদ দান করিয়া থাকেন।

গুরু সম্বন্ধে যাঁহার এই জ্ঞান, তিনি কখনই গুরুবিদ্বেষী হইতে পারেন না। সাধনবলে শিষ্য উচ্চে উঠিলে, সে কি গুরুর প্রতি ভক্তিহীন হয়? বরং সে সততই ভাবে, তাহার উন্নতির মূলে গুরুচরণ, গুরুদত্ত মন্ত্র, গুরুদত্ত নেত্র। সে সততই ভাবে—যতই উচ্চে উঠিয়া থাকুক না কেন—গুরুপদতলই তাহার আশ্রয়, গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানালোকই তাহার ইহকাল ও পরকালের পথপ্রদর্শক। শিষ্য জ্ঞানমার্গের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া থাকিলেও, সে গুরুদাস। গুরুপ্রদত্ত ঐ জ্ঞানালোকটী নির্ব্বাপিত হইলে, শিষ্য—দিশাহারা, পথহারা, অন্ধ। সুতরাং উক্ত মতটা আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

কৃচ্ছ্র জপ তপ, ধ্যান ধারণায় সাধারণ লোককে অশক্ত দেখিয়া কবীর শব্দযোগ শিক্ষা দেন। শব্দই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ভগবান শব্দ রূপে সর্ব্বঘটে বিদ্যমান। সাধনবলে নিজ নিজ দেহ মধ্যেই সেই শব্দ শ্রবণগোচর হইতে পারে।

কবীর রগ রগ বোলে রামজী, রোম রোম ঝঙ্কার।
সহজই ধ্বনি লাগি রহে কহহি কবীর বিচার ॥

কবীর বিচার করিয়া বলিতেছেন—তোমার প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক

রাজর্ষি ভরত তাঁহার প্রিয় মৃগশাবকের কথা স্মরণ করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগত্ব লাভ করেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫

মৃত্যুকালেও যিনি কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমারই স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

কেবল কি তাহাই ?

যং যং বাপি স্মরণভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥ ৮।৬

হে কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে কেবল যে আমাকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই মদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে তাহা নয়। যে যে বিষয়ে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সেই চিরাভ্যস্ত ভাব লইয়া তনুত্যাগ নিবন্ধন সে সেই ভাবই পাইবে।

জীবদ্দশাতেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কাঁচপোকার ভয়ে ভীত হইয়া তৈলপায়িকা নিয়ত কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে জীবিতাবস্থাতেই নিজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কাঁচপোকার ভাবাপন্ন হইয়া যায়। নন্দীকেশ্বর সদাশিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কালে জীবিতাবস্থাতেই তিনি শিবরূপী হইয়াছিলেন। কবীরও বলিয়াছেন—

হরি সে লগ রহ ভাই।
তু বনত্ বনত্ বন যাই ॥
হরিতে লেগে থাক ভাই।
হ'তে হ'তে হ'য়ে যা'বে তাই ॥

যাহা হউক, কবীর জোলাকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

আবার "ভক্তমাল" গ্রন্থে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে আর একটী বিবরণ পাওয়া যায়।

একদা বিখ্যাত বৈষ্ণব রামানন্দের এক ব্রাহ্মণ শিষ্য স্বীয় বাল-বিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুগৃহে যান। কন্যা প্রণতা হইলে, "পুত্রবতী হও" বলিয়া রামানন্দ কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করেন। রামানন্দ জানিতেন না কন্যাটী বিধবা। কিন্তু ঋষি বাক্য অব্যর্থ। তিনি বলিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে কন্যাটী—হউক না কেন বিধবা—একটী পবিত্র গর্ভধারণ করিয়া এক পরম সাধু সন্তান প্রসব করিবে। যথাকালে কন্যা গর্ভবতী হইল, যথাকালে সন্তান প্রসূত হইল। কিন্তু লোকাপবাদ ভয়ে কন্যাটী সদ্য প্রসূত পুত্রটীকে কাশীর সমীপবর্ত্তী লহরতলাও নামে একটী সরোবরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। পরে নিমা নাম্নী জনৈক মুসলমান জোলা রমণী পুত্রটীকে লইয়া লালন পালন করে। এই জোলা রমণী পুত্রটীর নাম রাখে কবীর।

কবীরপন্থীগণ কবীরের এই জন্মবৃত্তান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কাশীর নিকট লহরতলাও সরোবরে পদ্মপত্রের উপর শিশুটী ভাসিতেছিল। কিন্তু পদ্মপত্রের উপর শিশুটী কখন, কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, অথচ জানিতে কৌতূহল হয়। যাহা হউক, নুরী নামক জনৈক জোলা নিজপত্নী নিমাসহ ঐ তলাও-তট দিয়া যাইতেছিল। নিমা শিশুটীকে সরোবর হইতে লইয়া আসে। শিশু নিমাকে বলে—আমায় কাশীতে লইয়া চল। শিশুর বাক্যে নুরী ও নিমা তাহাকে কোন উপদেবতা ভাবিয়া ভয় পায় এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শিশু তাহাদের ভয় অপনোদন করিলে তাহারা তাহাকে নিজ আলয়ে আনিয়া তাহাকে লালন পালন করে।

জন্মবৃত্তান্ত যাহাই হউক, কবীর নিজে বলিয়াছেন, তিনি জোলাকুলোৎপন্ন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবীর প্রাদুর্ভূত হন। ঠিক কোন সনে,—বৃদ্ধ ইতিহাস সে বিষয়ে নির্ব্বাক, অন্ততঃ অস্ফুটবাক্। কাহারো কাহারো মতে সম্ভবতঃ ১৪৪০ সনে কাশীধামে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকাল। সে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতে ব্যস্ত। একদিকে ঐ জগতে সাদি, হাফিজ প্রভৃতি প্রগাঢ় দার্শনিক কবিগণের প্রবল প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইতেছিল, অপরদিকে ভয়প্রদর্শন, দণ্ডবিধান, পদ ও অধিকার প্রদান, মুসলমানেতর জাতির নিকট হইতে জিজিয়া নামক কর গ্রহণ—এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছিল। এই কারণ-সমষ্টি উত্তর পশ্চিমের এবং বঙ্গদেশের নিম্ন শ্রেণীর বিস্তর হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, হিন্দুসমাজ দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে, অপর ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া হিন্দু বিপদ গণিলেন! হিন্দু তখন শাস্ত্র সঙ্কলন শাস্ত্রব্যাখ্যা, শাস্ত্রপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ দুর্ব্বোধ শাস্ত্রবাক্য বুঝিবে কেমন করিয়া? সুতরাং তাহাদিগকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ভাষায় বুঝাইবার জন্য যাঁহারা ব্রতী হইলেন, তাঁহাদের নাম হইল সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীদল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে যাইয়া সাধারণ ও অসাধারণ সকলকেই বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন—সমস্ত ধর্ম্মই মূলতঃ এবং স্থূলতঃ একই, সমস্ত ধর্ম্মই একেশ্বরবাদী। প্রত্যেক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড পরস্পর পৃথক, এমন কি বিরুদ্ধ, হইতে পারে, আচার অনুষ্ঠান পরস্পর পৃথক হইতে পারে; কারণ কর্ম্মকাণ্ডই বল, আর আচার অনুষ্ঠানই বল, উহা দেশকাল পাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, গুণ কর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ও বিভাগ; কিন্তু মূলতঃ এবং স্থূলতঃ যাবতীয় ধর্ম্মের লক্ষ্যই এক, পুরাণ ও কোরাণের একই উপদেশ—সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। যিনি অর্জ্জুনকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া স্বীয় বিরাট রূপ, অনন্ত রূপ প্রদর্শন করাইয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন, সে বিরাট রূপের মধ্যে কেবল হিন্দুস্থান ও আফগানিস্থান নয়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত—সেই বিরাট-রূপী, সেই অনন্ত-রূপী ভগবানকে রামই বল আর রহীমই

বল, ব্রহ্মই বল আর আল্লাই বল, তাহা কেবল নামান্তর মাত্র, পদার্থান্তর নয়; তাহা ভেদসূচক নয়, তাঁহার অসীমত্ব, অনন্তত্ব-সূচক, তাহা একেরই বহুনাম, বহুসংজ্ঞা। সন্ন্যাসীদল দেশময় সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, ছড়াইয়া দিলে, তখনকার মত ধর্ম্মবিপ্লব থামিয়া গেল। এই সন্ন্যাসীদলের মধ্যে রামানন্দ স্বামী এবং তদীয় শিষ্য কবীরই প্রধান। উভয়েই বৈষ্ণব—বিষ্ণুর পরম ভক্ত। উত্তর-ভারতে উভয়েই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শ্রীরাম নাম প্রদান করিয়া, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের গতিরোধ করিলেন, অপিচ ধর্ম্মজগতে একটী যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

কবিরের গুরু কাশীবাসী রামানন্দস্বামী। রামানন্দ হিন্দু, কবীর মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। মুসলমানের মধ্যে এ প্রথা নাই। অথচ হিন্দুর নিকট একজন মুসলমান দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহা বিচিত্র নয় কি? বিশেষতঃ যে সময়ে মুসলমান হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতেছিল, সেই সময়ে। এমন কি, কবীরকে হিন্দুভাবাপন্ন দেখিয়া তৎকালে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদী তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রাণহানিকর শাস্তি প্রদান করেন—কখনো গভীর নদীবক্ষে, কখনো জ্বলন্ত অনল মধ্যে, কখনো বা মত্ত মাতঙ্গের পদতলে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতেও কবীর একটুও বিচলিত না হওয়াতে—বরং প্রহ্লাদের ন্যায় প্রতি বিপদ হইতে অক্ষত দেহে রক্ষা পাওয়াতে,—বাদশাহ বুঝিলেন, কবীর সিদ্ধ মহাপুরুষ। তখন তিনি কবীরের নিকটে ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, মুসলমান হইয়া হিন্দুর নিকট মন্ত্রগ্রহণাভিলাষী হওয়া বিচিত্র নয় কি? ভাবিয়া দেখিলে, আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। কবীর ব্রাহ্মণ-বিধবা-কন্যাজাত, এই ঘটনাটী স্বীকার না করিলেও, তিনি পূর্ব্বজন্মে সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা মানিয়া লইতে কোন আপত্তি দেখিতেছি না। হিন্দু জন্মান্তরবাদী, সুতরাং পূর্ব্বসংস্কারবাদী। পরজন্মে তন্তুবায়ের কুলে কবীরের জন্ম হইলেও, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তিনি অল্প বয়স হইতেই জ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্বসংস্কার হিন্দুর নিকটে মন্ত্র লইবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই তিনি রামানন্দের নিকট মন্ত্র লইতে যান।

কিন্তু রামানন্দ যবনকে মন্ত্র দিতে অসম্মত হন। নিরুপায় হইয়া এক দিন রাত্রিতে কবীর রামানন্দের আশ্রম-দ্বারে যাইয়া শয়ন করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রামানন্দ স্নান উদ্দেশ্যে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইবেন বলিয়া আশ্রম হইতে যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি তাঁহার পদযুগল যবনদেহ স্পর্শ করিল, নয়নযুগল যবনমুখ অবলোকন করিল। তিনি অমনি "রাম রাম" বলিলেন। যবন কবীর ভাবিলেন—ইহাই ত মন্ত্র, এই মন্ত্রই আমায় দিলেন। তখন রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—

প্রথমহি রূপ জোলাহা কীন্হা।
চারিবরণ মোহি কাঁহু ন চীন্হা ॥
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরু পূজা কছু হমকো লেহু ॥

জন্মাবধি আমার জোলার রূপ। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণের কেহই আমায় চিনিতে পারে নাই। হে গুরু রামানন্দজী! আমায় দীক্ষা দিন এবং আমার নিকট হইতে গুরুপূজাস্বরূপ কিছু গ্রহণ করুন।

গুরু-শিষ্যে ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় তর্ক-বিতর্ক হইত। তর্কে গুরু কখনো কখনো পরাজিত হইতেন, অন্ততঃ উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইত। কালে মতভেদনিবন্ধন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। কাহারো কাহারো এই মত। বিশেষ প্রমাণ অভাবে এই মতটীকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ গুরু ও ব্রহ্মে যাঁহার অভেদজ্ঞান, তিনি গুরুবিদ্বেষী কখনই হইতে পারেন না।

কবীর গুরুগোবিন্দ দৌ এক হয় দুজা হয় আকার।
অংশমিটে হরিভজে তব পাওয়ে করতার ॥

গুরু গোবিন্দ দুইই এক, কেবল আকার-ভেদ মাত্র। ভজন দ্বারা ভেদবুদ্ধি লোপ পাইলে একত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

গুরুকো মানুষ জানত তে নর কহিয়ে অন্ধ।
হোয় দুখী সংসারমে আগে যমকা ফন্দ ॥

গুরুকে যে ব্যক্তি মানুষ বলিয়া জানে, সে অন্ধ। এ সংসারে দুঃখ ভোগ করিয়া, পরে সে যমের ফান্দে পড়ে।

গুরু সমান দাতা নহি যাচক শিষ্য সমান।
চারলোককি সম্পদ সো গুরু দিনহি দান ॥

গুরুর সমান দাতা এবং শিষ্যের সমান যাচক নাই। যে ভগবান চারিলোকের সম্পদ, গুরু শিষ্যকে সেই সম্পদ দান করিয়া থাকেন।

গুরু সম্বন্ধে যাঁহার এই জ্ঞান, তিনি কখনই গুরুবিদ্বেষী হইতে পারেন না। সাধনবলে শিষ্য উচ্চে উঠিলে, সে কি গুরুর প্রতি ভক্তিহীন হয়? বরং সে সততই ভাবে, তাহার উন্নতির মূলে গুরুচরণ, গুরুদত্ত মন্ত্র, গুরুদত্ত নেত্র। সে সততই ভাবে—যতই উচ্চে উঠিয়া থাকুক না কেন—গুরুপদতলই তাহার আশ্রয়, গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানালোকই তাহার ইহকাল ও পরকালের পথপ্রদর্শক। শিষ্য জ্ঞানমার্গের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া থাকিলেও, সে গুরুদাস। গুরুপ্রদত্ত ঐ জ্ঞানালোকটী নির্ব্বাপিত হইলে, শিষ্য—দিশাহারা, পথহারা, অন্ধ। সুতরাং উক্ত মতটা আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

কৃচ্ছ্র জপ তপ, ধ্যান ধারণায় সাধারণ লোককে অশক্ত দেখিয়া কবীর শব্দযোগ শিক্ষা দেন। শব্দই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ভগবান শব্দ রূপে সর্ব্বঘটে বিদ্যমান। সাধনবলে নিজ নিজ দেহ মধ্যেই সেই শব্দ শ্রবণগোচর হইতে পারে।

কবীর রগ রগ বোলে রামজী, রোম রোম ঝঙ্কার।
সহজই ধ্বনি লাগি রহে কহহি কবীর বিচার ॥

কবীর বিচার করিয়া বলিতেছেন—তোমার প্রত্যেক শিরা, প্রত্যেক

লোমকূপ হইতে রামনাম ধ্বনিত হইতেছে, দেহমধ্যে রামনামের ঝঙ্কার নিয়ত লাগিয়াই রহিয়াছে।

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

রসোঽহমপসু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥

গীতা ৭।৮

হে কৌন্তেয়! জলপদার্থের সারভূত যে রস, আমাকে সেই রস বলিয়াই জানিবে। চন্দ্রসূর্য্যে আমি প্রভা রূপে, সর্ব্ববেদে প্রণব রূপে, আকাশে শব্দরূপে, নরে পৌরুষরূপে আমি অবস্থিত।

"ইড়া পিঙ্গল ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী"—এ স্থলে স্মরণ করিলেই হয়।

তুমি যদি বধির অথবা অদন্তকর্ণ হও, তবে তুমি মন্দভাগ্য।

তুমি যেয়সা রাম পর, তুম পর তেয়সা রাম।
দাহিনে যাও ত দাহিনে যায়, বামে যাও ত বাম॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তোমার প্রীতি যদ্রূপ, তোমার প্রতিও তাঁহার প্রীতি তদ্রূপ। তুমি দক্ষিণে গেলে, তিনিও দক্ষিণে যাইবেন, তুমি বামে গেলে তিনিও বামে যাইবেন।

জপ সম্বন্ধে কবীর বলেন—

মালা তো করমে ফিরে, জিভ ফিরে মুখ মাহি।
মনুআ তো দহদিশ ফিরে, এতো সুমিরণ নাঁহি॥

মালা ফিরিতেছে করে, জিহ্বা ফিরিতেছে মুখমধ্যে, মন ফিরিতেছে দশদিক—ইহার নাম জপ নয়।

মালা ফেরত, মন খুশী, তাতে কছু ন হোয়।
মনমালাকো ফেরত, ঘট উজীয়ারী হোয়॥

মালা ফিরাইলে মনে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন লাভ নাই। মনমালা যদি ফিরাইতে পার, তবেই দেহাভ্যন্তর দীপ্তিশীল হইবে।

নামের শক্তি সম্বন্ধে কবীর বলেন—

নাম যো রত্তি এক হয়, পাপ যো রত্তি হাজার।
আধ রত্তি ঘট সঞ্চরে, জর করে সব ছার॥

নাম এক রতি, পাপ হাজার রতি। অর্দ্ধরতি নাম দেহে সঞ্চারিত হইলে পাপপুঞ্জ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সুতরাং—

নাম জপত কুষ্ঠী ভলা, চুই চুই পড়ে যো চাম।
কাঞ্চনদেহ কিস্ কিস্ কাম কি, যা মুখ নহি নাম॥

গলিত কুষ্ঠরোগী, যাহার দেহ হইতে চর্ম্ম খসিয়া পড়িতেছে, সে যদি নাম জপ করে, তবে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। স্বর্ণঅঙ্গ লইয়া যদি নাম জপ না করে, সে অঙ্গে কি প্রয়োজন?

কবীর বলেন ফলকামী সেবক সেবকই নয়।

ফল কারণ সেবা করে, ত্যজে ন মনসে কাম।
কহে কবীর সেবক নহি, চাহে চৌগুণা দাম॥

মন হইতে কামনা ত্যাগ না করিয়া ফল হেতু যে সেবা করে, সে সেবকই নয়—সেবার জন্য সে চতুর্গুণ মূল্য চাহিয়া থাকে।

নিন্দক সম্বন্ধে কবীর বলেন—

নিন্দক দূর ন কিজিয়ে, কিজৈ আদর মান।
নিরমল তনমন যা করে, ওয়াকে আনহি আন॥

নিন্দককে দূর করিয়া দিও না; বরং তাহার আদর সম্মান করিও। নিন্দা করিয়া সে লোকের দেহ মন নির্ম্মল করিয়া থাকে।

কবীর নিন্দক মত মরো; জীয়ো আদ জুগাদ।
হমতো সদগুরু পাওয়া, নিন্দককে প্রসাদ॥

নিন্দক! তুমি মরিও না; আদি অনাদিকাল বাঁচিয়া থাক। তোমার প্রসাদে আমার সদগুরু লাভ হইয়াছে।

নিন্দকের মৃত্যু সংবাদে কবীরের শোক—

নিন্দক বেচারা মর গিয়া, কবীরা বৈঠে রোয়।
পাপ সফা করতা ধোবী যেয়সা ময়লা ধোয়॥

নিন্দক বেচারা মরিয়া গেল, কবীর বসিয়া রোদন করিতেছেন। রজক যেমন মলিন বসন ধুইয়া দেয়, নিন্দকও তদ্রূপ আমার পাপ পরিষ্কার করিয়া দিত।

কবীর নিরামিস আহারের পক্ষপাতী, মৎস্য আহারের ঘোর বিরোধী।

তিলভর মছলী খায়কর, কোটি গৌ দে দান।
কাশীকর বটলে মরে, তওভি নরক নিদান॥

একতিল পরিমাণ মৎস্য আহার করিয়া এক কোটি গো দানই কর, আর কাশীবাস করিয়া কাশীতেই তনুত্যাগ কর—তোমার নরক অনিবার্য্য।

মহাত্মা কবীরের নিন্দক বিষয়ক উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত উক্তি তাহার মনের দৃঢ়তা এবং চরিত্রবলব্যঞ্জক। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা লোকাপবাদ ভীতি প্রদর্শন না করিয়া, তেজঃ, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। কর্ত্তব্যের পথে লোকনিন্দাকে তিনি কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না। যদি তাহাই করিতেন, তবে তাঁহার সদ্‌গুরু লাভ হইত না। এক দিকে লোক নিন্দা, অপর দিকে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। অবশেষে প্রবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সমক্ষে, দুর্ব্বল লোকনিন্দা সঙ্কুচিত, পরাভূত, পলায়নপরায়ণ হইত, নিন্দা স্তুতিতে পরিণত হইত—নিন্দক স্তাবক হইত। "পাছে লোকে কি বলে"—এই একটা কথা প্রচলিত আছে। সঙ্কল্পের পূর্ব্বে সম্যক বিচার, বিবেচনা করিয়া দেখিবে, সঙ্কল্পটী এমন কিছু নয় ত যাহা কার্য্যে পরিণত করিলে "পাছে লোকে কি বলে।" কিন্তু সঙ্কল্প যখন স্থির করিয়াছি—হউক না কেন তোমার সঙ্কল্প সঙ্গত বা অসঙ্গত, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তাহা মতভেদ মাত্র—তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক দিকে, তোমার সঙ্কল্প অপর দিকে; তখন যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন এক দিকে, তোমার সঙ্কল্প অপর দিকে; তখন ভগবান এক দিকে, ভীষ্মদেব

ভারতবর্ষ

বুলবুল

শিল্পী—ইনায়েৎ হোসেন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

অপর দিকে। তখন তোমার সঙ্কল্প হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবার তোমার অধিকার নাই, একটী আদর্শ জীবন হইতে জগৎকে বঞ্চিত করিবার তোমার অধিকার নাই—সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইয়া হীন, কাপুরুষের চিত্র জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার অধিকার নাই। জানিয়া রাখ, আরাম-কেদারা বা নরম-তাকিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রতিকূল। কত সাধু-সঙ্কল্প নিন্দাবাক্যবিদ্ধ হইয়া জগতের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে ?

অথচ লোকনিন্দা বা নিন্দককে মহাত্মা কবীর উপেক্ষা বা অবজ্ঞাও করিতেন না, বরং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন—ভীতিবশতঃ নয়, নিন্দককে তিনি মিত্র, হিতৈষী জ্ঞান করিতেন। স্তাবক—সমক্ষে বা পরোক্ষে—স্তুতি দ্বারা মানুষকে অধঃপাতিত করে ; নিন্দক—সমক্ষে বা পরোক্ষে—নিন্দা দ্বারা মানুষকে উন্নত করে। স্তাবক স্তুতি দ্বারা মানুষের চিত্তে অহঙ্কার বহ্নি আরও প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেয়—বলিয়া দেয়, তুমি কত বড়, উচ্চ, মহান ; নিন্দক নিন্দা দ্বারা অহঙ্কার বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়—বলিয়া দেয়, তুমি কত ছোট, হীন, জঘন্য, নগণ্য। স্তাবক মানুষের দোষ গোপন করিয়া রাখে, নিন্দক মানুষের দোষ উদ্‌ঘাটিত, প্রকাশিত করিয়া দেয়। স্তাবক শত্রু, সুতরাং পরিহর্তব্য ; নিন্দক বন্ধু, সুতরাং আদরযোগ্য। সুধিজন নিন্দকের বাক্যে সতর্ক, সাবধান, দোষসংস্কার-পরায়ণ হইয়া থাকেন। দোষ নাই কাহার ? কিন্তু দোষ দেখাইয়া দেয় কে ? সংশোধন করিয়া দেয় কে ? মানুষকে মানুষ করিয়া দেয় কে ? শুভ্র, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক করিয়া দেয় কে ? উচ্চ, উন্নত, উজ্জ্বল, করিয়া দেয় কে ? কবীর করিয়া দেয় কে ? রঞ্জক না মোদক ? মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—রঞ্জক, নিন্দক।

কবীরের সময়ে তিনি একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানভক্তিবিশ্রিত গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ, মাতোয়ারা হইতেন।

কবীরের দোঁহাবলী সরল হিন্দী ভাষায় রচিত। তাঁহার দোঁহাবলীতে উর্দ্দু শব্দ অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়—অথচ তিনি মুসলমান ছিলেন। তাঁহার দোঁহাবলী কেবল জ্ঞান উপদেশ নয়—তাঁহার জ্ঞান ও অনুভূতির উচ্ছ্বাস। তিনি নিরক্ষর কবি ছিলেন। তন্ত তাঁহার জীবনোপায় ছিল। তিনি সরল, সাধারণ সংসারী ছিলেন। তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল। কিন্তু সংসারে বাস করিয়াও তিনি সংসারের বাহিরে বাস করিতেন। সংসারে বিচরণ করিলেও তিনি সংসারের বাহিরে ভ্রমণ করিতেন। ভূলোকবাসী হইলেও, নীড়নিবাসী বিহঙ্গের ন্যায়, তিনি গগনবিহারী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত কেবল ক্ষুদ্র সংসারে লিপ্ত থাকিত না—তাঁহার চিত্ত নিয়ত ধাবিত হইত, বালককাল হইতেই, বিরাট, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডপতির দিকে। তথাপি তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"অরে দিল। প্রেমনগরকা অন্ত ন পাওয়া।" "রে মন। প্রেম নগরের অন্ত পাইলাম না।" হাতে তাঁহার তন্ত, মনে তাঁহার ব্রহ্ম। কালে হাতের তন্ত হাতেই থাকিত, মনের ব্রহ্ম বাহ্যাভ্যন্তরে তাঁহাকে ব্রহ্মই দেখাইত। সরল, নির্ম্মল না হইলে—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে—ব্রহ্মদর্শন ঘটে না, ঘটিতে পারে না। যে সংসারের সরলতা তাঁহার শত্রুকে মিত্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার প্রতি লোকের ঘৃণাকে শ্রদ্ধায় পরিণত করিয়াছিল, ভগবদ্‌জ্ঞানলাভের পথ প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, সেই সরলতা, নির্ম্মল নির্ঝরিণীর ন্যায়, তাঁহার দোঁহাবলীতে প্রবাহিত। সেইজন্য তাঁহার দোঁহাবলী হৃদয়স্পর্শী—উত্তর পশ্চিমে আদরের ধন, অমূল্য রত্ন, অমৃত-মধুর—ধর্ম্মপিপাসুর শান্তিবারি।

কিন্তু কবীর কেবল জ্ঞানী, কেবল ভক্ত, কেবল গায়ক, কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। সমস্ত গুণই ঔদার্য্যের সহচর—সমস্ত দোষই সঙ্কীর্ণতার সঙ্গী। এক দিনের ঘটনা বলিতেছি। তখন শীতকাল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ শীতে কম্পান্বিত-কলেবর। কবীর একখানি বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন। দরিদ্র বৃদ্ধটী কবীরের নিকট বস্ত্রখানি চাহিল। কবীর তৎক্ষণাৎ তাহাকে বস্ত্রখানি দিলেন। দিয়া মনে হইল, আজ গৃহে ত অন্ন নাই। শূন্য হস্তে ফিরিয়া গিয়া মাকে কি দিব ? যাহা হউক, আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, দরিদ্রের শীত নিবারণের ত একটা উপায় হইল। তাহাতেই আমার তৃপ্তি। কবীর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা রন্ধনাদি শেষ করিয়া পুত্রের অপেক্ষা করিতেছেন। কবীর দেখিয়া অবাক। জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা আমাদের ত আজ কিছুই ছিল না, তুমি এ সব সামগ্রী কোথায় পাইলে ?"

মা। সে কি বাবা ? তুমিই ত লোক দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছ।

কবীর। মা, 'ধন্য' তুমি, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং আসিয়া তোমায় অর্থ দিয়া গিয়াছেন। দান কর, মা, দান কর—দীন দুঃখীজনকে মনের সাধে, দুই হাতে, দান কর। ধনে আমাদের কি প্রয়োজন মা ?

মাতা তাহাই করিলেন।

কবীর কাশীবাসী সকলেরই ভক্তিভাজন হইলেন। কিন্তু এখনও কবীরের ইন্দ্রিয়সংযমের পরীক্ষা হয় নাই। এক দিন নৃত্য-গীতাদি-নিপুণা নানা-সুখ উপভোগার্থিনী একটী সুন্দরী রমণী তাঁহার আলয়ে আসিয়া স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করিল।

কবীর। আমি সুখভোগ জানি না। আমি না পুরুষ, না স্ত্রী। আমার নিকট তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

রমণী। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, নিরাশ হইয়া আমায় কি ফিরিয়া যাইতে হইবে ?

কবীর। না, তা কেন ? আমার ঘরে শ্রীহরি আছেন। তুমি তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি দ্বারা তুষ্ট করিতে পার।

কবীরের বাড়ীতে বাস করিয়া রমণী প্রত্যহ শ্রীহরিকে ভজন শুনাইতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে, কবীরের সহিত তাহার ভোগ-বাসনা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। এক দিন গভীর নিশায়, কবীর যে

ঘরে নিদ্রিত ছিলেন, নিজ বাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে রমণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই দেখিল—কবীর সে ঘরে নাই, সে ঘরে আছেন শ্রীহরি!

রমণীর চক্ষু ফুটিল, কামলিপ্সা তিরোহিত হইল, জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে বনবাসিনী হইল—হরিনাম সার করিল। কবীরের পরীক্ষা শেষ হইল, আর সেই সঙ্গে একটী পতিতার উদ্ধার হইল। দৃঢ়নিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ, কলঙ্কোজ্জ্বলচেতা মহাপুরুষ অচল, অটল, অবিচলিত রহিলেন, রিপু-জয়ী মহাত্মার শুভ্রযশঃশৈল অম্বরচুম্বিত রজতগিরিসন্নিভ সমুন্নত, সমুজ্জ্বল দিক্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া রহিল—আর সেই সঙ্গে একটী অঙ্গার অগ্নি-সন্নিধানে আসিয়া অগ্নিময় হইয়া গেল, সতের সঙ্গে সৎ হইল। "ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্যও সাধু সঙ্গই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকা-স্বরূপ, এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

বৃদ্ধ বয়সে, ভগ্নস্বাস্থ্যে, ১৫১৮ সালে কবীরের তিরোভাব হয়। মৃত্যুকালে মণিকর্ণিকাঘাটে সকলে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার শবদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয়। যে বস্ত্র দ্বারা শবদেহ আবৃত ছিল, তাহা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সকলে দেখিল, শব নাই, কতকগুলি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। তৎকালের কাশীনরেশ মহারাজ বীরসিংহ সেই ফুলের কতকগুলি দাহ করাইলেন। সেই পুষ্পভস্ম যে স্থানে সমাহিত হইল, তাহার নাম কবীর চৌরা। বক্রী ফুলগুলি পাঠানরাজ বিজলি খাঁ গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মৃত্যুভূমি মগরগ্রামে স্থাপন করাইয়া তদুপরি সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। শবজনিত বিবাদ থামিল। এমন মধুর বিবাদের কারণ জগতে হইতে পারিয়াছেন কয় জন?

আজি চারিশতাধিক বৎসর অতীত হইল, জলের ন্যায় ভাসিয়া গেল,—কবীরের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে—প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে মহাপ্রাণে, সান্ত মিশিয়া গিয়াছে অনন্তে, জীবাত্মা মিশিয়া গিয়াছে পরমাত্মায়। রূপ গিয়াছে, নাম আছে—কবীর অমর। কবীর হিন্দু নহেন, কবীর মুসলমান নহেন, কোন জাতি বিশেষ নহেন—কবীর সর্ব্বজাতি বহির্ভূত। কবীর হিন্দুর নহেন, কবীর মুসলমানের নহেন, কোন জাতি বিশেষের নহেন—কবীর বিশ্বজগতের। যে ডাকিত কবীর তাহারই, যে না ডাকিবে, কবীর তাহারও। হিন্দু ডাকিয়াছে, কবীর হিন্দুর; মুসলমান ডাকিয়াছে, কবীর মুসলমানের। আর কেহ ডাকিতে চাও ডাকো, কবীর তাহারও। কোহিনূর হিন্দুর ঘর আলোকিত করিয়াছে, মুসলমানের ঘর আলোকিত করিয়াছে, খৃষ্টানের ঘর আলোকিত করিতেছে। কোহিনূরের ধর্ম্মই ঘর আলোকিত করা—যে ঘরেই যাউক না কেন। মন্দিরে আলোক জ্বলিতেছে, মসজিদে আলোক জ্বলিতেছে, গির্জ্জাগৃহে আলোক জ্বলিতেছে। আলোককে জিজ্ঞাসা কর—"আলোক, তুমি কি মন্দিরের, না মসজিদের, না গির্জ্জা ঘরের আলোক?" আলোক বলিবে—"যে আমায় বসাইবে আমি তাহারই, যে আমায় না বসাইবে আমি তাহারও। নাশ ও প্রকাশ করাই আমার ধর্ম্ম। জগতের অন্ধকার নাশ করিয়া, জগৎকে আমি আলোকিত করিয়া থাকি। আমার কাছে ভেদ নাই, সকলেই সমান। আমি কাহাকেও বঞ্চিত করি না,—কেহ আমায় ডাকুক বা না ডাকুক। আপনার কর্ম্ম, আপনার ধর্ম্ম, পালন করিয়া চলিতেছি, অথচ আমি কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অতীত।"

কবীর বলিয়াছেন—"আমি পুরুষও নই, স্ত্রীও নই; আমি ধার্ম্মিকও নই, অধার্ম্মিকও নই; আমি বিধি-নিষেধের অতীত; আমি বক্তাও নই, শ্রোতাও নই; আমি প্রভুও নই, ভৃত্যও নই; আমি অধীনও নই, স্বাধীনও নই; আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই; আমি দূরেও নই, কাছেও নই; আমি নরকেও যাইব না; স্বর্গেও যাইবনা; আমি সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা; আমি দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু যেজন আমায় জানিতে পারে, সে উদাসীন; কবীর কিছুই সংস্থাপিত বা ধ্বংস করিতে চায় না।"

কবীরের এই উক্তি এই অনুভূতি শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য দেবের উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়ঃ—

নাহং দেহো জন্মমৃত্যুঃ কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসা কুতো মে
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥
আত্মষটক।৬।

আমি দেহ নই, সুতরাং আমার জন্মমৃত্যু কোথায়? আমি প্রাণ নই, সুতরাং আমার ক্ষুৎপিপাসা কোথায়? আমি চিত্ত নই, সুতরাং আমার শোক মোহ কোথায়? আমি কর্ত্তা নই, সুতরাং আমার বন্ধন মোক্ষ কোথায়?

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মে দ্বেষ্ রাগৌ ন মে লোভ মোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্যঃ—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য, ভোক্তা নই, আমি জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ শিব। আমার দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যভাব নাই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নাই; আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব। আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতি-ভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু, শিষ্য কিছুই নাই; আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব। আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু ও সর্ব্বব্যাপী; আমার বন্ধন, মুক্তি, ভয় কিছুই নাই; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব।

এই উক্তি, এই জ্ঞান, এই অনুভূতি যে জাতির, সে জাতিকে আর যাহা ইচ্ছা বল, পৌত্তলিক বা মূর্ত্তি-উপাসক বলিও না। বলিও না যে, হিন্দু নিজ হস্তে মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকেই ভগবান ভাবে, তাহারই পূজা করে। শুনিয়া রাখ, জানিয়া রাখ—হিন্দু মূর্ত্তের মধ্যে অমূর্ত্ত, অমূর্ত্তের মধ্যে মূর্ত্তি; সাকারে নিরাকার, নিরাকারে সাকার দর্শন, অনুভব করিয়া থাকে। মূর্ত্তির আরাধনা অন্তরানুভূতির সোপান মাত্র—হিন্দু যেমন মাটীর মূর্ত্তিকেই ভগবান ভাবে না। শিলা, ধাতু, বৃক্ষলতা, নদনদী, বায়ু অগ্নি, পশু পক্ষী, যাবতীয় ভূত পদার্থ—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জড় চৈতন্যময় জগৎ চরাচর হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর জ্ঞানে, হিন্দুর অনুভূতিতে সেই অনন্ত স্রষ্টার অনন্ত রূপ, সেই বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ববিভা। মৃন্ময়, ধাতুময়, পাষাণময়, সমস্তই হিন্দুর নিকট চৈতন্যময়, আত্মাময়, ব্রহ্মময়। মৃন্মূর্ত্তি উপাসক ভগবানকে বলিয়া থাকে—ভগবন্! তুমিও নিয়ত মাটীর মূর্ত্তি গড়িতেছ, আমিও প্রত্যহ মাটীর মূর্ত্তি গড়িতেছি। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতেও প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তি লইয়া তোমার খেলা, আমারও খেলা। কিন্তু তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি আর আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে প্রভেদ বিস্তর। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি সৎ ও সনাতন, নিত্য ও সচেতন। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি কার্য্য, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি কারণ। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিকার, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্বরূপ। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি বদ্ধ, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি মুক্ত। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি গুণ, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্গুণ। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি দৃশ্য আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি দ্রষ্টা। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি জিজ্ঞাস্য, জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, ধ্যেয়, উপাস্য, প্রণম্য। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির বাসস্থান সংসার, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির বাসস্থান হৃদয়। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুমি নিয়ত সেবা করিয়া থাক "ঘা-তা" দিয়া, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সেবা করিবার উপকরণ আমি খুঁজিয়া পাই না। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির নামের কোন গুরুত্ব নাই, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির নাম মূর্ত্তি অপেক্ষাও কত বড়। তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি সদা অভাবগ্রস্ত, সুতরাং বিষণ্ণবদন, আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিভু, সুতরাং আনন্দ স্বরূপ, বিশ্ব-বিমোহন। কি, অধোবদন যে? লজ্জা পাইলে নাকি, ভগবন? তোমারই গুণের কিছু ব্যাখ্যা করিলাম মাত্র। তোমার আবার লজ্জা? হরি, হরি, তুমি ত নির্লজ্জ। তুমি লজ্জার অতীত। তোমাতে এ সব বিকার কি সম্ভব? তুমি যে অবিকারী। তাই ঠিক আছ। আমাদের মত বিকারী হইলে, আমাদের যে দশা, তোমারও সেই দশা ঘটিত—দুই এক হইতাম। যাহা হউক, লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। নিত্য হইতে অনিত্যের উৎপত্তি হয় না, অসম্ভব। আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সত্তাই তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সত্তা। সুতরাং তোমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি আর আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি একই—উহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই।

প্রাচীন কথা-সাহিত্য

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্, পিএইচ-ডি

রাজকুমারী নলিনীর কথা

পূর্ব্বকালে কাশিজনপদের উত্তরে হিমালয়ের পার্শ্বে সাহঞ্জনী নামে একটী আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে কাশ্যপ নামে একজন ঋষি বাস করিতেন। কাশ্যপ ঋষি এক দিন এক শিলার উপর মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই মূত্রে শুক্র মিশ্রিত ছিল। ঋতুমতী একটী হরিণী জলভ্রমে সেই শুক্রমিশ্রিত মূত্র পান করিয়া জিহ্বা দ্বারা যোনিপ্রদেশ লেহন করিল। ঋষির শুক্র হরিণীর উদরে প্রবেশ করাতে হরিণী গর্ভবতী হইল।

কালে হরিণীর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মনুষ্যাকৃতি হরিণ-শাবক দেখিয়া ঋষি ধ্যান-যোগে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন। অজিনের উপর বালকটীকে লইয়া ঋষি আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরিণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। ঋষি সেই বালকের নাভিচ্ছেদন করিয়া তাহার গর্ভমল ধৌত করিলেন। হরিণী আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বালকটীকে স্তন্য দান করিত। বালকটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হরিণ-শৃঙ্গের ন্যায় তাহার একটী শৃঙ্গ উঠিয়াছিল বলিয়া ঋষি তাহার নাম রাখিলেন 'এক-শৃঙ্গ'। একশৃঙ্গ হরিণী ও হরিণ-শাবকদিগের সহিত বিচরণ করিয়া যথা সময়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। হরিণ, হরিণী ও পক্ষিগণ আশ্রমে তাহার সহিত ক্রীড়া করিত।

ঋষিকুমার একশৃঙ্গ বড় হইয়া আশ্রমে জল-সেচন করিত, আশ্রম সম্মার্জ্জন করিত, এবং ফল মূল, পত্র ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নানারূপে ঋষির সেবা করিত। অনন্তর মাতৃসেবা করিয়া স্বয়ং আহার করিত। ঋষি তাহাকে ধ্যান ও অভিজ্ঞা মার্গে উপদেশ দিতেন। ঋষিকুমার চতুর্ধ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করিয়া কৌমার ব্রহ্মচারিরূপে সকলের পূজিত হইলেন।

এদিকে বারাণসী নগরে অপুত্রক কাশিরাজ পুত্রলাভের জন্য নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র জন্মিল না। কন্যা বড় হইয়াছিল। কাশিরাজ সেই কন্যা নলিনীকে সাহঞ্জনী আশ্রমের কাশ্যপ ঋষির পুত্র একশৃঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা

করিয়া রাজপুরোহিতের সহিত কন্যা নলিনীকে সাহঞ্জনী আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

পুরোহিত নানাপ্রকার সুমিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য লইয়া রাজকুমারী নলিনীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া সাহঞ্জনী আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নলিনী সখিগণের সহিত সেই স্থানে নানারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দধ্বনি শুনিয়া মৃগ ও পক্ষিগণ ভয়ে চারিদিকে পলাইয়া গেল। ঋষিকুমার একশৃঙ্গ মৃগগণকে ভীত দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে নলিনীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। সখিগণের সহিত অলঙ্কৃতা মহার্ঘ বস্ত্রশোভিতা নলিনীকে দেখিয়া ঋষিপুত্র বলিলেন, সুন্দর এই সকল ঋষিপুত্র; সুন্দর ইহাদের জটা, সুন্দর ইহাদের অজিন, মেখলা ও কণ্ঠসূত্র। নলিনী ঋষিকুমারকে হস্তে ধারণ করিয়া মোদক ও পানীয় দান করিল। ঋষিকুমার বলিলেন—পরম রমণীয় তোমাদের ফল ও জল। আমাদের আশ্রমে এরূপ নাই। রাজকুমারী ঋষিকুমারকে নিজের রথ দেখাইয়া বলিল—এই আমাদের আশ্রম। আইস, আমরা ইহাতে আরোহণ করিয়া তোমাদের আশ্রমে প্রবেশ করি। ঋষিপুত্র স্বীয় মাতৃসদৃশাকৃতি রথের অশ্বগুলি দেখিয়া রথে আরোহণ করিলেন না। রাজকুমারী ঋষি পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। ঋষিপুত্র তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরস্পর আলাপে উভয়ের মধ্যে প্রীতির উদ্ভব হইল। ঋষিকুমারকে নানারূপ ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া রাজকুমারী রথারোহণে বারাণসী প্রত্যাগমন করিলেন।

ঋষিপুত্র নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মন রাজ-কুমারীর প্রতি আসক্ত হইল। রাজকুমারীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ঋষিকুমারের আর আশ্রমের ফলমূলাদি আহরণ ভাল লাগিল না। তিনি কাষ্ঠাহরণ, আশ্রম সম্মার্জন, প্রভৃতি পূর্ব্বাভ্যস্ত কার্য্য ত্যাগ করিলেন। কাশ্যপ ঋষি পুত্রকে চিন্তাপরায়ণ ও আশ্রমকার্য্যবিমুখ দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিকুমার যথাযথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ঋষি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে বুঝাইলেন যে উহারা ঋষিকুমার নহে। উহারা স্ত্রীজাতি। স্ত্রীলোকের সহিত ঋষিদিগের মিত্রতা ভাল নহে। উহারা তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করে। সর্পের ন্যায়, বিষপত্রের ন্যায় উহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত।

এদিকে রাজার আদেশে একটী বৃহৎ নৌকা সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইল। নানারূপ পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ নৌকার উপর স্থাপিত করা হইল। নৌকাটীকে একটী আশ্রমের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। পুরোহিত নলিনীকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিয়া সাহঞ্জনী আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নলিনী নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং আশ্রমবৃক্ষের ফুল ও পাতা ছিঁড়িতে লাগিলেন। মৃগপক্ষিগণ ত্রাসে শব্দ করিয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ঋষিকুমারও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। রাজকুমারী তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় অন্নপানাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহাকে লইয়া জলচারী আশ্রমে অর্থাৎ নৌকায় প্রবেশ করিলেন। নৌকা যথা সময়ে বারাণসীতে পৌঁছিল। পুরোহিত নলিনীর সহিত ঋষিকুমারের বিবাহ দিলেন। ঋষিপুত্রও রাজকুমারীকে বয়স্য মনে করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

ঋষিকুমার রাজকুমারী নলিনীর সহিত নৌকারোহণ করিয়া পুনরায় সাহঞ্জনী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মৃগী ঋষিকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গিয়াছিলে? ঋষিপুত্র বলিলেন—আমার এই বয়স্যের সহিত উহাদের আশ্রমে গিয়াছিলাম। আমি সেখানে বয়স্যকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়া পাণি দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি। মৃগী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মনে করিল—আমার পুত্র, পত্নী ও বয়স্যের ভেদ জানে না। কে উহাকে বুঝাইয়া দিবে—নলিনী তোমার বয়স্য নহে। কাশীরাজকন্যা এখন তোমার ভার্য্যা।

সাহঞ্জনী আশ্রমপদের সমীপে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচারিণী তাপসীগণের একটী আশ্রম ছিল। ঋষিকুমার সেই আশ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাপসীরা বাধা দিয়া বলিল—এই আশ্রম স্ত্রীলোকদিগের। তুমি পুরুষ। তোমার এই আশ্রমে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঋষিকুমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা স্ত্রীধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, নলিনী রাজকন্যা। সে ঋষিপুত্রের বয়স্য নহে, সে রমণী; এখন সে ঋষিকুমারের পত্নী। যখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছে তখন পরস্পরকে ত্যাগ করা উচিত নহে।

ব্রহ্মচারিণীদের কথা শুনিয়া ঋষিকুমার রাজকুমারীর সহিত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকৃত কথা বলিলেন। কাশ্যপ ঋষি দেখিলেন, উভয়ের মধ্যে প্রীতির উদ্ভব হইয়াছে। অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব উহাদের আর পৃথক্ থাকা উচিত নহে। তখন ঋষির অনুমতি অনুসারে ঋষিকুমার একশৃঙ্গ, রাজকুমারী নলিনীর সহিত বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কালে রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে ঋষিকুমার একশৃঙ্গ বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নলিনীর গর্ভে ক্রমে তাঁহার ৩২টী যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিয়া একশৃঙ্গ কালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তপস্যার বলে তিনি চতুর্থ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞা লাভ করিয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেব নিকেতনে গমন করিয়াছিলেন।

পুণ্যবন্ত জাতক

পূর্ব্বকালে কাশিজনপদে বারাণসীনগরে অঞ্জন নামে এক মহা-পরাক্রম রাজা রাজত্ব করিতেন। পুণ্যবন্ত নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সে সর্ব্বদাই পুণ্যকার্য্যের প্রশংসা করিত। বীর্য্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত নামে অমাত্য-পুত্রগণ তাহার বয়স্য ছিল। তাহারাও যথাক্রমে বীর্য্য, শিল্প, রূপ ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিত।

এই পাঁচজন বন্ধু মিলিয়া, কে লোকের নিকট বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হয় দেখিবার জন্য, কাম্পিল্ল নগরে উপস্থিত হইল। তাহারা স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, গঙ্গার স্রোতে একটা কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। বীর্য্যবন্ত নিজের পরাক্রম দেখাইয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া তীরে আনিয়া দেখিল, সামান্য কাষ্ঠ নহে, উহা চন্দন কাষ্ঠ। গান্ধিকদিগের নিকট সেই চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া সে সহস্র পুরাণ লাভ করিল।

শিল্পবন্ত নিজের শিল্প কৌশল দেখাইতে লাগিল। সে এমন ভাবে বীণা বাজাইতে লাগিল, যে, কাম্পিল্লের লোকেরা তেমন বীণা কখনও শুনে নাই। বীণার একটী তার বাজাইতে বাজাইতে ছিন্ন হইল। বীণা কিন্তু একরূপ ভাবেই বাজিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ছয়টী তার ছিন্ন হইল। বীণা সেই ভাবেই বাজিতে লাগিল। কাম্পিল্লের লোকেরা বিস্মিত হইয়া বীণা বাদন শুনিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা শিল্পবন্তকে প্রচুর সুবর্ণ উপহার প্রদান করিল।

রূপবন্ত পণ্য-বীথিকায় ভ্রমণ করিতেছিল। নগরীর অগ্রগণিকা তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট দাসী পাঠাইয়া দিল। অগ্রগণিকা রূপবন্তকে নানারূপে তুষ্ট করিয়া শত সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিল।

এক শ্রেষ্ঠিপুত্র অগ্রগণিকার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল। গণিকা পূর্ব্বেই অপর এক জনের নিকট হইতে সুবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিল। তাই সে দিন যাইতে পারিল না। পরদিন প্রত্যূষে শ্রেষ্ঠিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠিপুত্র রাত্রিতে স্বপ্নে তাহার সহিত বিহার করিয়াছে শুনিয়া, গণিকা ঐ স্বপ্ন-বিহারের জন্য সুবর্ণ চাহিয়া বসিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সুবর্ণ দিতে অস্বীকার করায়, উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল। কিছুতেই সে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল না। প্রজ্ঞাবন্ত এরূপ সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলে, তাহাকেই মধ্যস্থ স্থির করা হইল। প্রজ্ঞাবন্ত সহস্র সুবর্ণ ও একখানা আয়না (আদর্শ) আনিতে বলিল। এবং আয়নার মধ্যে সুবর্ণের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া গণিকাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিল। সকলেই তাহার বিচারে সন্তুষ্ট হইল। অগ্রগণিকা ভগ্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সুবিচারের জন্য প্রজ্ঞাবন্তকে প্রভূত সুবর্ণ উপহার দিল।

রাজপুত্র পুণ্যবন্তও অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বহির্গত হইল। সে রাজপ্রাসাদের সমীপে বিচরণ করিতেছিল। কাম্পিল্লের অমাত্য-পুত্র তাহাকে দেখিয়া স্নেহপরবশ হৃদয়ে নানারূপ পান ভোজন দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিল। ভোজনাবসানে পুণ্যবন্ত রাজকীয় যানশালায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে কাম্পিল্ল রাজকুমারী সেই যানশালায় প্রবেশ করিয়া অমাত্যপুত্রবোধে পুণ্যবন্তের জাগরণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। পুণ্যবন্ত সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। ক্রমে রাজকুমারীও সেই যানশালায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সূর্য্যোদয় হইলে অমাত্যগণ দেখিল রাজকুমারী যানশালা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছে। তখন অমাত্যগণ যানশালায় অনুসন্ধান করিয়া পুণ্যবন্তকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট লইয়া গেল।

রাজকুমার পুণ্যবন্ত রাজার কাছে নিজের যথার্থ পরিচয় দিয়া সত্য ঘটনা বিবৃত করিল। অমাত্যপুত্র ও রাজকন্যা, তাহার কথারই সমর্থন করিল। তখন কাম্পিল্লরাজ রাজকুমার পুণ্যবন্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। রাজার পুত্র ছিল না। তাই তিনি পুণ্যবন্তকেই তাঁহার সিংহাসনে বসাইলেন। রাজকুমার পুণ্যবন্ত পুণ্যবলে রাজকন্যা ও রাজ্য লাভ করিল।

পদ্মাবতীর কথা

পূর্ব্বকালে হিমালয় সমীপে এক মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে মাণ্ডব্য ঋষির ফলপুষ্পপত্রযুক্ত মৃগপক্ষিসহস্র-নিষেবিত একটী আশ্রম ছিল। একদা গ্রীষ্মশেষে মাণ্ডব্য ঋষি উপলখণ্ডের উপর সশুক্র মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঋতুমতী কোনও মৃগী সেই মূত্র পান করিয়া গর্ভবতী হইল। যথাকালে সেই মৃগী ননীতপিণ্ড সদৃশ সুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করিল। জ্ঞানী ঋষি ধ্যানযোগে সমস্ত জানিতে পারিয়া অজিনে ধারণ করিয়া কন্যাটীকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। মৃগীও সঙ্গে সঙ্গেই আসিল। মৃগীর স্তন্য পান ও ঋষিপ্রদত্ত ফল ভোজন করিয়া কন্যাটী দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন কন্যাটী হাঁটিতে শিখিল, তখন তাহার প্রতি পাদক্ষেপে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইত। কন্যাটীও সেই সমস্ত পদ্ম লইয়া খেলা করিত। এই জন্য ঋষি তাহার নাম রাখিলেন পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী আশ্রম সমীপে মৃগশিশুগণের সহিত বিচরণ ও ক্রীড়া করিত। মৃগী যেখানে যাইত পদ্মাবতীও তাহার সহিত সেই স্থানেই যাইত। আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে ঋষি তাহাদিগকে ফলমূলাদি প্রদান করিতেন। পদ্মাবতী মৃগ-শাবকদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে আহার করিত। বড় হইয়া পদ্মাবতী আশ্রমের জন্য ফল মূল ও জল আনিত, আশ্রম পরিষ্কার রাখিত। ঋষিকে তেল মাখাইয়া দিত। এবং সর্ব্বদা মৃগ ও পক্ষিগণের সহিত খেলা করিত।

একদিন পদ্মাবতী-মৃগ ও পক্ষিগণ পরিবৃত হইয়া জল আনিতে গিয়াছিল। সেই সময়ে কাম্পিল্লের রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃগয়া প্রসঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণাজিন-পরিহিত উদক-কুম্ভযুক্ত পদ্মহস্ত ঋষিকুমারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঋষিকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় জ্ঞাত হইয়া রাজা ঋষিকুমারীর হস্তে "মোদক" দিয়া বলিলেন, আমাদের আশ্রমের ফল খাইয়া দেখ। পদ্মাবতী পূর্ব্বে কখনও মোদক আস্বাদন করে নাই। এখন মোদকের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিল—তোমাদের আশ্রমের ফল অতি সুমিষ্ট। আমাদের আশ্রমের ফল কটু ও কষায়। রাজা বলিলেন, চল আমাদের আশ্রমে। এরূপ ফল

ভোজন করিতে পারিবে। পদ্মাবতী বলিল, আমি আশ্রমে জল রাখিয়া ঋষির অনুমতি লইয়া আসিতেছি। তখন রাজা তাহার হস্তে আরও মোদক দিয়া বলিলেন, ঋষিকে এই ফল দিয়া বলিও, এইরূপ ফল যাঁহার আশ্রমে আমি তাঁহার ভার্য্যা হইব।

ঋষিকুমারী আশ্রমে আসিয়া ঋষিকে সকল কথা যথাযথ বলিল। ঋষি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি কামফল দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছ। ঋষিকুমারী মনে করিল, কাম নামক বৃক্ষ-বিশেষের ইহাই ফল। সে সেই ফলই ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বলিল সেই সুক্ষ্মাজিনধারী ঋষিকুমার জলের ধারে মৃগের উপর অপেক্ষা করিতেছেন। ঋষি তখন পদ্মাবতীর সহিত অশ্বারূঢ় রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীকে রাজার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত ঋষিকে অভিবাদন করিয়া পদ্মাবতীর সহিত অশ্বারোহণে কাম্পিল্ল নগরের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে রাজার সেনাগ্রভাগ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মদত্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া কাম্পিল্ল নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা পদ্মাবতীর কাছে নগরের অট্টালিকাসমূহ উটজশ্রেণী ও নগরের কোলাহল বন্যপশুর শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। পদ্মাবতী সমস্তই বিশ্বাস করিল। রাজা পদ্মাবতীর সহিত উদ্যান-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

পদ্মাবতী অগ্নিহোত্রের জন্য সমিধাদির প্রার্থনা করিলে, রাজা পুরোহিতকে ডাকাইয়া পদ্মাবতীর সহিত একত্র অগ্নিতে হোম করিলেন। নানালঙ্কার ভূষিতা সূক্ষ্মবস্ত্রপরিহিতা পদ্মাবতীর সহিত রাজা ব্রহ্মদত্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। অগ্নি প্রদক্ষিণ কালে পদ্মাবতীর প্রতিপাদক্ষেপে পদ্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া প্রজাগণ বিস্মিত হইল। রাজা তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

কালে পদ্মাবতীর গর্ভ-সঞ্চার হইল। অন্য মহিষীগণ পদ্মাবতীর সমাদর দেখিয়া হিংসা করিতে লাগিল। প্রসবকালে তাহারা তাহার চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিল। যমজ পুত্র প্রসূত হইলে তাহাদিগকে মঞ্জুষা মধ্যে রাখিয়া রাজমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিল এবং পদ্মাবতী মুখে গর্ভমল মাখাইয়া দিল। পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে দুইটী উলক (ফুল) প্রসূত হইয়াছে। এই বলিয়া তাহারা ফুল দুইটী ফেলিয়া দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—দুইটী সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। পদ্মাবতী ঐ দুইটীকেই ভক্ষণ করিয়াছে। রাজা মহিষীদের কথা শুনিয়া এবং পদ্মাবতীর মুখে রক্তের দাগ দেখিয়া তাহাকে পিশাচী মনে করিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করিলেন। মন্ত্রিগণ পদ্মাবতীকে গোপনে গৃহে রাখিয়া রাজাকে জানাইলেন, পদ্মাবতী নিহত হইয়াছে। অন্তঃপুরিকাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। রাজা নানারূপ শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। অনন্তর মাণ্ডব্য ঋষির আরাধিত কোনও দেবতা দৈববাণী দ্বারা রাজাকে যথার্থ বিষয় জানাইলেন। রাজা অন্তঃপুরিকাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল।

এদিকে কৈবর্ত্তেরা নদীতে মৎস্য ধরিবার কালে পুত্রদ্বয়পূর্ণ রাজমুদ্রাঙ্কিত মঞ্জুষা পাইয়া রাজার নিকট লইয়া আসিল। রাজাও মঞ্জুষা মধ্যে পুত্রদ্বয় দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মন্ত্রিগণ রাজার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল এবং পদ্মাবতীকে গুপ্ত গৃহ হইতে আনিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত করিল। রাজা মহা আদরের সহিত পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন ও অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পদ্মাবতী সমস্তই কর্ম্মফল মনে করিয়া ঋষির কথা স্মরণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

ভারতীয় লিপির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীপ্রমথভূষণ পালচৌধুরী এম-এ, বি-এল

প্রাচীন ভারতের লিপিশিক্ষা সম্বন্ধে তিনটি মত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ, সেনার্ট প্রভৃতির মতে ভারত গ্রীকদের নিকট লিপিব্যবহার শিক্ষার জন্য ঋণী। সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ভারতীয় লিপি সেমেটীয় লিপিসম্ভূত। সার উইলিয়ম তাঁহার এই মত ১৮০৬ খৃঃ অব্দে প্রচার করেন। তাহার পর অনেক মনীষী তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভারতীয় লিপি সেমেটীয় লিপির কোন্ শাখা হইতে উদ্ভূত, এ সম্বন্ধে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। বুহ্‌লার, ওয়েবার প্রভৃতির মতে ভারতীয় লিপি প্রাচীন ফিনীশীয় লিপি হইতে জাত। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীনতম ভারতীয় অক্ষরাবলি কতিপয় 'আস্থরীয় weights এর উপর লিখিত লিপি ও খৃঃ পূঃ সপ্তম ও নবম শতাব্দীর 'মেসা শিলালিপি'-খোদিত লিপির প্রায় অনুরূপ। সেই সময়ের তথাকথিত উত্তর সেমেটীয় অক্ষরের এক-তৃতীয়াংশ অক্ষর প্রাচীনতম ভারতীয় লিপির অবিকল অনুরূপ; অপর তৃতীয়াংশের সহিত ভারতীয় লিপির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশিষ্ট অক্ষরগুলিও যে একেবারে বিভিন্ন তাহা নহে। টেলর, ডক্টর ডেক প্রভৃতি কিন্তু ভারতীয় লিপির সহিত দক্ষিণ সেমেটীয় লিপির সম্বন্ধ স্থির করেন। রিস্ ডেভিড্‌স্ ভারতীয় লিপির সেমেটীয় উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, উপরি-উক্ত দুইটি মতের কোনটিই সমীচীন মনে করেন না। ভারতীয় লোকের যে তৎকালে প্যালেষ্টাইন বা দক্ষিণ আরবের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ছিল, তাহা তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে ভারতীয় লিপির জন্ম উত্তর বা দক্ষিণ সেমেটীয় লিপি নহে; যে প্রাক্‌সেমেটীয় লিপি হইতে উত্তর বা দক্ষিণ সেমেটীয় লিপি উদ্ভূত, সেই প্রাক্‌সেমেটীয় লিপিই ভারতীয় লিপির জননী। রিস্ ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে বা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় বণিকগণ ব্যাবিলনের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই অন্-আর্য্য, দ্রাবিড়-বংশোদ্ভূত; এই ব্যবসায়ীরা ব্যাবিলনে প্রচলিত 'আক্কাডীয়' নামে খ্যাত প্রাক্‌সেমেটীয় জাতির আবিষ্কৃত লিপি ভারতে আনয়ন করেন

এই লিপিই বহুবর্ষ পরে ভারতের পরিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'ব্রাহ্মীলিপি' নামে পরিচিত হইয়া উঠে। নিজ মত সমর্থনার্থ রিস্ ডেভিড্‌স্ ১৮৯৮ খৃঃ অঃ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে মিঃ কেনেডির প্রচারিত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিঃ কেনেডি লিখিয়াছেন যে, ভারতের সহিত ব্যাবিলনের ব্যবসা সম্বন্ধ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পুরামাত্রায় প্রচলিত ছিল। ইহার বেশী পূর্ব্বে যে এরূপ ব্যবসা প্রচলিত থাকা সম্ভব, বা ভারতীয়েরা যে ব্যাবিলন ছাড়াইয়া দেশের আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না।

ভারতীয় লিপি যে ভারতের নিজস্ব আবিষ্কার—ল্যাসেন এ কথা প্রথম প্রচার করেন। কানিংহাম সেই মতকে বেশ পরিপুষ্ট করেন। তাঁহার মতে অশোকীয় লিপি প্রাচীন ভারতের চিত্রলিপিরই পরবর্ত্তী অবস্থা। তাঁহার মতের পোষক প্রাচীন কোন চিত্রলিপিই কিন্তু একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই,—অশোকীয় লিপিতেও প্রাচীন চিত্রলিপির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রফেসর ভাণ্ডারকর বলেন, ভারতীয় লিপি ভারতের নিজস্ব বটে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মৃৎশিল্প-খোদিত অক্ষরে।

যাহা হউক, ভারতীয় লিপি যেখান হইতেই উদ্ভূত হউক, ভারত যে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে লিপি ব্যবহার করিতে জানিত, সে কথা রিস্ ডেভিড্‌স্‌এর সেমেটীয় অক্ষরের সহিত ভারতীয় লিপির তুলনা-মূলক আলোচনা ব্যতীতও জানিতে পারা যায়। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে ভারতীয় লিপির উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন অক্ষর পাঁচ ছয় আকারে এই লিপিসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। বহু দিন ধরিয়া লিপির ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে, লিপির বহু আকৃতি সম্ভবপর নয়। প্রিয়দর্শী অশোকের পরবর্ত্তী পাঁচ ছয় শত বৎসরের শিলালিপির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, মহারাজ অশোকের অন্যূন তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে লিপিব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্য হইতেও লিপিব্যবহারের যুগ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রিস্ ডেভিডস্ বলেন, সর্ব্বপ্রথম লিপিব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ গ্রন্থে। বৌদ্ধ যুগান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যে ত্রয়োদশটি 'কথোপকথন' আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে 'শীলাঃ' নামক পুস্তিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সংঘীয়েরা কি কি কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন, তাহার বর্ণনাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে 'অক্ষরিকা' ক্রীড়া অন্যতম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 'অক্ষরিকা' অর্থে শূন্যে বা ক্রীড়া-সঙ্গীর পৃষ্ঠে অক্ষর লেখা। বালকের ক্রীড়াবর্ণনা প্রসঙ্গে 'অক্ষরিকা' নাম উল্লেখ থাকায়, ইহাও যে বালকের ক্রীড়াবিশেষ, তাহা অনুমিত হয়। এখন কথা এই যে, খুব প্রচলিত না হইলে লিপি-ব্যবহার বালকের ক্রীড়ার মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। অতএব লিপির প্রচলন যে ভারতে 'শীলাঃ' পুস্তিকার বহু কাল পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 'শীলাঃ' পুস্তিকা উপরি-উক্ত কথোপ-কথনের প্রত্যেকটিতে উল্লিখিত হওয়ায়, ইহা যে 'কথোপকথনে'র পূর্ব্ব-রচিত তাহা বলা বাহুল্য। রিস্ ডেভিড্‌স্ ইহার যুগ নির্দ্দেশ করেন সার্দ্ধ চারিশত খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে। বৌদ্ধ 'জাতকা'বলি হইতেও জানা যায় যে, লিপির প্রচলন জাতকীয় যুগে খুব বেশী ছিল। সরকারী বে-সরকারী কাগজপত্রের কথা, স্বর্ণপাত্রক্ষোদিত লিপির কথা জাতকে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ 'বিনয়পিটকে'ও 'লেখা'র কথা পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। প্রফেসর ওল্ডেনবার্গএর মতে 'বিনয়পিটক' খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ষাট বৎসরের পূর্ব্বে রচিত।

ব্রাহ্মণীয় গ্রন্থেও লিপি ব্যবহারের উল্লেখ বিরল নহে। প্রফেসর ভাণ্ডারকর বলেন যে বেদেও লিপিব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে 'অক্ষর' প্রভৃতি শব্দ উল্লিখিত আছে। ইয়োরোপীয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে বিরুদ্ধমতাবলম্বী। যাহা হউক, লিখিত কাগজ-পত্রের স্পষ্ট উল্লেখ 'বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী'তেও লিপির কথা আছে। অধ্যাপক রমেশবাবু বসিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্রের রচনাকাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করেন। পাণিনির সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। প্রফেসর ভাণ্ডারকর তাঁহাকে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর সমসাময়িক বলিয়াছেন।

যাহা হউক, লিপি যে বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রের ও পাণিনির বহু কাল পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা এই সকল গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ভারতে লিপি-ব্যবহারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহ করা যায় না।

এখন আর এক কথা। এই যে ভারতে এত প্রাচীন যুগে লিপি-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, ভারত তাহা কোন কাযে লাগাইয়াছিল? প্রফেসর ম্যাকডোনেল ও রিস্ ডেভিড্‌স্ উভয়েই বলিয়াছেন যে, লিপির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তাহাকে কোন বৃহৎ গ্রন্থ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার কাযে লাগায় নাই, প্রথম প্রথম লিপির ব্যবহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদেশ প্রচার প্রভৃতি কাযেই আবদ্ধ ছিল।

রিস্ ডেভিড্‌স্ তাঁহার মত সমর্থনার্থ কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি কয়েকটির উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ডেভিড্‌স্ সাহেবের প্রথম যুক্তি এই যে, আমরা বৌদ্ধ সংঘীয় বিধিনিচয়ে সংঘের ও সংঘভুক্ত সভ্যের সম্পত্তির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই, তাহাতে গৃহস্থালীর সামান্য পাত্র পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইলেও, কোথাও কোন পুস্তক বা হস্তলিখিত পুঁথির কথা দেখি না। তখন পুস্তকের প্রচলন থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা এই তালিকাভুক্ত হইত। দ্বিতীয় কথা, অনেক পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক মূল সূত্র মুখস্থকারীর স্মৃতিপথে মাত্র বর্ত্তমান। অদূরে এ বিষয়ের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এক স্থানে লিখিত আছে, যে 'ভিক্ষুরা অনেক শিখিয়াছেন, তাঁহারা অপরকে তাহা শিক্ষা দিতে শিথিলতা করিতে পারেন। এইরূপে তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুত্তান্ত আশ্রয়াভাবে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।' 'বিনয় পিটকে'ও এ বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক স্থলে 'বিনয়'

বলিতেছে যে, যদি ভিক্ষুদের কেহ 'পাতিমোক্ষে'র কথা না জানে, তবে সংঘ হইতে কাহাকেও অল্পবয়স্ক দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সংঘে তাহা শিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিবে। আর এক স্থানে আছে, যদি কোন ব্যক্তি বৌদ্ধসংঘে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, কোন সুত্তান্ত তাঁহার নিকট না শিক্ষা করিলে তাহা চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইবে, তবে সংঘ হইতে তাঁহার নিকট শ্রমণরা বর্ষাকালে ভ্রমণ করিতে নিষিদ্ধ হইলেও যাইতে পারেন। এ সময় পুস্তকের সমধিক প্রচলন থাকিলে, 'পাতিমোক্ষ' বা 'সুত্তান্ত' শিক্ষা পুস্তক হইতেই হইতে পারিত; এরূপ লোক প্রেরণের কথা উত্থাপিতই হইত না। রিস্ ডেভিড্‌স্ আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। লিপির ব্যবহার যখন ভারতে প্রথম প্রচলিত হয়, তখন ভারত অসীম জ্ঞানের অধিকারিণী, বেদের প্রভায় তখন ভারতের আকাশ সমুজ্জল; কিন্তু ভারতের এই সব জ্ঞানরত্ন তখন ভারতীয়েরা 'শ্রুতি' মাত্র অবলম্বনেই শিক্ষা করিত ও রক্ষা করিত তাহাদের স্মৃতির উজ্জ্বল মন্দিরে। যখন লিপির ব্যবহার প্রচলিত হইল, তখনও ভারতীয়েরা সেই সকল জ্ঞানভাণ্ডার পুস্তকের মধ্যে রক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া পূর্ব্বমত স্মৃতির মন্দিরেই রাখিয়াছিল। আর সে সময় লেখনী বা লিখিবার দ্রব্য কিছুই সুলভ ছিল না। লেখনীর মধ্যে ছিল লৌহনির্ম্মিত ফলক। লেখা হইত বৃক্ষপত্রে। প্রথমে কালি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই! এইরূপ লেখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কে আস্থাবান্ হইতে পারেন? তাহার উপর ব্রাহ্মণেরা পবিত্র মন্ত্রনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের গোচর করিতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। গৌতম, মনু প্রভৃতি সকলেই শূদ্রের বেদে অনধিকারত্ব প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা তাই লিপি-ব্যবহারকে বেশ আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের বেদ প্রভৃতির রক্ষায় নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিপি-ব্যবহারের প্রচলন ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আর এই প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধেরা, কেন না সাধারণ্যে ধর্ম্মপ্রচারই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শেষে ব্রাহ্মণেরাও লিপির ব্যবহার আরম্ভ করিয়া বেদ প্রভৃতি রক্ষার জন্য লিপির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেক পরে! বৌদ্ধেরাই এ বিষয়ে অগ্রণী।

ভগ্ন প্রাসাদ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ফিকে হল্‌দে পালটি ডানার মত মেলে নদীর জলে গতি এঁকে, ঢেউ তুলে নৌকাখানা ছুটে চলেচে। উঁচু তীর দুটির তরু-পল্লবে, নিবিড় লতাজালে, কচি ধান-মঞ্জরীর গায়ে গায়ে এই পাগলা হাওয়ার হাল্কা সুর। আমি তীর পানে চোখ মেলে "ছইয়ের" ওপর চুপ করে বসে,—পাশে আমার প্রৌঢ় আমীন।

হঠাৎ সামনে দক্ষিণ তীরে চোখ পড়ল—তরু-পুঞ্জের মাঝ থেকে একটা যেন দৈত্যপুরী সন্ধ্যার আকাশ পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে।

জিজ্ঞাসা করলুম—"ওই ওটা কোন্ গাঁ?"

"দিলগঞ্জ—"

"আর ঐ বিরাট বাড়ীখানা?"

"দিলগঞ্জের জমীদারদের—"

আর একটু কাছে এসে দেখলুম—বাড়ীটার পাঁজরায় পাঁজরায় প্রাচীনত্বের ছাপ ও রেখা,—না জানি তার বুকের মাঝে কত কি ঢাকা। রাক্ষসী নদী "পাউড়ী-ভাঙা" তার খানিকটা গ্রাস করে ফেলেচে, বাকিটুকুকেও হয়ত সে রেহাই দেবে না।

কৌতূহল জাগল, জিজ্ঞাসা করলুম—

"দিলগঞ্জ ত আজও আছে,—কিন্তু তার জমীদাররা কোথায়, যে বাড়ীটার এম্‌নি দশা?—"

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তীর পানে আঙুল তুলে হেঁয়ালির ঢঙে আমীন বল্লে—"ওই যে গাঁয়ের পূব সীমানায় একটা ভিটে পড়ে—চারদিকে আম-কাঁঠালের বন, ঘন জঙ্গল, ঐ ভিটেতে বাস করত গাঁয়ের পুরুত দীন ভট্‌চায। আর ওরই দক্ষিণে ঐ যে দেখচেন বাঁশঝাড়, তার কোলে কয়েকটা ছোট ছোট জীর্ণ কুঁড়ে; ওটা হচ্ছে চাঁড়ালপাড়া, এখন একেবারে শূন্য!"

"কেন?"

"কেন না ওদের সেরা সেরা যে পাঁচজনের জেল ও আজীবন দ্বীপান্তর-বাসের শাস্তি হয়েছিল, তারা ত আর ফিরলই না,—কেউ কেউ আবার চিরকালের মত বাস উঠিয়েও ভিন্ গাঁয়ে চলে গেছে—"

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই সে বল্‌তে লাগল—

"শুনেচি ঐ দিলগঞ্জের জমীদারদের তিন পুরুষে

কারুরই কোন সন্তানের মুখ দেখবার সৌভাগ্য ঘটে নি। পরের ছেলেকে পোষ্য নিয়েই, আর কিছু না করুক, তারা তাদের বিস্তীর্ণ সম্পত্তি ঠেকিয়েচে। কেবল শেষ জমীদার ব্রজমুখুয্যের স্ত্রীর অল্প বয়সে একটী ছেলে হয়েছিল; কিন্তু সেটি বেশী দিন বাঁচে নি। ব্রজমুখুয্যে ছিল অতি-মাত্রায় স্বেচ্ছাচারী; সম্পত্তি ঠেকাবার গরজ তার একটুও ছিল না। তার স্ফূর্ত্তির হাওয়ায় সব সম্পত্তি কর্পূরের মত উবে যাচ্ছিল। ছেলেটি মারা যেতে কিছুকাল বাদে জমীদার-গৃহিণী খালি বুকটা ভরিয়ে তুল্‌তে স্বামীর কাছে তাঁর বোনের একটী ছেলেকে পোষ্য নেবার অনুরোধ করে বস্‌লেন। প্রস্তাবটাকে ব্রজমুখুয্যে প্রথমটা তত আমল না দিলেও, পরে স্ত্রীর অনেক কাকুতি-মিনতিতে সম্মতি না দিয়ে পারলে না। ফলে একটী সুন্দর ও ফুটফুটে বছর আটেকের ছেলে মুখুয্যেদের ঘরে এল। এই ছেলেটির ওপর জমীদার-গৃহিণীর বরাবরই একটা আন্তরিক টান ছিল। তিনিই তার নাম দিয়েছিলেন—মনোজ।

যখনকার কথা বল্‌চি, দীন ভট্‌চায তখন জীবিত। কিন্তু তার একমাত্র সন্তান, মেয়ে পদ্ম যখন পাঁচ বছরের, তখন তিনি মারা যান। প্রতিবেশী চাঁড়ালরা ভট্‌চায পরিবারের অনুগত। দেখা-শোনার লোকাভাবে ভট্‌চায-গিন্নী, তাঁর যা কিছু বাগান জমী ছিল, সবই তাদেরই বন্দোবস্ত করে দিলেন। দীন ভট্‌চাযের মেয়ে পদ্মর চেহারাটি ছিল চমৎকার। লাল্‌চে রঙের ওপর সুগোল হাত পা, কেটে-বসানো মুখখানির কোলে বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক, আর মিষ্টি স্বভাবটি তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। মেয়েটিকে কোলে করে ভট্‌চায-গিন্নী মাঝে মাঝে জমীদার-বাড়ী বেড়াতে যেতেন। মনোজ আসবার পর থেকেই জমীদার-গৃহিণীর অনুরোধে তাঁর আসা-যাওয়াটা আরও বাড়ল। তাতে ছেলে-মেয়ে দুটির নিঃসঙ্গ দিনগুলি হাসি খেলা, গল্প গান, দুষ্টুমির মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে লাগল।

এমনি কোরে সাতটি বছর কেটে গেলে, পদ্ম যখন এগার বছরের—ভট্‌চায-গিন্নী তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। দু' একটা সম্বন্ধ এল গেল, কিন্তু তার একটীও তাঁর পছন্দ হল না। এমন সময়ে একদা এক পথ-চল্‌তি গণৎকার গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে। সে, পদ্মর হাত দেখে কি রূপ দেখে জানি না, বল্লে—এ মেয়ে রাজরাণী হবে। তার কোষ্ঠির গণনার সঙ্গে কথাটা একেবারে ঠিক ঠিক মিলে গেল। কিন্তু গল্পের রাজা-রাজড়ারা ত বহুকাল-হয়ে-গেছে এদেশ থেকে রাজ্য-পাট উঠিয়ে এই ছাপ-দেওয়া রাজা-বাদশার কালে গল্পের মতই অলীক হয়ে আছেন। তবে সেদিক দিয়ে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, মনোজের সঙ্গে পদ্মর গাঢ় সখ্যতা গণনাটিতে বিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠ্‌ল। আর তাই যদি না হবে তাহলে এদের—এই নিঃসম্পর্কীয় দুটির, মধ্যে এমন জমাট ভাবই বা কেন? সূতিকাগারে গভীর রাত্রে বসুধার সুপ্তির মাঝে বিধাতা পুরুষের অদৃশ্য হাতখানি যে কথা কটি লিখে রেখে গেছে, তা কি ভুল হতে পারে? কাযেই পদ্ম ও মনোজ এর পর থেকেই ভট্‌চায-গিন্নী এবং জমিদার-গৃহিণী এই উভয়ের কাছে বর-কনে রূপে পরিচিত হতে লাগল। কিন্তু ভট্‌চায-গিন্নী এই পাতানো সম্পর্কটিকে পাকাপাকি করবার দিকে একটুও ঝোঁক দিলেন না। তার একটা কারণ, জমীদার-গৃহিণীর সমীপে প্রস্তাবটি উত্থাপনে তাঁর সাহসের অভাব; অপরটি, যা হবার তা আপনিই হবে, তার জন্যে চেষ্টা শক্তির বাজে-খরচ মাত্র, এই ধারণা।

কিন্তু দু'বৎসরের মধ্যেই জমীদার-গৃহিণীর অকাল-মৃত্যুতে এই ভাবী রাজাটির রাজ্য-লাভ ত দুর্ঘট হয়ে উঠলই, এমন কি, ঘরেও আর তাকে স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা দান করার মত কেউ রইল না। সে সারাদিন ভট্‌চায-গিন্নীর বাড়ীতেই কাটাতে সুরু করলে।

পত্নী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমুখুয্যের শয়তানিও যেন শতগুণে বেড়ে গেল। তার অত্যাচারে, উৎপীড়নে প্রজারা ক্ষিপ্তপ্রায়। গ্রামের পথে-ঘাটে বধূরা আর জল আন্‌তে কলসী কাঁখে চলে না। যার ঘরে সুন্দরী যুবতী—প্রহরীর মত সারারাত্রি সে জেগে কাটিয়ে দেয়। লোকের মনে স্ফূর্ত্তি নেই, সুখ নেই—চাষ-আবাদে তাদের মন বসে না—যেন কোন্ বর্ব্বর বিদেশীর ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত, পীড়িত। এমনি করে প্রজারা দিনে দিনে দরিদ্র হয়ে পড়তে লাগ্‌ল। একটীর পর একটী করে দোকানপাট, মহাজনী কারবারও বন্ধ হতে লাগল। যারা মায়া কাটাতে পারলে, তারা ভিটে ছেড়েই চলে গেল।

এই অত্যাচার ও অপমানের প্রথম সূত্রপাত ঐ চাঁড়াল-

পাড়ায়। যার একটুও মনুষ্যত্ব আছে, তার পক্ষে এ অপমান ভুলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কাজেই চাঁড়ালরা এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল।...

ওদিকে পদ্ম ও মনোজের পাতানো সম্পর্কটি ও তাদের দেহ দুটি দিনে দিনে যে আকারে খাঁজে খাঁজে ফুটে উঠতে লাগল, তাতে দৈবের হাতে সম্বন্ধটা পাকাপাকি করবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা ভট্‌চায-গিন্নীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কেন না, অঘটন ঘটাতে দৈবের মতন পাকা ওস্তাদ এ দুনিয়ায় আর একটিও নেই। তিনি মনস্থ করলেন—হয় এদের মিলনই হোক, অন্যথা এদের দুটিকে দুটি ফুলের মত এক বোঁটা থেকে নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়ে দূরে রাখতে হবে। তিনি ব্রজমুখুয্যের কাছে কথাটি উত্থাপন করবার নানান্ জল্পনা করতে লাগলেন।

এক দিন বেলা পড়ে এলে, পদ্ম একলাটি ঘাট থেকে গা ধুয়ে, কলসী কাঁখে হাত দুলিয়ে, জমীদারদের আম-বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ী আস্‌চে। কাছে কিনারে কেউ কোথাও নেই। আনমনে সে চলেছে। কিন্তু সেই পথটা ঘুরে ফিরে একেবারে জমীদারদের অন্দরে চলে গেছে। তবে ইদানীং সেই বাঁকের মুখে আর একটা অস্পষ্ট পথ-রেখা পায়ে পায়ে ফুটে উঠে বাইরে ঘাটের আসল রাস্তাটার গায়ে মিশে গেছে। ঠিক সেই সন্ধিস্থলে এসে সে এক পা বাড়িয়ে বাইরের পথটা যেই ধরতে যাবে, অমনি পিছন থেকে ব্রজমুখুয্যে এসে, তার যে হাতখানি দুল্‌ছিল, সেখানিকে চেপে ধরেই, তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে অন্দরে গা ঢাকা দিলে। পদ্ম ভয়ে চমকে উঠে দেখলে, ব্রজমুখুয্যে চট কোরে সরে গেল, আর সামনে বড় রাস্তাটার ওপর দিয়ে চাঁড়াল পাড়ার বনমালী ও রতন তার দিকে ছুটে আস্‌চে। ব্যাপারটার আগাগোড়া তারা দেখতে পেয়েছিল। কাছে এসে বনমালী বল্লে—"পদ্মঠাকরুণ, কি সর্ব্বনাশটাই এখন হয়েছিল? এই হতভাগাটার বাড়ীর পথে পা দিতে আছে? চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি—"

ভয়ে পদ্মর মুখে কথা ছিল না,—সে নীরবে তাদের সঙ্গে বাড়ী চলে গেল।

পর দিন উঠোনটা রোদে ভরে যেতে না যেতে, লোক মারফতে ভট্‌চায-গিন্নীর জমীদার-বাড়ীতে ডাক পড়ল। পূর্ব্বদিনের ঘটনাটা তাঁর অবিদিত ছিল না। এই আচম্বিতে ডাকে তাঁর মনে নানান্ দুশ্চিন্তা উঠ্‌তে লাগল। তিনি নারায়ণ স্মরণ করে ভয়ে ভয়ে বাড়ী থেকে বার হলেন।

ভটচায-গিন্নী উপস্থিত হলে ব্রজমুখুয্যেই প্রথমে কথা পাড়ল—"আপনাকে বিশেষ জরুরী কাজে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার আত্মীয় স্বজন না থাকাতে নিজেকেই সে কথাটা বলতে হচ্ছে। আমি আবার বিবাহ করব, তার জন্যে পাত্রীও ঠিক,—এখন তার অভিভাবকের মতেরই যা অপেক্ষা—"

কথাটা বুঝ্‌লেও ভট্‌চায-গিন্নী ধীর স্বরে বল্লেন—"আমায় তাতে কি করতে হবে?"

"আপনিই ত সব। পদ্মকে বিবাহ করতে হলে আপনারই অনুমতি চাই—"

ক্ষণিক নীরব থেকে ভট্‌চায-গিন্নী বল্লেন—"কিন্তু তাতে একটা মস্ত বাধা আছে—"

"কি?"

"আমার মেয়ের সঙ্গে মনোজ সেই কচি বেলা থেকেই মিলে মিশে আস্‌ছে। এখন তারা বড় হয়েছে, তারা দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে। আমার এবং তাদেরও ইচ্ছা যে, তাদের দুজনের মিলন হয়। কিন্তু কথাটা আপনার কাছে পাড়বার সুযোগ এত দিন হয়নি বলে, পাড়িনি। আপনি অনুমতি দিলে কাজটা—"

"দেখুন, ওসব হচ্ছে নেহাৎ বাজে কথা। মনোজ আমার ছেলে নয়, গিন্নী তাকে আদর-যত্ন করত এইমাত্র। তাকে এই জমীদারীর এক কণাও আমার দেবার ইচ্ছে নেই। কাযেই এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের কি বাধা থাক্‌তে পারে?"

"আপনি তাকে ছেলে বলে স্বীকার না করলেও, সে মনে মনে আপনাকে পিতার তুল্যই ভাবে। পদ্মর ভাগ্যে তার সঙ্গে বিয়ে না ঘটলেও, আপনাকে কন্যাদান কিসে সম্ভব?"

"কিসে সম্ভব নয়? আমি বিয়ে করলে, মনোজ যদি তাই ভাবে, তাহলে তাদের মা ছেলের সম্বন্ধ দাঁড়াল। তখনও ওরা দুজনকে ঐ চোখে দেখবে!"

কথাটা শুনে লজ্জায় ভট্‌চায-গিন্নীর মাথাটা নুয়ে পড়ল।

"তা আমার শেষ কথা—যদি আপনি সম্মত থাকেন, কালই বিয়ে হবে—"

"কিন্তু আমার পক্ষে সেটা যে একেবারেই অসম্ভব—এ আমি মা হয়ে পারব না—"

"আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন, আমি দেখচি—" বলেই ব্রজ মুখুয্যে দর্পের সঙ্গে অন্য ঘরে উঠে গেল। ভট্‌চায-গিন্নী একটা দারুণ সর্ব্বনাশের আশঙ্কা নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে, বনমালীকে ডেকে সব কথা বিবৃত করে বল্লেন—"এখন কি করি বাবা বল? ভয়ে আমার হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে—"

বনমালীর চোখে মুখে কেমন একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠল, গলার স্বরটাও খাটো হয়ে গেল, বল্লে—"মা কালীর দিব্বি,—যদি পদ্মঠাক্‌রুণের গায়ে হাত পড়ে, তবে আমি ওর মাথা নেবই, নইলে চাঁড়ালের ছেলে নই—"

তার মুখের চেহারায় ও কথায় ভট্‌চায-গিন্নী শিউরে উঠে বল্লেন—"সর্ব্বনাশ! বলিস্ কি?"

"ঠাকরুণ! তুমি ঘরে যাও—" বলে সে চলে গেল। ভট্‌চায-গিন্নী এই নূতন দুর্ভাবনায় আরও অস্থির হয়ে উঠলেন।

বেলা তখন দশ এগারটা—মনোজ ভট্‌চায-বাড়ীতে এসে পদ্মকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লে—"সব কথাই শুনেচ ত?"

"হুঁ—"

"আমি বাঁচবার একটা উপায় ঠাউরেছি।"

"কি?"

"আজই রাত্রে অন্ধকারে নদী পার হয়ে তিনজনেই চলে যাব—"

"কোথায়?"

"আমার মায়ের কাছে—"

"পথেই যদি ধরা পড়ি—?"

"সে ভয় নেই। কিন্তু আজই না গেলে—" কথাটা শেষ না করেই সে কিসের আশঙ্কায় যেন পদ্মর হাতখানা চেপে ধরলে।

কিছুক্ষণ বাদে বল্লে—"চল, তোমার মার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিগে—" পদ্ম নিজের মনের অবস্থা ঠিক ভাল মত বুঝে উঠতে পারছিল না,—সে নীরবে মনোজের অনুসরণ করলে।

প্রস্তাবটা শুনে ভট্‌চায-গিন্নী প্রথমটা তেমন সমর্থন না করলেও, সর্ব্বনাশের হাত হতে বাঁচবার এ ভিন্ন আর পথ নেই দেখে, সম্মত হয়ে বল্লেন—"বনমালীকে জানাই, সে কিছুদূর এগিয়ে রেখে আস্‌বে—"

কিছু দরকার নেই—আজ কিছু ঘটবার আশা নেই। সন্ধ্যার দিকে আমি আবার আসব—"বলে সে চলে গেল। মা ও মেয়েতে বুকের ব্যথা চেপে ভিটে ছাড়বার আয়োজন করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার দিকে মনোজ এসে জানিয়ে গেল—ঘাটে ছয় দাঁড়ে ডিঙি প্রস্তুত, তার মাঝিমাল্লারা সবাই এক একজন ওস্তাদ লাঠিয়াল, তীরের মত নৌকা চালিয়ে রাত্রির অন্ধকারেই তাদের পাঁচখানা গাঁ পারে নিয়ে ফেলবে, ভয়ের কোন কারণ নেই।

রাত তখন গভীর। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, পথ-চিহ্ন সব লুপ্ত। তারার মৃদু আলোয় গাছের তল দিয়ে তিনজনে তারা নিঃশব্দে ও সাবধানে চলেছে। নদী আর দূরে নেই! জলধারার শব্দ যেন কাণে আস্‌চে। তিন-জনেই মুক্তির আনন্দে ভরপুর।

হঠাৎ একটা কালো প্রাচীর যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে তাদের ঘিরে ফেললে। সেটা তাদের সামান্য একটু শব্দ করবারও অবসর দিলে না। তাদের বাজের মত ছোঁ দিয়ে নিয়ে অন্ধকারের গায়ে মিলিয়ে গেল।

পর দিন সারা গ্রামখানা চঞ্চল হয়ে উঠল। জমীদার-বাড়ীতেও কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। তার বুকের মধ্যে কি যেন লুকান। ভট্‌চায-গিন্নী, পদ্ম ও মনোজের সহসা অন্তর্ধানের কারণ কেউ খুঁজে পেলে না। ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন হেঁয়ালি!

সেই দিন রাত্রেই পাঁচশ লাঠিয়ালের পাহারার মধ্যে ব্রজ মুখুয্যের সঙ্গে পদ্মর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় পদ্মর সে কি কান্না! সে কান্না বোধ হয় সেখানে যারা উপস্থিত ছিল সকলকেই কাঁদিয়েছিল—অবশ্য গোপনে।

বিবাহান্তে অনেক রাত্রে, তখনও পদ্ম কাঁদচে, সান্ত্বনা দিতে ব্রজমুখুয্যে তাকে আলিঙ্গন করে তার সিক্ত গালটির ওপর একটু চুম্বন দিতে যেতেই, একখানি খেজুর-

গাছ-কাটা দা এসে ব্রজ মুখুয্যের মাথাটা প্রায় স্কন্ধচ্যুত করে ফেললে। তপ্ত রক্তে পদ্মর লাল চেলি, মুখখানা, মাথার চুলগুলি ছুপিয়ে গেল। সে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল—"বনমালী, বনমালী—"

বনমালীরা পাঁচজনে যেমনি নিঃশব্দে এসেছিল, ঠিক তেমনিভাবে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বাইরের দরজার কাছেতার ধরা পড়ে গেল। অবশেষে বিচারে তাদের আজীবন দ্বীপান্তর বাস ও কারুর কারুর জেলের শাস্তি হল—" আমীন থামল।

জিজ্ঞাসা করলুম—"মনোজ ?"

"কেউ বলে, তাকে মনসাপুরের গভীর জঙ্গলে মেরে পুতে ফেলেচে, কেউ বলে, নদীর জলে সেই রাত্রেই গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে মেরেচে। তবে এটা সত্যি যে জমীদার-বাড়ীর বাইরের উঠানে যে সাদা পাথরখানা পড়ে থাকত, —এরপর থেকে সেটাকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি—

"ভট্‌চায-গিন্নী ও পদ্ম ?"

"তারা সেই রাত্রি থেকেই ঐ বাড়ীতে বাস করতে লাগল। সম্পত্তি সব পাঁচ জনে লুটে পুটে নিলে। বর্ত্তমানে দিলগঞ্জের মালিক "পাউড়ি ভাণ্ডার" দাশেরা। কিছুকাল বাদে ভট্‌চায-গিন্নী মারা গেলে মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। ঐ বিশাল ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে সে সারাদিন নদীর পানে চেয়ে থাকত—মনে হ'ত মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখচে, কি যেন খুঁজচে। বহুকাল আগে এই নদী-পথে গভীর রাত্রে যারা আসা-যাওয়া কোরেচে, তারাই শুনেচে, কে যেন তীরে বসে কাঁদচে। সে কান্নার সুর সমুদ্র-কিনারে এক জাতীয় পাখীর উত্তাল তরঙ্গের পানে তাকিয়ে কান্নার মত তীক্ষ্ণ ও করুণ—"

কথাটা শেষ করেই সে যেন কিছু ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। আমি ফিরে দেখলুম—পিছনে রাত্রির কালো আঁচলখানি যবনিকার মত পৃথিবীর ওপর খসে পড়েচে, তার গা বেয়ে তারার ম্লান আলোকধারা আর নদীর দুটি কূল ভরে তারই মর্ম্মব্যথা মৃদু বেজে বেজে উঠ্‌চে !

চন্দননগরের আনন্দ উৎসব

শ্রীহরিহর শেঠ

আনন্দ উৎসবের উদ্দেশ্যে চন্দননগরে সাধারণ অনুষ্ঠান সকলের অভাব কখন হয় নাই। অপরাপর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের তুলনায় এ বিষয়েও চন্দননগরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বহুকাল হইতে যে সকল উৎসব ও পূজাদি হইতেছে বা হইত, তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, শ্রীশ্রীকার্ত্তিক পূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা, রথ, স্নানযাত্রা, দ্বাদশ-গোপাল, পাঠভাঙ্গা, ঝাঁপান, পৌষ পার্ব্বণ, জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীর বাদাই, ফ্যাণ্ডা ও গোস্বামীর ঘাটের মেলা বা খুস্তির মহোৎসব উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন বারোয়ারি পূজা এবং তদুপলক্ষে যাত্রা নাচ তামাসা দ্বারা আমোদ প্রমোদেরও এখানে পূর্ব্বে ব্যবস্থা খুব প্রচুর ছিল। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে পূর্ব্বে এখানে বিশেষ ধুম ছিল।

এখানকার শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রসিদ্ধি যথেষ্ট এবং বারোয়ারীর এই পূজাগুলি বহুকালের। এত বড় এবং এরূপ মনোহর সাজে সজ্জিত প্রতিমা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। আজকাল গঞ্জে চাউলপটি ও কাপড়ে পটিতে দুইখানি এবং উড়েপাড়ায় একখানি বড় ঠাকুর পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গোয়ালাপাড়া ও দাসপুকুর নামক স্থানে আর দুইখানি প্রকাণ্ড ঠাকুর পূজা হইত। দীঘির ধার নামক স্থানেও মধ্যে কয়েক বৎসর একখানি বড় ঠাকুর হইয়াছিল। উহার প্রধান উদ্যোগী মহেন্দ্রনাথ নন্দীর মৃত্যুর সহিত উহা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত ঠাকুরগুলির মধ্যে চাউলপটি এবং তৎপরে কাপড়ে-পটির পূজা বহু পুরাতন। বাজারে উক্ত ঠাকুরের নামে খরিদদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা হইতেই প্রধানতঃ পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আরম্ভ কাল ও প্রতিষ্ঠার আদি কথা অতি বৃদ্ধ লোকেদের জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। শুনা

যায়, কাপড়েপটী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তিনিই প্রথম এই পূজা আরম্ভ করেন। চাউলপটীর ঠাকুর সম্বন্ধে কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানকার লক্ষ্মীগঞ্জ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার অল্প পরে উহার প্রতিষ্ঠা হয়।

এই পূজার বিশেষত্ব এই যে, গৃহস্থ সাধারণের পূজার ন্যায় এক দিনের পরিবর্ত্তে দুর্গোৎসবের ন্যায়, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে তিন দিন পূজা হইয়া থাকে। তিন দিন নাচ গান এবং কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়া অতি সমারোহের সহিত প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। ইহা দেখিবার জন্য গঙ্গার ধারের রাস্তায় স্থানীয় এবং দূরাগত বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকার্ত্তিক ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা সংখ্যায় এখানে অনেক হইয়া থাকে এবং কতকগুলি বারোয়ারির বৃহদায়তন ঠাকুর খুব সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভাসানের দিন বাহির করা হয়। সরস্বতী পূজার সংখ্যা ক্রমেই এখানে বৃদ্ধি পাইতেছে।

হাটখোলার ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজাও খুব প্রাচীন। ঠিক কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এবং কিরূপে এই পূজা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কিংবদন্তী এইরূপ, শিলেটের বিশালাক্ষী দেবীর স্বপ্নাদেশে, এক ব্রাহ্মণ রথের দিন দেবী-মূর্ত্তি গড়িয়া প্রথম পূজা

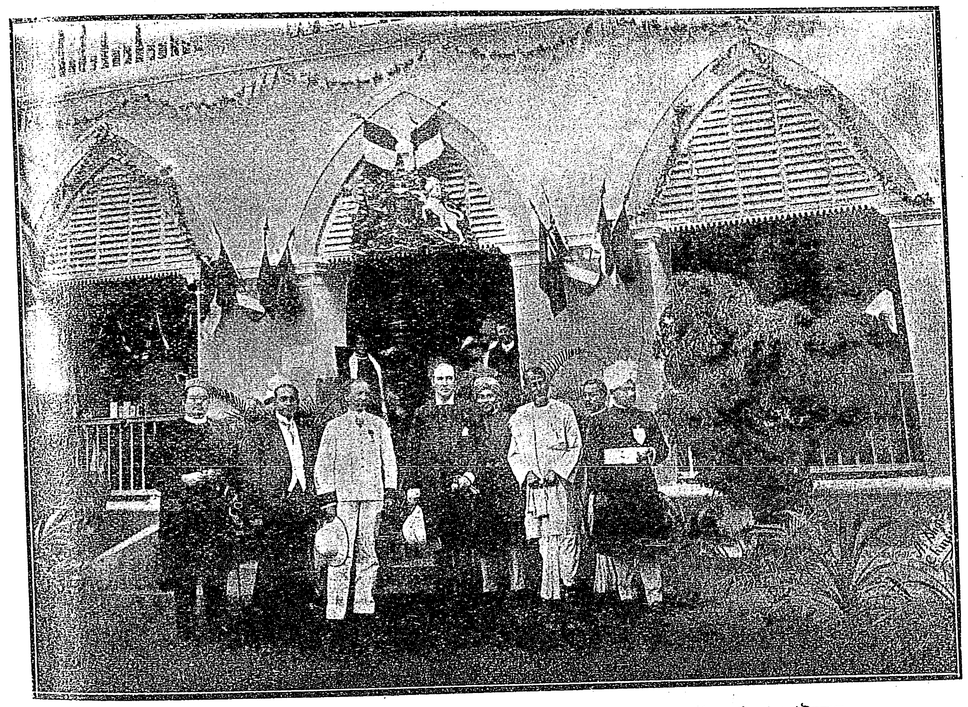

চন্দননগর এক্সপোজিসনে ফরাসী ভারতের গবর্ণর মসিয়ে মার্টিনো ও বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল

করেন। পূর্ব্বে এই পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসিত এবং এখনকার অপেক্ষা তখন লোক-সমাগম অনেক অধিক হইত। ইঁহার পূজা উপলক্ষ করিয়া এখনও একটি বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে।

পালপাড়ার পালেদের রাসযাত্রা এবং খলিসানীর বসু মহাশয়দের এবং বোড়র প্রেমনারায়ণ বসু মহাশয়ের দোল-যাত্রা উপলক্ষে পূর্ব্বে মহা ধুমধাম হইত। ইহা ব্যক্তি

বিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও, লোকে সাধারণের উৎসব মনে করিয়া উহাতে যোগদান করিত। উক্ত বসু মহাশয়দের দোলযাত্রার উৎসব এখনও সামান্য ভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পালেদের রাসযাত্রা বহু দিন হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সুবৃহৎ সুগঠিত রাসমঞ্চটি এখনও দণ্ডায়মান আছে মাত্র। ইহা ভিন্ন কালীতলা নামক পল্লীতে

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মাতা

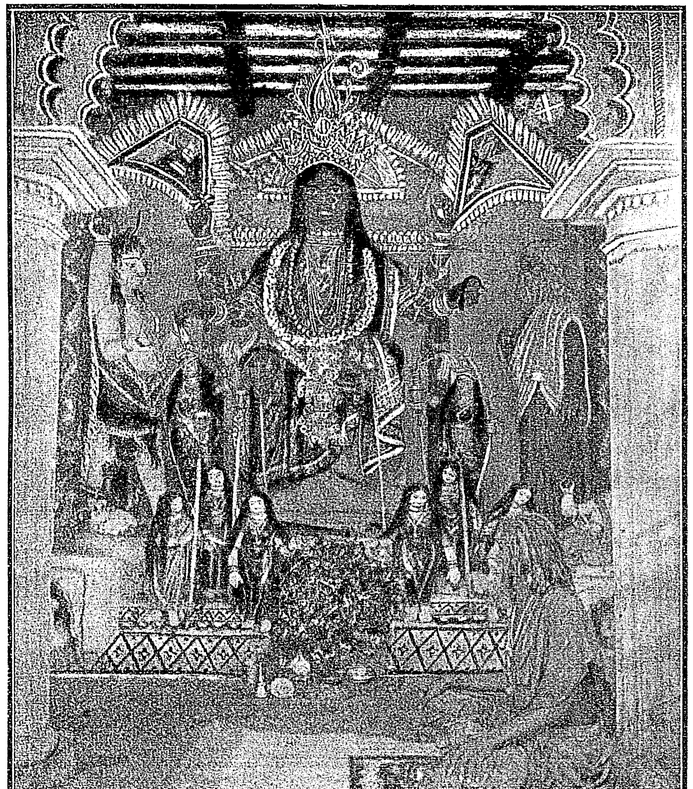

পূর্ব্বকালে মহা ধুমধামের সহিত দোল উৎসব সম্পন্ন হইত এবং প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিত। ইহার প্রাচীনতার কথা কেহই জানেন না। তথায় কারুকার্য্যবিশিষ্ট যে দোলমঞ্চ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

রথ এখানকার একটি বড় উৎসব। বর্ত্তমানে ছোট বড় রথের সংখ্যা অধিক না থাকিলেও, যাদুঘোষের রথের প্রসিদ্ধি এখনও বহুদূর বিস্তৃত। এক মাহেশ ভিন্ন এতদঞ্চলে এত রথের ধুম আর কোথাও হয় না। যাদু ঘোষ মহাশয় একজন ধার্ম্মিক ও ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহার উদ্যানস্থিত নিম্ব বৃক্ষ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা ও রথ প্রতিষ্ঠার জন্য পথিমধ্যে উপর্য্যুপরি দুই দিন স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া তিনি আদেশ মত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া রথ প্রতিষ্ঠা করেন। কিংবদন্তী শুনা যায়, তিনি তাঁহার অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ কিরূপে দেবাদেশ পালন পূর্ব্বক পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এই চিন্তায় ম্রিয়মাণ হওয়ায়, দেব নির্দ্দেশে স্বপ্নেই অবগত হন, নিম্ববৃক্ষ মূলেই অর্থ প্রোথিত আছে। এই অর্থেই তিনি রথ নির্ম্মাণ করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য সূচিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রথ ত্রয়োদশ চূড়া বিশিষ্ট এবং আকারে অতি বৃহৎ ছিল। পুনঃপুনঃ সংস্কারে এক্ষণে তাহার আকার কিছু ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণে ১৩ চূড়ের পরিবর্ত্তে নব-চূড় করা হইয়াছে।

যাদু ঘোষের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও দ্বাদশ গোপালের ধুমও পূর্ব্বে এখানে খুবই ছিল। সোজা রথ হইতে উল্টা রথ পর্য্যন্ত দ্বাদশ গোপালের সময়। পূর্ব্বে এই উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসিত। স্নানযাত্রায় এখনও একটি মেলা বসিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় তাহা এখন সামান্য।

বৃটিশ ভারতে আইনের দ্বারা চড়কের সময় বাণফোঁড়া নিষিদ্ধ হওয়ার পরও অনেক দিন এখানে এই নিষ্ঠুর আমোদ প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে উহা উঠিয়া গেলেও পচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও চড়কের যথেষ্ট ধুম ছিল। তখনও বিবিরহাট, গঞ্জ, বারাশত ও পঞ্চাননতলায় চড়কের উৎসব হইত। এখন নামে মাত্র চড়ক পূজা হইয়া থাকে।

পাঠভাঙ্গার অবস্থাও সেই রূপ। শ্রীশ্রীবোড়াইচণ্ডী মাতার মন্দিরের সম্মুখে চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূর্ব্বে পাঠভাঙ্গার

স্নান যাত্রা

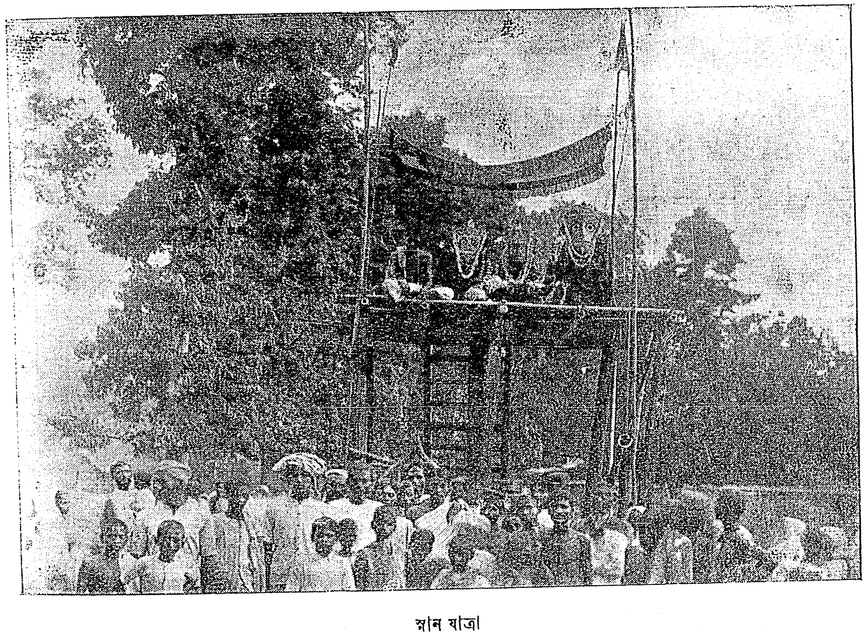

যথেষ্ট ধুম হইত। তখন দ্বিতলের ছাদ অপেক্ষাও উচ্চ স্থান হইতে সন্ন্যাসীরা পাঠভাঙ্গা করিতেন। এই স্থানে পাঠভাঙ্গার উৎসব এখনও হইয়া থাকে। উহা দেখিবার জন্য অনেক লোকও জড় হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আর বিশেষত্ব কিছু নাই। একটি সামান্য উচ্চ মঞ্চ হইতে এখন পাঠভাঙ্গা হইয়া থাকে। পঞ্চাননতলায় ধর্ম্ম গাজন উপলক্ষে ও দেবী সরকারের বাটীর নিকট পূর্ব্বে কতিপয় বৎসর পাঠভাঙ্গা হইয়াছিল।

ভাদ্র মাসে শ্রীশ্রীমনসা দেবীর পূজা উপলক্ষ করিয়া কলুপুকুর নামক পল্লীতে ঝাঁপান হইয়া থাকে। মালেদের সর্প লইয়া খেলা প্রদর্শন করাই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ভদ্রলোক অপেক্ষা ইতর শ্রেণীর লোকের সমাগম অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বের তুলনায় ঝাঁপানের আমোদও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

পৌষ পার্ব্বণ বা পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠা-পুলি খাওয়ার ও লোকজনকে খাওয়ানর আনন্দ পল্লীগ্রাম মাত্রেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। এক সময় এ উৎসব বাঙ্গালী মাত্রেই আহ্লাদের সহিত পালন করিত, কিন্তু কাল ক্রমে সে আনন্দ অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহা বরং সামান্য গৃহস্থ ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে; কিন্তু ধনবানদের গৃহে এ সব আমোদ প্রায় নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে চন্দননগরে পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হইত এবং সংকীর্ত্তনের দল নগর পরিভ্রমণে বাহির হইত বলিয়া শুনা যায়।

বাদাই বস্তুটি কি ছিল—আজকালের যুবকগণ অনেকে বুঝিতেই পারিবেন না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চন্দননগরে ইহা একটি বাৎসরিক বিশেষ আমোদ-

উৎসব ছিল। নন্দোৎসবের অঙ্গ স্বরূপ এই উৎসব জন্মাষ্টমীর দিন বহু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পালিত হইত। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল, সাজসজ্জা করিয়া বিবিধ প্রকার সংএর দল বাহির করিয়া রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করা। ইহা এক কথায় ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল বা কলিকাতার চৈত্র সংক্রান্তির জেলেপাড়ার সংয়ের ছোট সংস্করণ মাত্র বলা যাইতে পারে।

চন্দননগরে এই উৎসবের আরম্ভ কবে হইয়াছিল, বা ইহা বহু পূর্ব্ব কাল হইতে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা

হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা এল, ঐরাবতে পুরন্দর,
গালে বাজায়ে এল হর ॥
(বো বো বোম গালে বাজায়ে এল হর) ॥"

ক্রমে দেশে যাত্রার অভিনবত্বে ও থিয়েটারের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির সহিত লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন পুরাতন একঘেয়ে ধরণের সং আর লোকের ভাল লাগিল না। ইংরাজি ১৮৮২ সাল হইতে ইহা নূতন ভাবে এবং সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে ঠাকুর দেবতার পালার সহিত "ভাণের মা

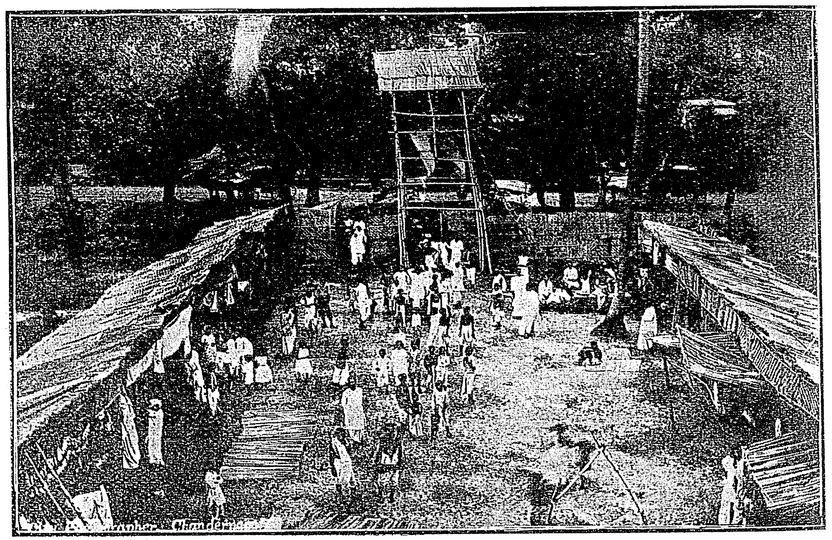

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ১৩৩১ সালের মেলা

জানা যায় না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাদাই হইত, তাহাতে সাজসজ্জার বাহুল্য ছিল না; কেবল নন্দ, যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ মাত্র সাজাইয়া একটি দল প্রস্তুত হইত। ক্রমে উহার সহিত হিজড়া, অতিরিক্ত ধোপা ইত্যাদি দুই একটি সং সংযোজিত হয়। তখন এই গীতটী সাধারণতঃ গীত হইত;—

"নন্দের আজ আনন্দ অন্তর
নন্দের কাদা মাখা কলেবর ॥

গঙ্গা পায় না" "যম পুরি" "চার ইয়ার" "শাশুড়ি বোয়ের দ্বন্দ্ব" প্রভৃতি পালা এবং লহর টপ্পা, ময়ূর পঙ্খী, মাঝি, তুলা ধোনা প্রভৃতির সং কলিকাতা হইতে ভাল ভাল পরিচ্ছদাদি আনাইয়া সজ্জিত হইয়া বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় গানের সহিত বক্তৃতা, কবির গান, নহবৎ, তক্তানামা প্রভৃতি থাকিত। কোন কোন পালার ভিতর দিয়া লোক শিক্ষার উপযোগী ছড়া ও সঙ্গীত গীত হইত। সময় সময় ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপও গানের মধ্যে থাকিত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঁচ ছয় বৎসর বৈদ্যপাড়া, গোয়াবাগান, ভাকুণ্ডা ও দুপ্লেক্স্ পটি এই কয় স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া মহাসমারোহের সহিত বাদাই হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায় ৫।৭ দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে ব্রতানুষ্ঠান হিসাবেই বাদাইয়ের প্রথম উৎপত্তি হইলেও, ক্রমে বিভিন্ন পল্লী হইতে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়া জেদাজেদি ও রেষারেষিতে ভিন্নাকার ধারণ করিল। এবং কবি হাফ আখড়াইয়ের দলের ন্যায় এক পাড়ার সহিত অপর পাড়ার উত্তর

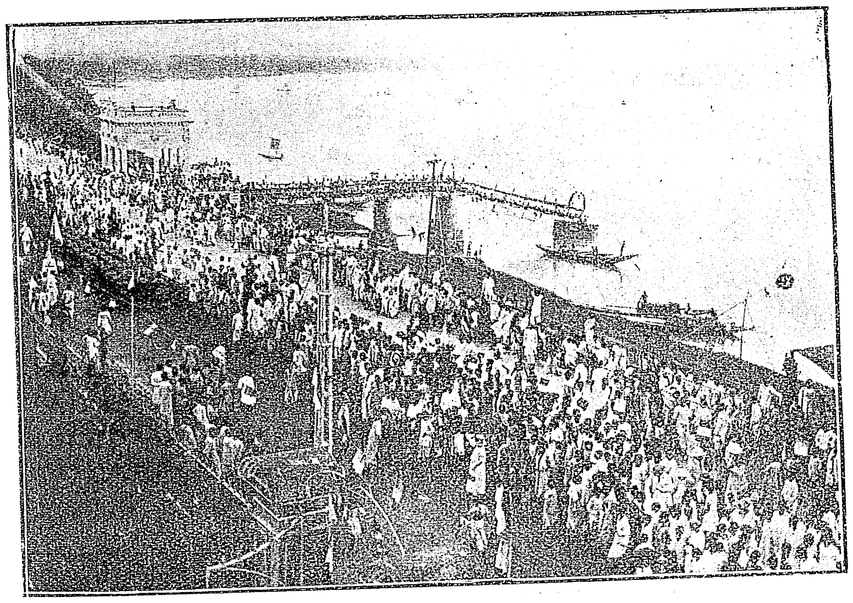

ফ্যাক্টা

প্রত্যুত্তর সুরু হইয়া শেষে কুৎসা প্রচার আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত শ্লেষ এবং সামাজিক কুপ্রথা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় অনেক গীত রচিত হইত। সমাজের দুর্নীতি সংস্কার ও বিশিষ্ট লোকেদের বা সাধারণের চরিত্র সংশোধনের জন্য পাড়ার মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত বৎসর একখানি পল্লীর লোকের সব বিশেষ বিশেষ দোষ লিখিয়া রাখিত। গান বাঁধিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে বৎসরান্তে বাদাইয়ের সংয়ের সহিত তাহা গীত হইত। শুনা যায়, এই ব্যাপার শেষে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল।

ইহার পর সামান্য ভাবে কয়েক বৎসর উৎসব হইয়াছিল। ১৩১২৫ বৎসর হইতে এখানে বাদাই আর হয় না। যাঁহাদের উদ্যোগে এই সকল দল সৃষ্ট হইত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যুর সহিত ইহা বিলুপ্ত হয়। নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বর ও নবাবগঞ্জে বাদাইয়ের খুব ধুম হইত। কিন্তু চন্দননগরের মত সমারোহ এ প্রদেশে কোথাও হইত না। এখানে অনেক দূর, এমন কি কলিকাতা, হইতেও লোকে দেখিতে আসিত। শেষ সময়ে ইহার উদ্যোগিবর্গের মধ্যে ৺অম্বিকাচরণ নন্দী, ৺অম্বিকাচরণ দে, ৺ননিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র লাহা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। *

জন্মাষ্টমীর বাদাইয়ের ধুম যখন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় বিবিরহাট নামক স্থান হইতে স্বর্গীয় রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীমতিলাল পলশাই মহাশয়ের সহায়তায় চারি পাঁচ বৎসরের জন্য

* ৺অম্বিকাচরণ দে মহাশয়ের অপ্রকাশিত বিবরণ হইতে প্রধানতঃ ইহা সংগৃহীত হইল।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর দিন বাদাই বাহির হইয়াছিল। ইহার গীতাদি প্রধানতঃ শ্রীরাধা বিষয়ক হইলেও, ইহার সহিত নূতন পাঁজি, তূলা ধোনা, দাই, হিজড়া, নাপিত, নাপিতানি প্রভৃতি সং বাহির হইত। †

নিম্নে জন্মাষ্টমীর কয়েকখানি গীত উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথা শেষ করিতেছি।—

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের গান।

"ইহলোক পরলোক ত্রিলোকেতে পূজে যায়,
গোলোক পরিহরি হরি ভূলোকেতে শোভা পায়।
ধন্য গো মা নন্দরাণী ধন্য পুণ্য করেছিলে;
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতীর্ণ আজি তব পুণ্য ফলে।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি ডাকিবেন মা-মা বলে
অবহেলে পেলে মাগো ভব তরিবার উপায়।"

একখানি অতি প্রাচীন গান।

"(আজি) আনন্দের অবধি নাহি শ্রীনন্দ ভবনে
নাচে প্রেমানন্দে উপানন্দ শ্রীনন্দের সনে॥
ঐ শিশু হেরি গোপগণে (তারা) সবাই ভাবে মনে মনে।
বুঝি গোলোকপতি বালক-রূপে উদয় গোপনে॥
(মনে জ্ঞান হয় গো)
কেহ বলে নন্দের কিবা সাধ্য ঐ সাধিলে গো কি অসাধ্য;
দেখ দেবারাধ্য আবদ্ধ আজ তব নিকেতনে॥
(গোপ শিশু ছলে হে)
কেহ ভুলিয়া বিষ্ণু মায়াতে, দেখ পদধূলি লয়ে হাতে
দিতেছে ঐ কৃষ্ণের মাথে উল্লসিত মনে॥
(জীও জীও বলেরে)

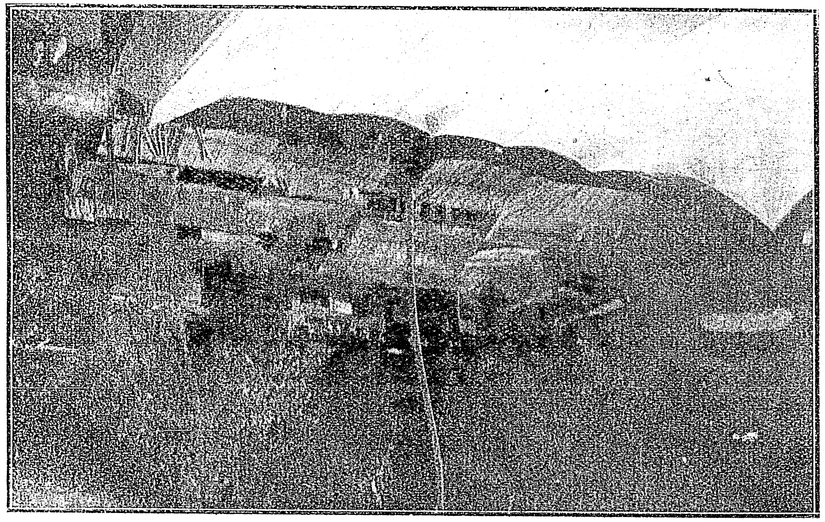

গোস্বামী ঘাটের খুন্তীর মহোৎসব

ধন্য গো মা নন্দরাণী ধন্য পুণ্য করেছিলে;
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতীর্ণ আজি তব পুণ্য ফলে।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি ডাকিবেন মা-মা বলে
অবহেলে পেলে মাগো ভব তরিবার উপায়।"

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না"র একটি গীত,—

"যমের বাড়িতে তোমরা চল শীঘ্র চলরে।
এমন করে এ সংসারে বেঁচে কি ফল বলরে॥
জননীকে দিসনে খেতে, জন্মেছিলি কোথা হতে,
সোনার বাউটি বেশ্যার হাতে, মরণ কেন না হ'লরে॥
শ্বেত চামরের বাতাস দিয়ে, দিচ্চে তোদের ভূত ঝাড়িয়ে,
যেমন কুকুর মুগুর খেয়ে হ'স যদি তায় ভালরে॥"

"চার ইয়ারের" একটি ছড়া,—

১ম—"আমি হিন্দুয়ানির অঞ্জলি এবার করেছি!
২য়—বামুন ভোজনের দফায় শূন্য দিয়েছি!
৩য়—আমি দীক্ষা ছেড়ে ব্রাহ্ম হয়েছি!
৪র্থ—এখন পড়েছে যে বিষম কাল
উল্টা ধারা হ'ল যে বাহাল,
হায় হায় এমনি মজার কলিকাল॥"

ইত্যাদি—*

রাধাষ্টমীর বাদাইয়ের একটি গীতের অংশ,—

আমরা যাই চল ভাই রাজভবনে দেখতে উৎসবো।
হেরে সুখার্ণবে ভাসিবো॥

যাদু ঘোষের রথ

হয়েছে রাজার সুতা, সর্ব্ব সুলক্ষণযুতা।
শুনিলাম সে রূপের কথা অতি অসম্ভবো॥
* * * *"

ফ্যান্তা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় বাৎসরিক উৎসব। ফরাসী ফেত্ কথা হইতে এই নামের উৎপত্তি। ফরাসীতে উহাকে Fete National বলে। প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক ম্যারের কর্ত্তৃত্বে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাস্তিল

† শ্রীযুক্ত মতিলাল পলশাই মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীশ্রী-রাধাষ্টমীর বাদাইয়ের কথা অবগত হই।

* গীতগুলি ৺অম্বিকাচরণ দে মহাশয়ের লেখা হইতে পাইয়াছি।

(Bastile) নামক দুর্গ ধ্বংস করিয়া, ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আরম্ভ কাল দ্বিতীয়বার প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পর। তোপদাগা, বাজি পোড়ান, বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক, নৌকার বাচখেলা, সরকারি স্থান সকল সজ্জিত করা এবং দীন দুঃখীদের দান করাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

এই উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, যখন ফ্রান্সে রাজা ছিলেন, তখন তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই আগষ্ট ফেত্-দে রোয়া (Fete du Roi) নামে এখানে আর একটি ফ্যান্তা হইত। উহা ঠিক এখনকার ফ্যান্তারই অনুরূপ একটি জাতীয় উৎসব ছিল। এখনকার মত তখনও পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যায় এবং উৎসবের দিন প্রাতে ২১টি করিয়া তোপ পড়িত। রোসনাই, বাজি পোড়ান সবই হইত। অধিকন্তু তৎকালীন রাজ-আইনে ঐ দিনে এখানকার অন্য যাহা কিছু উৎসব সমুদায় বন্ধ রাখিতে হইত।

গোস্বামীঘাটের মেলা এখানকার একটি বাৎসরিক উৎসব। ইহার অপর নাম শ্রীশ্রীখুন্তীর মহোৎসব। উহা অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার দিন আরম্ভ হইয়া এক পক্ষ কাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের আবির্ভাবে যখন শ্রীনবদ্বীপধাম হরিনামের বন্যায় প্লাবিত হয়, তখন তান্ত্রিকগণের অনাচার-স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে। সেই সময় তান্ত্রিক যাজকগণ মহাপ্রভুর কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য কাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম কাজী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা নাম প্রচারে বাধা দেন। কিন্তু পরে তাঁহার উপদেশ প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া কাজী তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন; এবং যাহাতে তাঁহার হরিনাম প্রচার কার্য্যে কেহ বাধা প্রদান করিতে না পারে, সে জন্য সম্রাট আকবর শাহের নাম স্বাক্ষরিত একখানি তাম্রলিপি শ্রীনিমাইকে দান করেন। উহা দেখিতে কতটা খুন্তীর মত ছিল বলিয়া লোকে উহাকে খুন্তী বলিয়া জানিত। এই হইতে সংকীর্ত্তনের দলের সহিত ঐ খুন্তীর অনুরূপ খুন্তী লইয়া ভ্রমণ প্রচলিত হয়।

এই সময় নবদ্বীপের শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নামক একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত একখানি তাম্রলিপি করাইয়া লইয়াছিলেন। চন্দননগর গোস্বামীঘাটের বর্ত্তমান গোস্বামী মহাশয়দিগের আদিপুরুষ, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী মহাশয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। তিনি পরে পণ্ডিতের নিকট হইতে খুন্তীখানি প্রাপ্ত হন। শ্রীরঘুনাথ একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের বংশধর শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সহিত এই খুন্তীর ব্যবহার লইয়া খড়দহ গ্রামে তাঁহার বাদানুবাদ হয়; এবং ৯১০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি উহা ভাগীরথী গর্ভে নিক্ষেপ করেন। এই খুন্তী অবিলম্বে উজান বাহিয়া এই স্থানে ভাসিয়া আইসে। সেই দিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় এই খুন্তীর পূজা আরম্ভ হয় এবং তদবধি এই স্থানের নাম শ্রীজগদীশ তীর্থ বলিয়া খ্যাত হয়। প্রথম প্রথম গোস্বামীগণের আদিদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে সামান্য ভাবে মহোৎসবাদি হইত। পরে প্রধানতঃ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়দিগের উদ্যোগে এবং বহু লোকের সহায়তায় ১২৯২ সাল হইতে শ্রীশ্রী খুন্তীর মহোৎসব নামে এই অগ্রহায়ণী মেলা সমারোহের সহিত আরম্ভ হইয়া প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হইয়া আসিতেছে। *

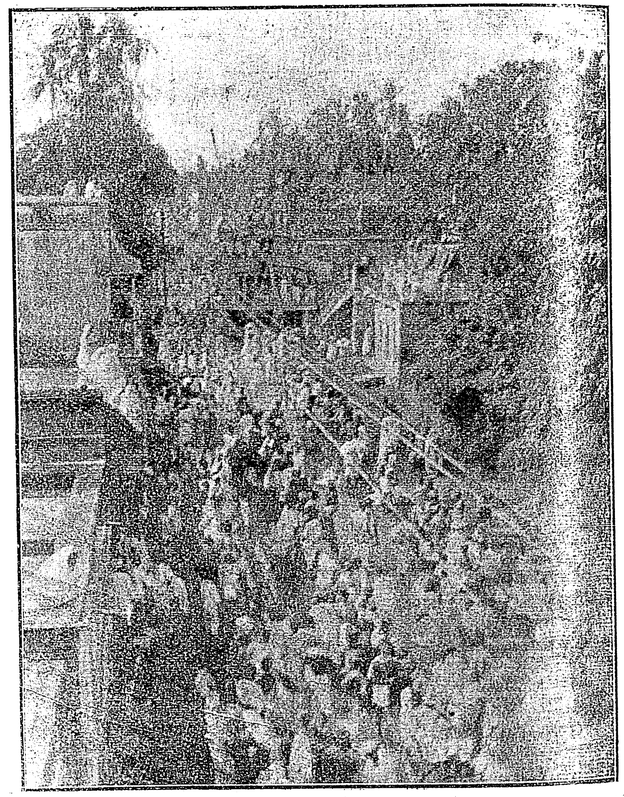

রথ যাত্রা

অন্যরূপ বিবরণ হইতে জানা যায়—পূর্ব্বকালে গোস্বামীদিগের পূর্ব্বপুরুষ আউল নামক একজন বৃদ্ধ তাঁহার জন্মস্থান মালপাড়া হইতে প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। কথিত আছে, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ, তাঁহার প্রত্যহ দীর্ঘ-পথ-ভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি প্রশমনার্থ তাঁহাকে স্বপ্নে জ্ঞাত করেন যে, গঙ্গার পরপারে ক্ষীরপাড়া পুষ্করিণীতে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি লুকাইত আছে; এবং তাহা উঠাইয়া আনিয়া গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাদির ব্যবস্থা করিতে আদেশ করেন। তখন গোস্বামীজী সেই দেবমূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মেলার প্রথম হইতেই এই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া উৎসব হইতেছে। পরে বহু দিবসাবধি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউকে ও শ্রীশ্রীগোপালজীউকেও উৎসব ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইত। পরে গৃহবিচ্ছেদের ফলে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন গোস্বামী কয়েক বৎসর ধরিয়া যখন স্বতন্ত্র

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই বিবরণ প্রদান করেন।

আর একটি মেলা করেন, তখন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ তথায় বিরাজ করিতেন; এবং তদবধি পুরাতন মেলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীই প্রতি বৎসর বিরাজ করিয়া থাকেন। † এ বৎসরও পুরাতন মেলার উত্তর দিকে নূতন মেলা হইয়াছিল।

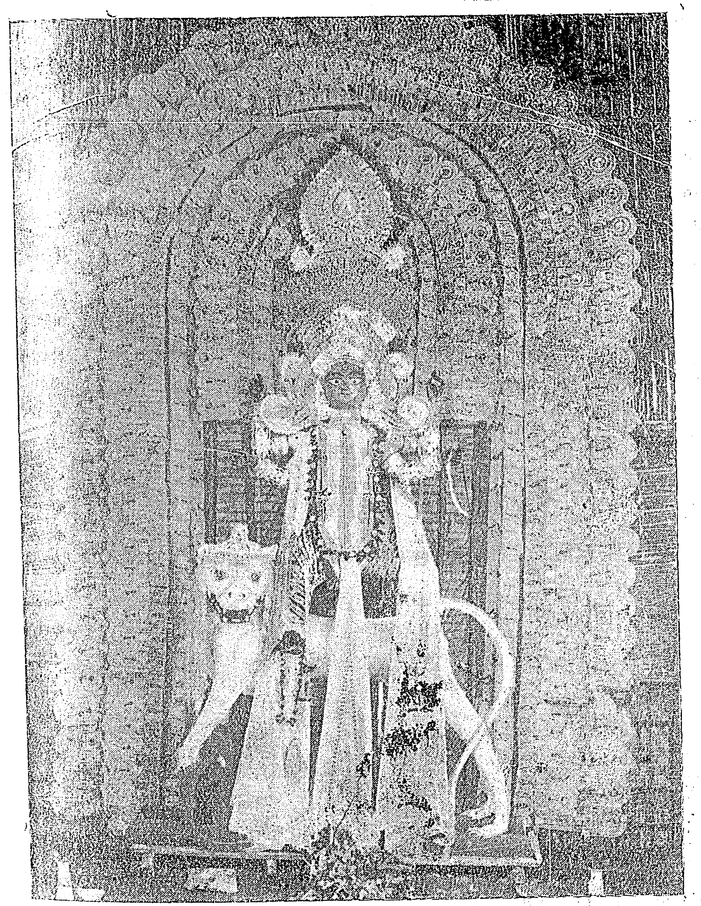

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-প্রতিমা

চন্দননগরের এই মেলার নাম বহুদূর পর্য্যন্ত খ্যাত। ইহাতে বহু প্রকার মাটির সঙ, পৌরাণিক ও বিবিধ শিক্ষণীয় দৃশ্যাদির সমাবেশ ও মেলাক্ষেত্র সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হয়; এবং পুতুলের নাচ, যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতির অভাব থাকে না। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু দোকান-পত্র আসিয়া থাকে। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় এই মেলার কথার উল্লেখ দেখা যায়।

এ বৎসর গোস্বামীঘাটে চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যোগে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে পনর দিন ব্যাপী এক মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বিশেষত্বের অভাব ছিল না। দক্ষিণেশ্বর হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের গ্রাম সকলের ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। চন্দননগরের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় দেখাইবার ও জানাইবার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নরনারীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই নব অনুষ্ঠানে অনেকগুলি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান আসিয়াছিল এবং লোক-সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল।

চন্দননগরে ইতঃপূর্ব্বে ১৩১৬ ও ১৩২২ সালে আর দুইটি উৎসব ও প্রদর্শনী হইয়াছিল। প্রথমটির নাম সারস্বত উৎসব। সারস্বত সম্প্রদায় ও কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় ১৩১৬ সালের শ্রীপঞ্চমীর সময় ৺নকুড়চন্দ্র কর মহাশয়ের বাগবাজারস্থ বাগানবাড়ীতে কলাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানবিদ্যাদায়িনী বাগ্‌দেবীর পূজা উপলক্ষ করিয়া ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিবিধ-বিষয়, স্থানীয় শিল্পিগণের হস্ত-

† ৺রাজেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত তুলসীদাস গোস্বামীর নিকট হইতে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রস্তুত বহু দ্রব্য, মহিলাবৃন্দের স্বহস্তচরিত কারুকার্য্য, স্থানীয় সাহিত্যিকগণের হস্তলিখিত ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী, পুরাতন দলিলাদি এবং প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও চিত্রাদি এবং অন্যান্য বহু চিত্র প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া একটি অভিনব ধরণের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে এমন অনেক শিল্পীর হস্ত-প্রসূত সুন্দর শিল্পসম্ভার সংগৃহীত হইয়াছিল, যাঁহাদের কথা পূর্ব্বে অনেকের জানাই ছিল না। সুভাব, সুনির্ম্মিত প্রতিমা সান্নিধ্যে, সুচারুরূপে সজ্জিত,—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, মধুসূদন প্রভৃতির সুগঠিত মৃন্মূর্ত্তি শোভিত মণ্ডপে বহুবিধ উৎসব আনন্দের এবং সঙ্গীত ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাদির অভাব ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় বসন্তকুমার মিত্র মহোদয় 'কলাবিদ্যার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় এখানকার সাহিত্য, শিল্পসাধনা, ঐতিহাসিক বিশেষত্ব প্রভৃতির কথা বিশদ ভাবে বলিয়াছিলেন।

এই উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য কোন মূল্য লওয়া হয় নাই। উহা সপ্তাহ কাল খোলা ছিল। এই অভিনব, বিশিষ্টতাপূর্ণ সারস্বত উৎসবের কথা চন্দননগরবাসীর হৃদয়ে বহু দিন জাগরিত থাকিবে। ইহার মধ্যে প্রাণের পরিচয় ছিল। এ প্রদেশে এ ভাবের উৎসব করিবার বোধ হয় ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। তৎপরে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে, মতিলাল রায়, নারায়ণচন্দ্র দে, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। এ কার্য্যের জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অপ্রকাশিত আছে। ইহার মধ্যে একজন ৫।৬ শত টাকা ও একজন ৭০৲-৭৫৲ টাকা দিয়াছিলেন। আরও কতিপয় ব্যক্তি কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। *

* ৫ই ফাল্গুনের "মাতৃভূমি" হইতে ইহার কোন কোন বিবরণ গৃহীত হইয়াছে।

বড় বড় সহরের বড় বড় প্রদর্শনীর তুলনায় ১৩২২ সালের চন্দননগর প্রদর্শনী অকিঞ্চিৎকর হইলেও, চন্দননগরের ইতিহাসে ইহা উল্লিখিত থাকিবার যোগ্য। ইয়োরোপের বিগত মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের সাহায্য কল্পে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মসিয়ে ভ্যাঁসার (Mons. C. Vincent) পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৩২২ সালের শীতকালে ডুপ্লে কলেজ ভবনে এই প্রদর্শনী ও উৎসব হইয়াছিল। ইহাতে কেবল যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ

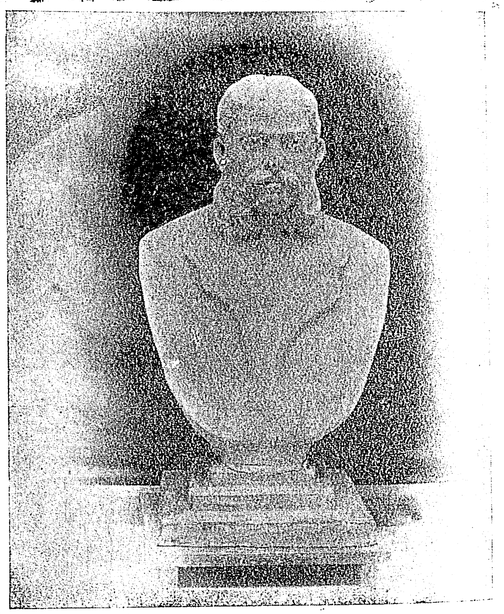

মাইকেল মধুসূদনের মৃন্মূর্ত্তি

দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ী ও কারখানাওয়ালারাই তাঁহাদের দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুবিধ স্বদেশজাত দ্রব্য আসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় জগৎ-প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র এবং ঢাকা, কৃষ্ণনগর, বেনারস, কাশ্মীর, জয়পুর, মীর্জাপুর, মোরাদাবাদ, কানপুর, খাগড়া প্রভৃতি ভারতের যেখানকার যে শিল্প প্রসিদ্ধ, তথা হইতে সেই হেন

দ্রব্য সমূহ আসিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। স্থানীয় শিল্পীদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি, মহিলাদের নির্ম্মিত চারু শিল্প, কনভেণ্টের মেয়েদের তৈয়ারি বিবিধ কারুকার্য্য প্রভৃতিতেও ইহা শোভিত হইয়াছিল। মেশিন্ গান্, শেল্, শ্রাপ্‌নেল্, ও অন্যান্য বহু প্রকার যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ ও স্থানীয় পুলিশ কমিশনার মসিয়ে পোমের (Mons. Pomes) রচিত মৃত্তিকা নির্ম্মিত যুদ্ধক্ষেত্রের অপূর্ব্ব পরিখাদির আদর্শ, রাজপুতানার বহু পুরাতন ঐতিহাসিক স্মরণ-চিহ্ন প্রভৃতিও এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছিল। উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক্, বল্ নাচ, বায়স্কোপ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না।

এই প্রদর্শনী খুলিয়া অর্থ-সংগ্রহের প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মসিয়ে দেলরিয়ে (M. Delrieu)। ইহার সাফল্যের জন্য স্থানীয় ভদ্রলোক, বিশিষ্ট প্রবাসী কর্ম্মচারী ও গোন্দলপাড়া জুট মিলের ডিরেক্টর প্রভৃতি কুড়িজনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাহার সভাপতি ছিলেন ম্যার, সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, এবং শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হইয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন কলিকাতার ফরাসী কঁসুল মসিয়ে শার্ল্ বারে (Mons. Charles Barret)। ফরাসী ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর মসিয়ে মার্টিনো (Mons. Martineau) ও তদানীন্তন বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিমন্ত্রিত হইয়া এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন।

বিবিধ স্বদেশজাত দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত, পুষ্পপল্লবপতাকা ও বিজলী আলোকমালায় শোভিত নানা বাদ্যমুখরিত এই প্রদর্শনী বাস্তবিকই চন্দননগরে অপূর্ব্ব হইয়াছিল এবং কিঞ্চিদধিক এক পক্ষ কাল চন্দননগরে একটা সজীবতা আনিয়া দিয়াছিল। উদ্বোধনকালে মসিয়ে বারে সত্যই বলিয়াছিলেন,—যেন শত বৎসরের পর আজি অকস্মাৎ চন্দননগর নব জাগরণ লাভ করিয়াছে। ইংলিশম্যান পত্রের লেখকও ইহার বিবরণ দিবার সময় এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। *

এই প্রদর্শনী গঠনের প্রাথমিক ব্যয় প্রধানতঃ কমিটির সভ্যদিগের প্রদত্ত চাঁদা হইতেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকারে মোট টাকা পাওয়া যায় অন্যূন আট হাজার। ব্যয় বাদে মোট ফ্রাঁসে পাঠান হইয়াছিল কমবেশ চারি হাজার টাকা। এই অনুষ্ঠানে অল্প কিছু অর্থ সাহায্য অপরের প্রদত্ত চাঁদা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। গোন্দলপাড়া জুট মিল হইতেও বিবিধ প্রকারে সহায়তা লাভ হইয়াছিল।*

এই ভাবের কোন প্রদর্শনী পূর্ব্বে এখানে কখনও হয় নাই। পূর্ব্বে এখানে কুঠির মাঠে ফ্যান্সি ফেয়ার নামক বিবিদের সখের বাজার হইত। স্থানীয় অনাথা ও দীনগণের সাহায্যার্থ ইয়োরোপীয় মহিলাগণ কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারা তাঁহাদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য ইহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করা হইত। ব্যারাকপুর হইতে পল্টনের ব্যাণ্ড আসিত, সাহেব বিবিদের নাচ হইত, বালকগণের বিবিধ ক্রীড়ার আয়োজন হইত।† ৩৪।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও সমারোহের সহিত এই সখের বাজার বসিত বলিয়া আমার মনে পড়ে।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মিত্রবাগান নামক পল্লীতে ৺ক্ষেত্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে ৪।৫ বৎসরের জন্য গুপ্ত বৃন্দাবন নামে একটি উৎসব হইয়াছিল। ইহা তখনকার কালে এখানে একটি ধর্ম্মভাবযুক্ত অভিনব উৎসব হইয়াছিল। ইহাতে বহু পরিমাণে চাউলের গুঁড়া রং করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত করা হইত। এই উপলক্ষে বহু সংখ্যক হরি সংকীর্ত্তনের দল নাম গান করিবার জন্য সমবেত হইতেন। শুনা যায়, এই গুপ্ত বৃন্দাবনের উৎসব অবলম্বন করিয়াই গোস্বামীঘাটের মেলা প্রথম সৃষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন চন্দননগরে ফ্রাঙ্কো প্রুশীয় যুদ্ধের পর, বিগত যুদ্ধের সন্ধির পর, প্রজাতন্ত্রের শতবার্ষিক উৎসবে, সরকার কর্ত্তৃক যথেষ্ট ধুমধাম হইয়াছে। ফ্যাস্তার ন্যায় আজকাল প্রতি বৎসর সন্ধির বাৎসরিক উৎসব হইতেছে। রোম্যান ক্যাথলিকদের ও মুসলমানদের কোন কোন পর্ব্বেও সামান্য ভাবে উৎসবাদি হইতে দেখা যায়।

* The Englishman 1st Jan. 1916.

* ১৩২৯ সালের ফাল্গুনে "চন্দননগর ও শিল্প-প্রদর্শনী" শীর্ষক উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রদর্শনীর বিষয় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

† "প্রজাবন্ধু" ২৫শে মাঘ ও ৯ই ফাল্গুন ১২৮৯ সাল।

বেদান্তে বৈদিক দেবতা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল্

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচারবান্ হিন্দুদের মধ্যে এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যে, সত্যসত্যই গঙ্গা কি এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন, না, তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন? কয়েক-জন পণ্ডিতে মিলিয়া হঠাৎ শাস্ত্রের এক বচন আবিষ্কার করিলেন যে,—

"কলের্দ্দশ সহস্রানি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা॥"

অর্থাৎ কলিযুগের দশহাজার বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণু ভূতলে থাকিবেন। জাহ্নবী তার অর্দ্ধেক এবং গ্রাম্যদেবতা তারও অর্দ্ধেককাল থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তার পর তাঁরা অন্তর্হিতা হইবেন।

তখন হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, জাহ্নবীর যাওয়ার সময় হইয়াছে, এবং গ্রাম্য দেবতারা বহু পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই আবিষ্কার হওয়া মাত্রেই সমাজে মহা আলোড়ন উপস্থিত হইল। তাহা হইলে গঙ্গাস্নানে আর ফল কি? আর গ্রামের বিবিধ দেবদেবীরা কিসের জোরে পূজা খাইতেছেন? তাঁহারা! যে কেহই নাই!

ধর্ম্মজগতে অরাজকতার আশঙ্কা করিয়া সুধিবর্গ আবার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া বরাহপুরাণের আর একটী বচন আবিষ্কৃত করিলেন এই যে,—

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যস্তি মে কলৌ।
তদৈব বিষ্ণুস্ত্যজতি পৃথিবীং নরপুঙ্গব॥"

অর্থাৎ কলির অস্তিমেই গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করিবেন এবং বিষ্ণুও সেই সময়ই যাইবেন। এখনও সে অস্তিমকাল আসে নাই। অতএব এখনও গঙ্গায় স্নান করিলে এবং বিষ্ণুর পূজা করিলে পুণ্যের সম্ভাবনা আছে।

ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিলেন—এবং সেই ব্যবস্থা প্রতি বৎসর পঞ্জিকার পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইতে লাগিল—যে, বিভিন্ন বচনের একবাক্যতা সম্ভব হইলে, বাক্যভেদ কল্পনা করিবে না; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় বচনের মধ্যে শেষোক্তটীই গ্রহণ করিবে।

এই ক্ষেত্রে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের একবাক্যতার ধারণাটা প্রশংসনীয় কি না, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা ঠিক, যে, আচারবান্ হিন্দু বিষ্ণু, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণের তিরোভাবে বিশ্বাস করিতে চায় না। বৈদিক দেবতাগণ যে হিন্দুর জীবনে, তাহার চিন্তায় এবং ধর্ম্মে, এখনও লোপ পান নাই, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে। কিন্তু এই আন্দোলন হইতেও বুঝা যায় যে, দেবতাতে বিশ্বাস বজায় রাখিবার জন্য আন্বীক্ষিকীর নিয়ম লঙ্ঘন করিতেও হিন্দু সব সময় কুণ্ঠিত হয় না।

প্রত্যক্ষ-উপাসনা এখনও হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এখনও গৃহে, মন্দিরে, তীর্থে হিন্দু মৃন্ময়, হিরণ্ময়, পাষাণ-ময়, কিংবা দারুময় বিবিধ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এবং এখন বোধ হয় হিন্দুই জগতের একমাত্র সভ্যজাতি, যে, আজও মূর্ত্তির পূজা ত্যাগ করে নাই। সুতরাং দেবগণ এখনও মর্ত্ত্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর, তাঁহাদের যাওয়ারও যে ঢের দেরী আছে, তাহাও পণ্ডিতমণ্ডলী বিরুদ্ধ বচন-সমূহের একবাক্যতা দ্বারা প্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অবশ্যই, এক বিষ্ণু ছাড়া বৈদিক দেবতাদের মধ্যে আজকাল আর কেহ বড় পূজা পান কি না সন্দেহ। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সময় বোধ হয় বরুণের পূজা হইয়া থাকে; তা'ছাড়া, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বিশ্ব-দেবগণ, মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বিস্মৃতপ্রায়; এবং কেহ কেহ—যেমন অগ্নি—কালে-ভদ্রে এক-আধটু পূজা পাইয়া থাকেন মাত্র। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যপীর, শনৈশ্চর, মনসা প্রভৃতি অনেক অবৈদিক, এমন কি, অনার্য্য দেবদেবী বৈদিক দেবগণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে উপাসিত দেবগণ ঠিক বৈদিক দেবতা না হইলেও, এটা ঠিক যে, বহু-দেবতায় বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। এখন যাঁহারা উপাসিত হইতেছেন, সে সব দেবগণের কেহ বা খাঁটী বৈদিক; কেহ বা বেদের সময়ে অমূর্ত্ত কিংবা অস্ফুট-মূর্ত্তি ছিলেন, বর্ত্তমানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন; আর কেহ বা, একেবারে বেদের বাহিরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর জগৎ যে দেবগণশূন্য নহে, এটা ঠিক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের জগৎপ্রপঞ্চে চেতন এবং জ্ঞানবান্ জীবসমূহের মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষ। মানুষের উপরে, দেহ-বান্ কিংবা বিদেহ, অন্য কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিদ্ বিদিত নহেন, এবং বিশ্বাসও করেন না। কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস—মানুষের উপরে এবং হয় ত বা মানুষের চেয়ে অনেক রকমে শ্রেষ্ঠ, অশরীরী কিংবা সূক্ষ্ম-শরীরবান্ আরও চেতন সত্তা বর্ত্তমান আছে। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতি যে শুধু লৌকিক উপকথার জীব, তা নয়; শিষ্ট সাহিত্যে—উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি রাজ-ধানীতে উৎপন্ন, শিক্ষিত সমাজের উপভোগ্য, কালিদাস প্রভৃতির রচনায়ও—এই সব জীবের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। আর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, প্রভৃতির চেয়েও বড় বিবিধ দেবদেবীরাও বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছেন।

স্বর্গীয় দূত কিংবা angel প্রভৃতিতে বিশ্বাস ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মেও রহিয়াছে। গেব্রিয়েল, মাইকেল প্রভৃতি স্বর্গের দূতেরা ধর্ম্মে এবং কাব্যে—জ্ঞানে এবং কার্য্যে—পাশ্চাত্য জগতে অনেকবার দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে-সব দেশের বিজ্ঞান ও দর্শনের রশ্মিপাত সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি কায়-হীন কিংবা অভিকায় বহুবিধ জীবই এখন অন্তর্হিত হইয়াছেন; এমন কি স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ভগবানের সিংহাসনও কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ভগবান্‌কে কোনও রূপে মানিতে রাজী হইলেও গ্রীকদের কিংবা হিন্দুদের মত বিশ্বময় দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস পাশ্চাত্য জগৎ আর করিতে রাজী নয়, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। গ্রীকদের এথিনি, জিউস্ প্রভৃতি দেবদেবীরা শুধু যে পৃথিবীর এপারে ওপারে যাওয়া-আসা করিতেন, তা নয়; প্রায়ই তাঁরা মানুষদের সঙ্গে মিশিতেন—এমন কি, কখন কখন বা বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করিতেন; এবং সর্ব্বদাই তাঁরা মানুষের প্রদত্ত পূজা এবং সম্মান আকাঙ্ক্ষা করিতেন—এবং সেই জন্যই মানুষের ভাগ্যের উপর আধিপত্য করিতেও সচেষ্ট থাকিতেন। হিন্দুর দেবতারাও বেদের সময় হইতে ঠিক এমনই ভাবে মানুষের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু গ্রীস খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে; গ্রীসে আর এখন মন্দিরে মন্দিরে এথিনি কিংবা এপোলোর পূজা হয় না। ভারতই

শুধু আজও দেবতাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে;—ভারতেই শুধু এখনও দেবতার পূজা ও আরতি হইয়া আসিতেছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ইয়োরোপে, গ্রীসের এবং রোমের দেবগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; আর, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ভিতর যে স্বর্গীয় দূত প্রভৃতি,—ঈশ্বরের চেয়ে ছোট অথচ মানুষের চেয়ে বড়,—জীব ছিল, তাহাদিগকে পরিপূর্ণ রূপে নির্ব্বাসিত করিয়াছে সে দেশের দর্শন এবং বিজ্ঞান। Swedenborg প্রভৃতি দু'এক জন সৃষ্টিছাড়া, দলছাড়া লোকের কথা বাদ দিলে, পাশ্চাত্য দেশের লোকদের মতে এখন এই বিশাল জগৎ একটা জড়ের সমষ্টি; অথবা একটা মানস-সৃষ্টি; এবং ইহার পিছনে ঈশ্বরের চৈতন্য অথবা অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি রহিয়াছে; আর, এই প্রাকৃতিক শক্তি কিংবা ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারাই এই জগৎ-প্রপঞ্চ চালিত হইতেছে। এই জগতের ভিতরে চেতন, অচেতন, মানুষ, অমানুষ, বহু প্রকার জীব এবং বহু প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু মানুষ এবং ঈশ্বর—এ উভয়ের মাঝামাঝি দেবজাতীয় আর কোনও সত্তা নাই। আকাশে যে মেঘ ডাকে, তাহার কারণ এবং কৈফিয়ৎ তাহারা জানে, কিন্তু কোন ইন্দ্র সেখানে বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুর বধ করেন না। আগুণ যে দহন-শক্তি-সম্পন্ন, সে কথা তারা জানে; এবং কেন যে আগুণ পোড়ায়, তাহার রাসায়নিক কারণও তাহারা অবগত আছে; কিন্তু দেবতা ইহার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের পূজার দাবী করিতে পারেন, ইহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুর বিশ্বাসের বাহিরে, দেবতা আর নাই। হিন্দুর বিশ্বাসে কিন্তু তিনি এক রকম মৌরসী কায়মী পাট্টা লইয়া বসিয়াছেন; ভবিষ্য-পুরাণের মতে দেবতাদের যাওয়ার সময় হইয়া থাকিলেও, বায়ু-পুরাণের মতে আবার সেটা স্থগিত হইয়া যায়; এবং বরাহ-পুরাণের মতের সহিত একার্থতা রক্ষা করিতে হয় বলিয়া, তাঁহাদিগকে আমরা কিছুতেই যাইতে দিতে পারি না।

হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু একেশ্বরবাদী নহে, সে বহু দেবতায় বিশ্বাস করে,—ইত্যাদি প্রকার অভিযোগ ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টান মিশনরীরা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বাক্‌যুদ্ধে মিশনরীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে হিন্দুও একেশ্বরবাদীই বটে; এবং বহু দেবতা শুধু সাধারণ লোকদের জন্য; ও বিশ্বাসটা ঠিক ধর্ম্ম নয়, ওটা একটা কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নয় এবং ক্রমশঃ শিক্ষার আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কুসংস্কার দূর হইবে, সে আশাও তাঁরা করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষার আলোক বিস্তারের চেষ্টা—এবং উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহা এখনও বর্ত্তমান ছাড়াইয়া ঐতিহ্যে পরিণত হয় নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

একেশ্বর-বাদ এবং বহু-দেবতার উপাসনা, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন এখন উত্থাপন করাই অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় মনে করিয়াও বহু দেবতায় বিশ্বাস করা যায় কি না; এবং উপনিষদের ঋষিরা তা করিতেন কি না? এটা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে অবশ্যই পারি যে, বেদান্তে ব্রহ্মবাদ প্রচারের ফলে, বৈদিক দেবতাদের গতি কি হইয়াছিল? ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের পর হইতেই আস্তে আস্তে রোমীয় এবং গ্রীসীয় দেবতারা সব নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এটা আমরা জানি; ভারতে যে বেদান্ত, ন্যায়, এমন কি বৌদ্ধ ও লোকায়ত মত প্রচারের ফলেও দেব-মন্দির সব ধ্বংস হইয়া যায় নাই, তাহাও ঠিক। কিন্তু বেদান্তে বৈদিক দেবতাদের গতি কি হইয়াছিল? বেদান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কি? বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রভৃতির সহিত বেদের বহু-দেবতা-বাদের স্বভাবতঃই একটা বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। এবং যাঁরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদের উপর একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁরা উপনিষদকে এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং উপনিষদে বৈদিক দেবতাদের সমাধি হইয়া গিয়াছে—ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অনেক সময় উপনিষদের ব্রহ্মবাদে

বৈদিক বহু দেবতার একীকরণ এবং তাঁহাদের পৃথক্ সত্তার বিলোপ দেখিয়া থাকেন; এবং এই মায়ামূলক জগতে মানুষের যতটুকু বাস্তবতা আছে, ততটুকু বাস্তবতাও বেদের দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণের আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন।

সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য ডয়সেন্ (Deussen) অবশ্যই খাঁটী কথাটা ধরিয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, Xenophanes যেমন গ্রীক দেবতাতে আস্থাহীন হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই, উপনিষদের ঋষিরাও তেমনই বৈদিক দেবতাতে ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া ফেলিলেও, তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মমূলক বিরাট জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে দেবতাদের স্থান ঠিক কোথায়, সে বিচার ডয়সেনও করেন নাই। আবার, ডয়সেন্ যতটুকুতে দৃষ্টি দিয়াছেন, অনেকে ততটুকুও দেখেন নাই; এবং উপনিষদের ঋষিরা যে দেবতাদিগকে একেবারে বাতিল ও নামঞ্জুর না করিয়া বরং জগতের প্রপঞ্চের কোনও এক স্থানে তাঁহাদিগেরও থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধেও যে তাঁরা চিন্তা করিয়াছেন, এ কথাটাই অনেকে মানেন না, কিংবা জানেন না।

ডেয়খানা প্রধান উপনিষদের অনুবাদ করিতে গিয়া Hume (১) বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে উপনিষদে বৈদিক দেবগণে বিশ্বাস করিবার আর কোনও প্রয়োজন রহিল না। অর্থাৎ উপনিষদে সে বিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা যায় নাই। এত সব দর্শনের প্রচার সত্ত্বেও যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ হইতে দেবতার পূজা লোপ পায় নাই, তেমনি ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের ফলে উপনিষদেও দেবতার প্রতি বিশ্বাস একেবারে লোপ পাইয়া যায় নাই। ব্রহ্মের আবির্ভাবের পরেও ঋষিদের চিত্তে দেবগণ রহিয়া গেলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের মুক্তির জন্য যেমন ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, তেমনি এই দেবতাদের সম্বন্ধেও ঋষিরা কথঞ্চিৎ মাথা ঘামাইয়াছেন।

বেদে যেমন অগ্নি বরুণ প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করা হইত, উপনিষদেও সেটা একেবারে লোপ পায় নাই। যথা:—

(ক) ঈশা—'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্' প্রভৃতি দ্বারা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) তৈত্তিরীয় উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে বেদের অনেক দেবতাকেই দেখিতে পাই:—

"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা॥ শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥" ইত্যাদি।

বেদে যেমন দেবতাদের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান চলিত, উপনিষদে তাহাও রহিয়াছে, যেমন নচিকেতা ও যমের সংবাদ। আর একটা সাধারণ সত্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মোটেই লোপ পায় নাই। বরং অনেক সময় সেই সব যাগযজ্ঞের উপলক্ষ্যেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা হইত;—জনকের যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই যাজ্ঞবল্ক্যের দীর্ঘ বিচার হইয়াছিল (বৃহদ্ ৩য় অঃ)। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে বৈদিক দেবতারা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হন নাই; তাঁহারা পূজাও পাইতেন এবং প্রার্থনাও শুনিতে পারিতেন।

কিন্তু উপরে আর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বীজ এবং সকলের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁহাদের পদবী কিছু খাটো হইয়া গেল। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও একেবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর তাঁরা রহিলেন না। শুধু উপাসিতব্য এবং শুধু প্রার্থয়িতব্য আর তাঁরা থাকিতে পারিলেন না। জাগতিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাঁহারাও আলোচ্য এবং বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়িলেন।

প্রশ্ন-উপনিষদে (২য় প্রঃ) ভার্গব বৈদর্ভি প্রশ্ন করিতেছেন: "ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি।" সকলের চেয়ে একজন বরিষ্ঠ দেবতার অনুসন্ধান চলিতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেবতারাও যে যার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন। সূর্য্য, পর্জ্জন্য, বায়ু, পৃথিবী কেহই যান নাই; তবে সকলেই একজন বরিষ্ঠের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন; এবং কাজেই এখন কাহার কি কাজ, তাহা বিচারের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

(১) Thirteen Principal Upanishads: Hume. P. 52.

বৃহদারণ্যকেও জনকের সভায় সমাগত কর্ম্মবিদ্ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্য ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য একাধিক গণনাপদ্ধতির আভাস দিতেছেন। এক প্রকার গণনায় দেবতাদের সংখ্যা তিন শত তিন, প্রকারান্তরে তিন হাজার তিন; আবার তেত্রিশ, কিংবা ছয়, কিংবা অর্দ্ধ কিংবা একও তাহাদের সংখ্যা দেখানো যাইতে পারে। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি—এই প্রধান কয়জনকে ধরিলে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ হয়। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য এবং দ্যৌঃ—এই গণনায় তাঁহাদের সংখ্যা হয় ছয়। সর্ব্ব দেবতাই তিন লোকে বিভক্ত হইয়া আছেন; লোক-গণনায় তাঁদের সংখ্যা হয় তিন। আর সকলের প্রধান, সকলের আশ্রয়, সকলের অধিপতি 'প্রাণ' বা ব্রহ্মকে ধরিলে দেবতারা প্রকৃতপক্ষে এক বই দুই ন'ন। সেই ব্রহ্মকে 'ত্ব' বা তিনি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর হইতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্ম আসিয়া সকল দেবতাকেই গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন বটে, কিন্তু একেবারে হজম করিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নাম ও রূপের বৈচিত্র্য মধ্যে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান; কিন্তু দেবতাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপও একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।৫) দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মবিদের পক্ষেও দেবতারা একেবারে অস্তিত্বহীন হইয়া যান নাই; বরং তাঁরা তখনও বলি আবহন করিয়া থাকেন।—"স বেদ ব্রহ্ম। খর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমা বহন্তি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেবতার উপাসনা এবং দেবতায় বিশ্বাস উপনিষদে লোপ পায় নাই। কিন্তু তাঁদের অনাদিত্ব লোপ পাইয়াছে। তাঁরাও সৃষ্ট জীব। সমস্ত বিশ্ব যেমন এক ব্রহ্মের বিভূতি প্রকাশ করিতেছে, সেই বিশ্বেরই অংশ হিসাবে দেবতারাও তেমনই ব্রহ্মের মহিমা দ্যোতনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁদের অস্তিত্বের জন্য মানুষাদি হীনতর জীবের মত ব্রহ্মের নিকটই ঋণী। তাঁরা হয়ত পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, যেহেতু তাঁরা নরের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ ভোগ করিতেন, সুতরাং তাঁরা সকলেই স্বয়ম্ভু এবং স্বয়ং প্রভু। কিন্তু কেন-উপনিষদে দেখিতে পাই যে, 'ব্রহ্মণো জয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষতাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।' কিন্তু ব্রহ্ম তাঁদের নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, দেবগণের দেবত্ব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; তাঁহার আদেশেই বিদ্যুৎ ঝলকে।

মুণ্ডকও বলিতেছেন যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে দেবগণও ব্রহ্ম হইতেই প্রসূত হইয়াছেন।—"তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ।" (২।১।৭)

বৃহদারণ্যক (২।১।২০) বলিতেছেন যে, যেমন ঊর্ণনাভ তন্তু দ্বারা চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করে, যেমন অগ্নি হইতে চারিদিকে বিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি "এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" সমস্ত ভূতগণের সহিত দেবগণও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ঈঁহারাও সকলেই ব্রহ্মের সৃষ্টি। ঐতরেয় উপনিষৎও বলিতেছেন—"স ঈক্ষত ইমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি"। তবে, অন্য সৃষ্টি হইতে দেবতা সৃষ্টিকে পৃথক্ করিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে, উহা ব্রহ্মের অতি-সৃষ্টি—"সৈষা ব্রহ্মণোঽতি সৃষ্টিঃ" (বৃহদ্, ১।৪।৬)।

প্রজাপতির দুই সন্ততি—দেব এবং অসুর। "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।" (বৃহদ্ ১।৩।১ ; ছান্দো ১।২)। ইহা হইতেও দেবতাদের সৃষ্টত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-উপনিষৎ (১।৪) বলেনঃ "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে।" এই মিথুন আর কিছু নয়—আদিত্য এবং চন্দ্রমা।

দেবগণ যে শুধু ব্রহ্ম হইতে প্রসূত—ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা নহে। ব্রহ্মই তাঁহাদিগকে শাসনও করিয়া থাকেন। যথা কঠে—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। ভয়াদস্য অগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ।" (৬।৩)

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ও (২।৮) বলিতেছেন :—

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ॥
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ব্রহ্মের ভয়েই যে সূর্য্য তাপ দেন, অগ্নি উত্তাপ দেন, বায়ু প্রবাহিত হন এবং ইন্দ্র প্রভৃতিও স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাই উপনিষদের বিশ্বাস্। বৃহদারণ্যক এই কথাটাই আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন (৩।৮)—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমাসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ—ইত্যাদি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদে বেদের দেবগণ সৃষ্ট জীব হইয়া পড়িয়াছেন; এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাদের ভিতরেও মানুষের ন্যায় বর্ণভেদ আছে;—সেখানেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তফাৎ রহিয়াছে। যথা, বৃহদারণ্যক (১।৪।১১) ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশানকে দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ('দেবত্রা ক্ষত্রাণি') বলিয়াছেন; আর, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ এবং মরুদ্‌গণকে বৈশ্য-দেবতা বলা হইয়াছে এবং পুষন্‌কে শূদ্রবর্ণ বলা হইয়াছে।

দেবগণ মানুষের মত সৃষ্ট; লোকভেদে এবং বর্ণভেদে বিভক্ত; এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের শাসনের অধীন। কিন্তু মানুষের উপরের স্তরের জীব এঁরা; সুতরাং মানুষের উপর আধিপত্য ইহাদের যায় নাই। মানুষের বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ দেবতাদের অধিষ্ঠাতৃত্বেই হইয়া থাকে। ঐতরেয় উপনিষৎ (১।২) বলেন যে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়া মহৎ অর্ণবে পতিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁরা আত্মাকে কহিলেন, "আমাদের একটা দাঁড়াবার স্থান (আয়তন) করিয়া দিন্, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি।" তখন আত্মা তাঁহাদের কাছে ক্রমে, গো ও অশ্ব প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিলেন; কিন্তু তাঁরা বলিলেন 'ন বৈ নোঽয়ম্ অলমিতি'—এতে আমাদের কিছুই হইবে না।" তখন আত্মা মানুষকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া বলিলেন 'বেশ হইয়াছে—সুকৃতং বত"। আত্মা কহিলেন, "তোমরা যে যার আয়তনে প্রবেশ কর। তখন অগ্নি বাক্য হইয়া মানুষের মুখে প্রবেশ করিলেন; বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন; আদিত্য দৃক্‌শক্তি হইয়া চক্ষে, দিক্ সমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণে, ওষধি-বনস্পতিরা লোম হইয়া ত্বকে, এবং চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের উপর দেবতাদের আধিপত্যটা রহিয়াই গেল; মানুষ তাঁহাদের ভোগ্য হইয়াই রহিল।

কিন্তু এই এক বিষয়ে দেবতারা মানুষের চেয়ে বড় হইলেও, সব বিষয়ে নন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তাঁরাও মানুষের মত সৃষ্ট, এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের অধীন এবং মানুষেরই মত ব্রহ্মের ভয়ে ভীত। ইহা ছাড়া আরও একটী গুরুতর বিষয়েও তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ন'ন। তাঁরাও অমুক্ত, তাঁরাও বিগ্রহবান্, এবং তাঁদেরও মুক্তির প্রয়োজন আছে। তাঁদেরও দেহেন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, তাঁদেরও ভোগ হয়, তাঁদেরও স্থানভেদ, স্বভাবভেদ এবং কার্য্য-ভেদ রহিয়াছে; এবং এই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া তাঁদেরও মানুষেরই মত প্রয়োজনীয়।

জৈমিনি আচার্য্য বলিয়াছেন, 'ন দেবানাং দেবাস্তরাভাবাৎ';—উপাস্য অন্য দেবতা আর নাই বলিয়া দেবতাদের কর্ম্মে অধিকার নাই। অধিকার বলিতে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব এই দুইটী জিনিস বুঝায়। কর্ম্মের সামর্থ্য দেবতাদের আছে বটে, কিন্তু কোন প্রয়োজন—কোন অর্থিত্ব—তাঁদের নাই; সুতরাং কর্ম্মের বিধি তাঁদের বেলা খাটে না। কিন্তু জ্ঞানের বেলা এ কথা প্রযোজ্য নহে,—ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত। বেদান্তজ্ঞানের অধিকার—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য এবং অর্থিত্ব—শুধু মানুষেরই আছে এমন নয়। মানুষের মধ্যে সকলের, যথা শূদ্রের (বেদান্ত সূত্র ১।৩।৩৪), অবশ্যই উপনয়নে অধিকার নাই; সুতরাং বেদে ও বেদান্তেও অধিকার নাই। তথাপি মানুষের বেদান্তে অধিকার অবশ্যই আছে; কিন্তু শুধু মানুষেরই আছে, এমন নয়।

'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ'—(বেদান্ত সূত্র ১।৩।২৬); মানুষের উপরিস্থ জীব দেবতাদেরও বেদান্ত জ্ঞানে অধিকার—অর্থিত্ব এবং সামর্থ্য—রহিয়াছে।

কর্ম্ম দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা তাঁরা পাইয়াছেন, সুতরাং কর্ম্মের প্রয়োজন তাঁদের নাই। কিন্তু জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য মোক্ষ তাঁরা লাভ করেন নাই; সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন তাঁদেরও রহিয়াছে।

শুধু যে অধিকার তাঁদের আছে, এমন নয়। দেখা যায়,

মাঝে মাঝে তাঁরা সে অধিকারের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৮।১১।৩) বলেন যে, 'একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস'—অর্থাৎ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ; কেন না, এখনও আকাশে মেঘ ডাকে। তবে, তাঁহার যে মুক্তির প্রয়োজন আছে এবং সে বিষয়ে যে তাঁহার ইচ্ছার অভাব নাই, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কিন্তু এই অর্থিত্ব ও সামর্থ্য দেবতাদের আছে কি না—তাঁদেরও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই মুক্তিলাভ করিতে হইবে কি না—সে বিষয়ে স্পষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাদরায়ণ একাধিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁদেরও সে প্রয়োজনটা রহিয়াছে। আর, সূত্রকারের অর্থ যেখানে স্পষ্ট, সেখানে টীকাকারদের মতভেদ হওয়া কঠিন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শঙ্কর, রামানুজ এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, দেবতারাও দেহী, তাঁদেরও ভোগ হয়; তবে, তাঁরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্তরের দেহী; এবং সেই জন্য একই সময়ে যুগপৎ একাধিক স্থানে তাঁরা পূজা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তথাপি মুক্তির প্রয়োজন তাঁদেরও রহিয়াছে।

বাদরায়ণ নিজেই বলিতেছেন যে, জৈমিনি আচার্য্য এই মত গ্রহণ করিতে নারাজ। (বেদান্তসূত্র ১।৩।৩১-৩২) কিন্তু বাদরায়ণ যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বেদান্তে দেবগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে তুমুল চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর সে সব যুক্তির বিশ্লেষণ এখানে করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, বেদান্তে দেবগণের পদাবনতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁরা মোটেই লোপ পান নাই। পরাভূত পরাধীন জাতির মত তারা ব্রহ্মের প্রশাসনে রহিয়াছেন; কিন্তু তথাপি রহিয়াছেন; এবং যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্ত না হইবেন, বাদরায়ণের মতে অন্ততঃ—সেই পর্য্যন্ত তাঁরা থাকিবেনই। আর, যাদের মতে মুক্তির কোন প্রয়োজন তাঁদের নাই, তাঁদের মতেও তাঁরা অবশ্যই থাকিবেন। সুতরাং দেবতারা মুক্তই হউন, আর অমুক্তই হউন, বেদে যেমন বেদান্তেও তেমনি তাঁরা বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের সঙ্গে বহু দেবতায় বিশ্বাস যে একেবারে করা যায় না, তা নয়। উপনিষদ্ অবশ্যই দেবতাদিগকে একেবারে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; সেটা তাহার অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বিশেষতঃ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেচ পশ্যতি।" কিন্তু ব্রহ্মের একত্ব এবং অদ্বিতীয়তা সত্ত্বেও যেমন ব্যবহারিক জগতে বহুর প্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে, তেমনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময় হইলেও এই বিশ্বেরই মাঝে তির্য্যগাদি বিভিন্ন যোনির জীবের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের অস্তিত্বও সম্ভব হইয়াছে।

অতি বড় অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও ত্রিপুরাসুন্দরী গঙ্গা প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যেমন পিতামাতা, গুরুশিষ্য, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতির ভেদ ব্যবহারিক জীবনে শঙ্করও স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ দেবদেবীর ভেদও স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। অবশ্যই তাঁর মতে অন্তিমে যুষ্মদ্ অস্মদ প্রত্যয়মূলক সকল ভেদই যেমন অধ্যাস মাত্র, তেমনই বিভিন্ন দেবগণের নানাত্বও একটা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এ জগৎ প্রপঞ্চ যতটুকু সত্য, দেবগণ তার চেয়ে কম সত্য নহেন। বরং এই জগৎ-প্রপঞ্চ বলিতে আমরা যা বুঝি, তারই ঊর্দ্ধদেশে এই দেবগণের নিবাস।

সুতরাং কেহ যদি বলেন, বেদান্তে বৈদিক দেবতারা সব তিরোহিত হইয়াছেন—সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারের মত, ব্রহ্মের আবির্ভাবে তাঁরা সব যে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছেন, তার কোন ঠিকঠিকানা নাই—তাহা হইলে, তিনি যে ভুল বলিবেন, আশা করি, অতঃপর ইহা স্বীকৃত হইবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীঅমিয়া বসু

পৃথিবী প্রায় গোলাকার, ইহা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষিগণ জানিতেন। অনেক উপায়েই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) একখানি জাহাজের প্রথমে তলদেশ, পরে সমস্ত অংশ, এবং তৎপরে উহার মাস্তুল কিরূপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী দর্শকের নয়নপথ হইতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

(২) গ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে, তাহা সর্ব্বদাই গোলাকার দেখা যায়।

(৩) যদি প্রথমে উত্তরে এবং তৎপরে দক্ষিণে সমান দূরে যাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের ধ্রুবপোত বৃত্তীয় উচ্চতা (Meridian altitude) সমান ভাবে কম-বেশী হইয়া থাকে; পৃথিবী গোলাকার না হইলে এরূপ হইত না।

আমরা জানি, দুইটী সমান্তরাল সরল রেখা অনন্তে গিয়া মিলিত হয়। খগোলিক মেরুবিন্দু পৃথিবী অপেক্ষা এত দূরে অবস্থিত যে, সে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর উপরিভাগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব অতি সামান্য। সুতরাং যদি কোন দর্শক পৃথিবীর উপরে একস্থানে দণ্ডায়মান হয়, এবং তৎপরে সেই স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য স্থান গ্রহণ করে, এবং ওই উভয় স্থান হইতেই মেরুবিন্দু অভিমুখে দুইটী সরল রেখা অঙ্কিত করা হয়, তবে ওই রেখা দর্শকের নয়নে সমান্তরাল সরল রেখা বলিয়া প্রতীত হইবে। এইরূপ পৃথিবীর যে কোন বিভিন্ন স্থান হইতে যদি বহুবিধ রেখা মেরু অভিমুখে অঙ্কিত করা যায়, তবে, সে সকল রেখা সমান্তরাল সরল রেখা হইবে।

পৃথিবীর যে কেন্দ্র-রেখা খগোলিক মেরুবিন্দুর দিকে সর্ব্বদাই ফিরিয়া থাকে, তাহাকে পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলে। এই মেরুদণ্ড পৃথিবীকে দুই প্রান্তে ভেদ করে; সে দুই প্রান্তকে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বলা হয়। যে বৃহৎ বৃত্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া ও পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উপর লম্বভাবে অঙ্কিত করা হয়, তাহাকে পৃথিবীর নাড়ীমণ্ডল কিম্বা ভৌগোলিক বিষুব রেখা বলা হয়। পৃথিবীর উভয় মেরু মধ্য দিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, তাহাকে ভৌগোলিক ধ্রুবপোত বৃত্ত বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীর উপরিস্থ প্রতি স্থানেরই ধ্রুবপোত বৃত্ত আছে, এরূপ কল্পনা করা যায়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে গ্রীণউইচের ধ্রুবপোত বৃত্তকে প্রাথমিক ধ্রুবপোত বৃত্ত অথবা প্রাথমিক দ্রাঘিমা বলা হয়। কোন স্থানের ধ্রুবপোত বৃত্তের উপর যে কৌণিক দূরত্ব বিষুব রেখার উত্তর কিম্বা দক্ষিণে মাপ হয়, তাহাকে ঐ স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশ বলা হয়। তদ্ভিন্ন প্রাথমিক দ্রাঘিমা কিম্বা ধ্রুবপোত বৃত্তের পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমে, প্রাথমিক ধ্রুবপোত বৃত্ত ও ঐ বিশিষ্ট স্থানের ধ্রুবপোত বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী ভৌগোলিক বিষুব রেখাস্থ বৃত্তাংশ যে কোণ প্রদান করে, ঐ কৌণিক মাপকে ভৌগোলিক তুলাংশ বলা হইয়া থাকে। যে সকল স্থান বিষুব রেখার সহিত সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত, তাহাদের সমান অক্ষাংশ, এবং যে সকল স্থানের এক ধ্রুবপোত বৃত্ত তাহাদের সমান তুলাংশ হইয়া থাকে। অক্ষাংশ উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে ০° ডিগ্রি হইতে ৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত মাপা হয়, এবং তুলাংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ০° ডিগ্রি হইতে ১৮০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত মাপা হয়।

নভোমণ্ডলে যেরূপ কর্কটমণ্ডল ও মকরমণ্ডল নামক দুইটী ক্ষুদ্র বৃত্ত কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, ভূমণ্ডলে তদ্রূপ বিষুব রেখা হইতে ২৩° ডিগ্রি ২৮´ মিনিট দূরে দুইটী সমান্তরাল ক্ষুদ্রবৃত্ত কল্পনা করিয়া লওয়া হয়; এবং উহাদিগকেও কর্কটমণ্ডল ও মকরমণ্ডল আখ্যা দেওয়া হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর চতুর্দ্দিকে ২৩° ডিগ্রি ২৮´ মিনিট দূরে দুইটী বৃত্ত কল্পনা করা হয়, এবং উহাদিগকে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত এবং কুমেরুবৃত্ত বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ কর্কটমণ্ডল ও মকরমণ্ডলের মধ্যে থাকে, তাহাকে উষ্ণমণ্ডল বলা হয়, এতদ্ভিন্ন কর্কটমণ্ডল, মকরমণ্ডল এবং

সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানদ্বয়কে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, ও যে অংশদ্বয় সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত এবং উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে হিমমণ্ডল বলে।

পৃথিবীর ১° ডিগ্রি অক্ষাংশের দৈর্ঘ্য পরিমাণ বাহির করিতে হইলে একটী স্থান স্থির করিয়া লইতে হয়, এবং তৎপরে ঐ স্থানে মেরুবিন্দুর উচ্চতা মাপিয়া লইতে হয়। পরে আর এক স্থানে গিয়া ঐরূপ মাপ লইতে হয়, এবং এরূপ ভাবে ঐ স্থান নির্ণয় করিতে হয়, যাহাতে মেরুবিন্দুর উচ্চতা ১° ডিগ্রি কমিয়া কিম্বা বাড়িয়া যায়। এক্ষণে অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন এক স্থানের খগৌলিক মেরুবিন্দুর উচ্চতা, ঐ স্থানের অক্ষাংশের সমতুল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের মেরুবিন্দুর উচ্চতা যে ঐ ঐ স্থানের অক্ষাংশের সমতুল, তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। অঙ্কশাস্ত্রের এই প্রমাণ অনুসারে সহজেই বুঝা যায় যে, দুই স্থানের মেরু বিন্দুর উচ্চতার যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন হয়, সেই দুই স্থানের অক্ষাংশেরও সেই পরিমাণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব-বর্ণিত উপায়ে দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী মেরুবিন্দুর উচ্চতা পরিবর্ত্তন যখন ১° ডিগ্রি হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহাদের মধ্যবর্ত্তী অক্ষাংশের পরিবর্ত্তনও ১° ডিগ্রি হইয়াছে। এক্ষণে যদি এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ধ্রুবপোত বৃত্তের পরিমাপ লওয়া হয়, তবে দেখা যাইবে, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৯½ মাইল। ইহাই সাধারণতঃ ১° ডিগ্রির দৈর্ঘ্য মাপ বলিয়া ধরা হয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভাবেই পৃথিবীর নানা স্থানে ১° ডিগ্রির মাপ লওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানেই পরস্পরের মধ্যে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই। ইহা দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বেরও সম্যক প্রমাণ হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানের ১° ডিগ্রির দৈর্ঘ্য পরিমাণ, বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী স্থানের ১° ডিগ্রির দৈর্ঘ্য পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইতে দেখা যায়; ইহাতে বুঝা যায়, পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত কমলা লেবুর ন্যায় কিঞ্চিৎ চাপা। সাধারণতঃ ১° ডিগ্রির পরিমাণ ৬৯½ মাইল। ইহা হইতে গণনা করিয়া পৃথিবীর পরিধি বাহির করা যায়। যথাঃ—১°=৬৯½ মাইল; অতএব, ৩৬০° ডিগ্রি প্রায় ২৫,০০০ মাইলের সমান। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। দেখা গিয়াছে, বিষুব রেখার সমীপস্থ ব্যাস হইতে মেরুর সন্নিকটস্থ ব্যাস প্রায় ২৬ মাইল ছোট।

যদি কোন দর্শক বিষুব রেখার উত্তর কিম্বা দক্ষিণস্থ কোন স্থান হইতে, ঐ স্থানের ধ্রুবপোত বৃত্ত অবলম্বন করিয়া উত্তর কিম্বা দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিতে থাকে, এবং অবশেষে উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুতে গিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে দেখিতে পাইবে যে, খগৌলিক মেরুবিন্দু ঠিক তাহার মস্তকের উপর সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে (Zenith) বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার দিঙ্‌মণ্ডল খগৌলিক বিষুবরেখার সহিত মিশিয়া যাইবে; এবং নক্ষত্রের দৃশ্যমান আহ্নিক গতিকক্ষ দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত সমান্তরাল ক্ষুদ্র বৃত্ত রূপে দেখা যাইবে। সুতরাং এই সকল নক্ষত্র মেরুকেন্দ্রীয় হইবে। যে সকল নক্ষত্র বিষুব রেখার দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে থাকিবে, অর্থাৎ দর্শক বিষুব রেখার যে পার্শ্বে থাকিবে তাহার বিপরীত পার্শ্বে রহিবে, সে সকল নক্ষত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুতে যে দর্শক অবস্থান করিবে, নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশের অধিক তাহার নয়ন-পথে আসিবে না; কিন্তু যে অর্দ্ধাংশ দৃষ্টি-গোচর হইবে, তাহা কখনই অস্ত যাইবে না, এবং সর্ব্বদাই তাহার দৃষ্টি-পথে থাকিবে। সূর্য্য ২১শে মার্চ্চ হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত বিষুবরেখার উত্তরে থাকে বলিয়া, এই ছয় মাস উত্তর মেরুস্থ দর্শকের দিঙ্‌মণ্ডলের উপরে থাকিবে, এবং একেবারেই অস্ত যাইবে না। বৎসরের এই সময়ে দক্ষিণ মেরুস্থ দর্শক সূর্য্যকে একেবারেই দেখিতে পাইবে না। উত্তর মেরুতে এই সময়ে, সূর্য্য দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত প্রায় সমান্তরাল বৃত্ত পথে ভ্রমণ করিবে, এবং ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময়ে একটী সম্পূর্ণ বৃত্ত আবর্ত্তন করিবে। সূর্য্যের ক্রান্তির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন না হইলে, এই ভ্রমণ-পথ দিঙ্‌মণ্ডলের সহিত একেবারেই সমান্তরাল হইত। সূর্য্যের উচ্চতা ২১শে জুন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, এবং এই সময়ে ইহার পরিমাণ হয় ২৩° ডিগ্রি ২৮′ মিনিট। ইহার পর ছয় মাস সূর্য্য দিঙ্‌মণ্ডল হইতে নিম্নে অবস্থান করে; এবং ২১শে ডিসেম্বর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিম্নতা প্রাপ্ত হয়; এই সময়ে ইহার পরিমাণ ২৩° ডিগ্রি ২৮′ মিনিট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, উত্তর মেরুতে ছয় মাস একাদিক্রমে দিবা এবং ছয় মাস রাত্রি থাকে। এই ছয় মাস রাত্রিতেও অনেক সময়েই

গোধূলির আলোক থাকে। উত্তর মেরুর এই ছয় মাস ব্যাপী রাত্রি থাকা কালে দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস ব্যাপী দিবা হইবে এবং উত্তর মেরুতে যখন ছয় মাস দিবা হইবে, দক্ষিণ মেরুতে তখন ছয় মাস রাত্রি হইবে।

যদি দর্শক বিষুবরেখার উপর অবস্থান করে, তবে দেখিবে, উত্তর মেরুবিন্দু উত্তর মেরুতে এবং দক্ষিণ মেরুবিন্দু দক্ষিণ মেরুর সহিত একেবারে মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থানে খগৌলিক বিষুবরেখা মস্তকের উপর সর্ব্বোচ্চ বিন্দু (Zenith) এবং নিম্নে পাদবিন্দু (Nadir) দিয়া গমন করিবে। ইহা ছাড়া এই স্থানে বিষুবরেখা দিঙ্‌মণ্ডলকে লম্বভাবে কর্ত্তন করিবে। নক্ষত্রবর্গের পরিদৃশ্যমান দৈনিক কক্ষ খগৌলিক বিষুবরেখার সহিত সমান্তরাল বলিয়া, দিঙ্‌মণ্ডল দ্বারা লম্বভাবে ও দুই সমভাবে বিভক্ত হইবে। অতএব এই স্থানে নক্ষত্রবৃন্দ দিঙ্‌মণ্ডলের উপরে ও নীচে ঠিক সমান সময়ে সমভাবে অবস্থান করিবে। ইহা ব্যতিরেকে কোন মেরুকেন্দ্রীয় তারকা নয়নগোচর হইবে না। প্রতি নক্ষত্রই প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় দিঙ্‌মণ্ডলের উপরে অবস্থান করিবে এবং বৎসরের মধ্যে সমস্ত সময়েই দিবারাত্রি সমান হইবে।

এতক্ষণ আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে, পৃথিবী স্থির ভাবে আছে, এবং সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য উহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীই যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং তাহাতেই যে এই সকল গ্রহ নক্ষত্র গতিশীল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা কয়েকটী উপায়ে সাব্যস্ত করা যায়।

(১) সহজ ভাবে—কোপার্নিকাসের সময়ে এই সমস্যা পূরণের একটী মাত্র ব্যবস্থা ছিল; তাহা এই ঃ—

সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের পক্ষে এরূপ জটিল ভাবে অবস্থান করিয়া মেরুবিন্দু কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করা অপেক্ষা পৃথিবীরই স্বীয় দণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং সম্ভব।

(২) তুলনা দ্বারা—১৬০৯ খৃঃ অব্দে দূরবীণ আবিষ্কারের পর, দূরবীণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সূর্য্য, চন্দ্র এবং অনেক গ্রহ স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে; তাহা দ্বারা অনুমান করা হয় যে, আমাদের পৃথিবীও স্বীয় দণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে।

(৩) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা—যদি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং নক্ষত্রগণ এরূপ বৃহৎ কক্ষ এক দিনে ভ্রমণ করিত, তবে ইহারা যাহাতে স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত না হয়, সেই নিমিত্ত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন হইত। কিন্তু, কোন গ্রহ নক্ষত্রের এত অধিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকিতে পারে না। অতএব সূর্য্য এবং গ্রহগণের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গতি কল্পনা করা অলীক বলিয়া বোধ হয়।

(৪) কোন উচ্চ স্থান হইতে প্রস্তর কিম্বা কোন ভারী জিনিস নিক্ষেপ করা ঃ—নিউটন প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী যদি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ভ্রমণ করে, তবে কোন উচ্চ স্থান হইতে যদি কোন প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায় এবং ঐ স্থান হইতে একটী লম্বরেখা পৃথিবীর উপর অঙ্কিত করা যায়, তবে উহা ঐ রেখার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পতিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এই পরীক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; কারণ যত উচ্চ শিখরই হউক না কেন, পৃথিবীর কেন্দ্ররেখার তুলনায় তাহার উচ্চতা অত্যন্ত অল্প। বোলন এবং হ্যামবার্গে এই পরীক্ষাটী করা হইয়াছিল; দেখা গিয়াছে, ২৫০ ফিট্ উচ্চ হইতে কোন প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, উহা লম্বরেখার এক-তৃতীয়াংশ দূরে পতিত হয়।

তস্মিন্ তুষ্টে—

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নটবরবাবু ফিলিপ জোন্স এণ্ড কোম্পানীর আফিসের বড়বাবু। অসীম প্রতাপ, ভীষণ প্রতিপত্তি; সাহেব একেবারে তাঁহার মুঠার মধ্যে। বড়বাবু যাহা বলেন, তাহাই হয়; যাহাকে রাখেন, সেই থাকে; তিনি বিরূপ হইলে ফিলিপ জোন্স-এর অন্ন তাহার উঠিয়া যায়।

বড়বাবুর বয়স বেশী নয়, বড় জোর পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ হইবে। বেশ মোটা-সোটা দেহখানি; মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের বেশ শোভা; গোঁফ দাড়ী কামান; তাহাতে বয়সের চেয়ে তাঁহাকে কম দেখায়। বিপত্নীক হইয়া নটবরবাবু একটি যুগ শুদ্ধাচারে ও শুদ্ধান্তঃকরণে স্বর্গগতা পত্নীর ধ্যান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি বৎসর খানেক হইল, ধ্যান ভগ্ন হইয়াছে। নটবরবাবু এক বিগত-বৈভব সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী ঘরের একটি বড়-সড় কন্যার কুমারীত্ব লোপ করিয়া, অঙ্কশায়িনী করিয়াছেন। এরূপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না; নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে দ্বিতীয়বার টোপর ধারণ করিতে হইয়াছিল। আহা, সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে যে কেহই ছিল না। বার বছর বড় কষ্টেই কাটিয়াছিল।

সেদিন 'বরষা ঝর ঝর ঝরে'—বড়বাবু ছাতাটি মাথায় দিয়া, পেণ্টলুনের পা দু'টি জানুর উপরে তুলিয়া, কাদায় চপ চপ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পেয়ালা দুই গরম চা ও আনুষঙ্গিক যা'হক-কিছু গরম গলাধঃকরণ করিয়া শরীরটা তাতাইয়া লইয়া বড়বাবু বাহিরের ঘরে জুতা ও কর্দ্দমাক্ত পেণ্টলুন, কোট পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতলে উঠিলেন।

বড়বাবুর নবোঢ়া পত্নী ঘরের মধ্যে বসিয়া, একখানি মাসিক-পত্রিকার ছবি দেখিতেছিলেন, অথবা পড়িতেছিলেন ঠিক বলিতে পারি না, আড় নয়নে একবার বড়বাবুকে দেখিয়া লইয়া পত্রিকাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

শরীরটা তাতাইয়া লইবার যে উষ্ণ-প্রস্তাবটি মুখস্থ করিতে করিতে বড়বাবু দ্বিতলে উঠিয়াছিলেন, রুষ্ট-নেত্র পণ্ডিত-মহাশয়ের সম্মুখীন হইবামাত্র নিরীহ শিশু যেমন নিঃশেষ পাঠ ভুলিয়া যায়, তিনিও তদ্রূপ বিস্মৃত হইলেন। অভিজ্ঞতাটা এক বৎসরের মাত্র হইলেও, নটবরবাবু বুঝিলেন, আজ বরাতটা নিতান্তই মন্দ!

বাহিরে তখনও আকাশ হইতে বৃষ্টি ঝরিতেছিল।

নটবর স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসিলেন—ওটা কি পড়ছো গো?

তাঁহার পত্নীর নাম, বিমলপ্রভা! বিমল কথাটার মধ্যে কথঞ্চিৎ পৌরুষভাব মিশ্রিত থাকায়, নটবরবাবু প্রভা নামটিই পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও সেই নামে অভিহিত ক'রতে বাধ্য।

প্রভা বলিলেন—একখানা কাগজ! বলিয়া তিনি কাগজখানি মুড়িয়া বক্র-কটাক্ষে জিজ্ঞাসিলেন—আমার পিসতুতো ভাই সরোজ-দা পর্শু তোমার আফিসে গেছল?

নটবর বলিলেন—হ্যাঁ, গেছল।

একটা চাকরী ত খালি ছিল, তাঁকে দিলে কি তোমার মহাভারত নর্দ্দমায় পড়ে যেত?

বড়বাবুর যুক্তি ছিল বলিবার যে, আফিসে আত্মীয়-কুটুম্বকে কর্ম দিতে নাই; তাহাতে শৃঙ্খলার হানি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রুষ্ট পণ্ডিতমহাশয় ও নিরীহ ছাত্রের অবস্থাটা সেখানেও বিদ্যমান। যুক্তি ভুলিয়া, কহিলেন—আমাদের আফিসে নিয়ম আছে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না হলে লোক নেওয়া হয় না।

প্রভা জিজ্ঞাসিলেন—ম্যাট্রিকুলেসন কি? এন্‌ট্রেন্স?

বড়বাবু বলিলেন—তাই।

সরোজ দা এন্‌ট্রেন্স পাশ করে নি কে বল্লে তোমায়! সে ত এফ্-এ পর্য্যন্ত পড়েছে।

আফিসের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বড়বাবু গৃহে চোরেরও অধম। মুখ দিয়া কথা সরিল না।

প্রভা রোষগম্ভীর ও দুঃখম্লান কণ্ঠে কহিলেন—তুমি তার কাগজপত্রগুলো দেখতে সময় পাও নি বুঝি?

প্রভার অনুমানটা কিন্তু মিথ্যা নয়। তবে তাহা কবুল করাও শক্ত।

প্রভা বলিলেন—তা দেখবে কেন? তার একটি চাকরী হ'লে যে আমার বাপ-মার উপকার হয় কি না! তা কি তুমি করতে পার? আমার বাবা বুড়ো মানুষ, ঐ সামান্য রোজগার, তাতে সরোজ-দা'দের তিন ভাইকে পুষতে হয়। তারা কিছু-কিছু আনতে পারলে বাবারই কাঁধটা একটু হাল্কা হোত! তুমি আবার ততখানি করবে! এক বছরের ওপর বিয়ে হয়েছে, কখনও একটা মুখের কথায়ও তাঁদের খবর নিয়েছ? অথচ আমার বাপ-মা কত আশা করেই না দোজবরে বুড়ো বরে কন্যাদান করেছিলেন।—বলিতে বলিতে শ্রীমতী বিমল-প্রভার গলাটা ধরিয়া আসিল এবং চক্ষু-তারকার পশ্চাতে জল টল টল করিতে লাগিল।

অন্যের অদৃশ্য স্থানে সে জল-রাশি অবস্থিত থাকিলেও দোজবরে ও বুড়ো বরের চক্ষে তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িল। দোজবরে বরের মনটি ক্ষুণ্ণ ও বৃদ্ধ হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কৃত কর্মের অনুশোচনায় প্রাণ পুড়িতে লাগিল। বলিলেন, তোমার সরোজদা বুঝি শ্বশুর ম'শায়ের গলগ্রহ?

প্রভা কথা কহিলেন না। কতক্ষণে তারকার পশ্চাৎ নিহিত চোখের জলটা সামনে আসিয়া পড়ে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নটবর বলিলেন—সরোজকে কাল আফিসে যেতে বলো; কাজটি আজও খালি আছে।

প্রভা যে ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহা দোজবরে ও বৃদ্ধ বরের অজ্ঞাত রহিল না। নটবর তাই বলিলেন—আর ত কেউ কখনো আমার কাছে আসে নি, এলে কি আর সত্যিই কিছু করে' দিতে পারতুম না!

প্রভা বলিলেন—কোন্ সাহসে যাবে বল? তুমি যে আমার বাপ-মায়ের জামাই তা কোন দিন বুঝতে দিয়েছ? কখনও সে বাড়ীর পথ মাড়িয়েছে? কোন্ সাহসে, কোন্ মুখে লোক যাবে? বাবা ত প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, কত সাধের বড় জামাইটি আমার, সময়ে অসময়ে কত উপকার পাব ভেবেছিলুম; এমনি বরাত যে জামাই এক-দিন চোখের দেখাও দেখে যান্ না। মা মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছেই!

দ্বিতীয় পক্ষের জননীর অশ্রুর সংবাদে নটবর বাবু দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং প্রভার চক্ষু-তারকার পিছন হইতে যে বারিরাশি বহু সাধ্য-সাধনাতেও অগ্রগমনে বিরত ছিল, তাহাই এখন নিঃসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল। প্রভা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—আমাদের বির (বৃহৎ) গোষ্ঠি, সবাই মা'কে ঠাট্টা করে, বলে, কৈ গো জামাই যে শ্বশুরবাড়ীর নামও করে না! মা আর কি জবাব দেবেন, জবাব দেবার আছেই বা কি!

অশ্রুর বেগ প্রবল হইল; প্রভা ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

নটবর বলিলেন—পর্শু রবিবার; পর্শুই যাব। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কি জান, বড় ভুলো মানুষ, তুমি যদি একবার মনে করিয়ে দিতে···

—অমন অধর্ম্মের কথা বল না, আমি প্রথম প্রথম...

নটবর বলিলেন—আচ্ছা এই রবিবার থেকে তুমি দেখো, ফি রবিবার আর ছুটীর দিনে আমি যাই কি না! সরোজকে খবর দেবার কি হবে?

—সে কাল আসবে বলে গেছে।

—এলেই পাঠিয়ে দিও, বুঝলে?—বলিয়া নটবর পত্নীর পার্শ্বে পতিত পত্রিকাখানি তুলিয়া লইলেন।

২

শ্বশুরবাড়ীর গোষ্ঠিটা যে এত বৃহৎ আর তাহাতে এত বেকার ব্যক্তিও ছিল, নটবর সুদূর কল্পনাতেও তাহা জানিতেন না। নিয়মিত কয়েকটা রবিবারে পদার্পণ করিয়াই তাহা বুঝিলেন। প্রতি রবিবারেই, তাঁহার শ্বাশুড়ীর জল খাবারের থালার সঙ্গে সঙ্গে একখানি দুইখানি করিয়া আবেদন-পত্র তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। আবেদন-পত্রের রচয়িতারা ক্বচিৎ তাঁহার সম্মুখীন হইত; তবে তাহাদের শর-সন্ধান যে অব্যর্থ, তাহা না বলিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। শ্বশ্রূমাতার আশীর্ব্বচন ও অশ্রু তাহাদের হইয়া যে কার্য্য করিত, তাহারা বাবা-তারকনাথের মাথায় ফুল চড়াইয়াও ততটা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

ফিলিপ জোন্স এণ্ড কোম্পানীর আফিসে একটা আতঙ্কময় বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। বাবুরা দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া আফিসে আগেও ঢুকিতেন, তবে এখন সেই একবার মাত্র সে নাম স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

প্রতি ঘণ্টাতেই একবার দুইবার মা'র কাণে তাঁহাদের আকুল আহ্বান পৌছিতেছে। মা দুর্গা খুব দূরে থাকেন, ইহা জানিয়াই বোধ হয় বাবুরা উচ্চকণ্ঠেই আজকাল ডাকাডাকি করিতেছেন।

পুরাতন অনেকগুলি কর্ম্মচারীকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। মা-দুর্গা তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারেন নাই বা করেন নাই, কথা একই! বিদায়কালে বাবুরা মনে মনে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এ-কালে দশভূজা দেবী দুর্গার অপেক্ষা দুই হাত দুই পায়ের মানুষ বড় বাবু অধিক শক্তির অধিকারী। গ্রাম বা সহরের আশে-পাশের বাড়ীতে মারী মড়ক উপস্থিত হইলে, অন্য লোকের মানসিক অবস্থা যে গতি প্রাপ্ত হয়, ফিলিপ জোন্স আফিসের বাবুদেরও মনের অবস্থা সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, যে দিনটি কাটে, সেই দিনটাই ভাল, অবস্থা এইরূপ!

নটবর বাবুর শ্বশুরবাড়ীর এক ক্ষণজন্মা আদি-পুরুষ ভারতে নবাবী রাজত্বের শেষ আমলে স্বীয় বুদ্ধি ও বিশেষ কোন বিদ্যার বলে বহু জমিদারী এবং সম্মানজনক রাজা খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও এত কাল পরেও, সেই বংশের বৃদ্ধ, যুবক ও বালকগণ "কুমার" আখ্যাধারী। সুতরাং নিতান্ত নির্বুদ্ধি লোকেও ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আদি-পুরুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-লব্ধ জমিদারী অন্যের করক-বলিত এবং সমুদায় অর্থ পক্ষোদ্ভেদ হওয়ায়, অন্যত্র উড্ডীন হইয়া গেলেও তাঁহাদের আভিজাত্য-গর্ব্বের লাঘব কিছুমাত্র হয় নাই। তাঁহারা, ফিলিপ জোন্স কোম্পানীর ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষের মুখোজ্জ্বল করিয়া, কোম্পানীর অর্থ পকেটস্থ করিলেও, কেরানীর গাধা-খাটুনি খাটিতে ও ধূলা মাখিয়া ফাইল ঝাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের সার্টের কপ্‌ উজ্জ্বল থাকিতে থাকিতেই ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িত, কিন্তু ধূলা লাগিবার দুর্ভাগ্য তাহাদের হইত না। আর, তাহার প্রয়োজনও ছিল না। বিমলের স্বামী যেখানে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বড় বাবু, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সেখানে অন্যে গাধা বা আরও নিম্নজাতির কোন পশুর যোগ্য খাটুনি খাটিতে পারে—তাঁহারা কেন খাটিবেন? বিশেষতঃ বড় বাবুর নিঃসম্পর্ক আত্মীয় কর্ম্মচারিগণ যখন সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের কাজ করিয়া দিয়া, তাঁহাদের তুষ্টি সাধনে তৎপর, তখন তাঁহারা টেবিলের ড্রয়ারে রক্ষিত আর্সি চিরুনী ও পকেটের রুমালের তত্ত্বাবধান করিয়া যদি কালাতিবাহন করেন, তবে তাঁহাদিগকেই বা অপরাধী করা যায় কিরূপে?

অপরাধ যাহারই হৌক, কর্ম্মে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। এবং একদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যে, বড় সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে নটবর বাবু প্রভার খুল্লতাতপুত্র কুমার মণীন্দ্রলালকে ডিশ্‌মিস করিতেও বাধ্য হইলেন। বড় সাহেব নিজে তাহাকে ধরিয়া লইয়া বড়বাবুর সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার অপরাধের একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল করিয়া, বিচারফল জানিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া ছিলেন। বড় বাবু কুমার বাহাদুরকে ইংরেজীতে ডিশমিস করিলেন ও বাঙ্গালায় ছুটির পর রাস্তায় সাক্ষাৎ করিতে কহিলেন। কিন্তু একঘর লোকের সাম্‌নে স্বয়ং ভগ্নীপতি কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে অপমানিত হওয়ায় কুমার বাহাদুরের আভিজাত্য আহত হইয়াছিল, ছুটির পর বড় বাবু রাস্তায় পড়িয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না।

দিন দুই পরে বড়বাবু আফিসে ঢুকিয়াই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী কাঁপিয়া-ছিল, নটবরের নৃত্যে আফিস টলটলায়মান। সেদিন চারজন বাবু কর্ম্ম হারাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে আফিস ত্যাগ করিলেন। বলা প্রয়োজন, আফিসের হিতৈষী বড়বাবু কাজের ক্ষতি সহিতে পারিতেন না, সেই দিনই চারজন লোক এপয়েণ্টেড হইল।

কিন্তু কুমার মণীন্দ্রনাথের চাকরী করিয়া দিতে, প্রবল প্রতাপান্বিত বড় বাবুও হার মানিলেন। বড় সাহেবটার ঐ কেমন এক গোঁ, চেনে না ত চেনে না, একবার যদি চিনিল, তবে গোরে গিয়াও আর তাহাকে ভুলিবে না। একদিন মণীন্দ্রকে আফিসে ঢুকিতে দেখিয়াই তাহার ভগবত্তী দেহ-পুষ্ট শরীর নড়িয়া উঠিল। বড়বাবুর কামরায় আসিয়া সেই লোকটা আবার কেন আসিয়াছে, সাহেব তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল। নটবর স্রেফ মিথ্যা বলিলেন, উহার কয়দিনের মাহিয়ানা বাকী ছিল; লইতে আসিয়াছে। সাহেব বলিল, এখনি দিয়া বিদায় কর।

প্রভা শয্যায় শায়িতা। মাথা ধরিয়াছে, পেট ব্যথা করিয়াছে, জ্বর আসি-আসি হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাও হইয়া আসিল বলিয়া;—বিশেষ বিলম্ব আর নাই।

একসঙ্গে এতগুলা উৎকট ব্যাধির যন্ত্রণায় প্রভা চক্ষু চাহিতেই পারিতেছে না, তা নটবরের সঙ্গে কথা কহিবে কি! নটবর মাথায় গায়ে—অবশেষে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

প্রভা বলিলেন, থাক্, অত সোহাগে আর কাজ নেই। মরছি আমি নিজের জ্বালায়, উনি আবার পায়ে হাত দিয়ে আমাকে নরকে পাঠাচ্ছেন!

নটবর জ্বালার শরীরে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন, কহিলেন, ডাক্তার ডাকি! কি বল?

প্রভা বলিলেন, বলছি বকিও না, তবু ঘ্যানর ঘ্যানর করবে।

নটবর নিঃশব্দে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। প্রভা বলিলেন, —থাক্ গো থাক্, খুব হয়েছে। আর ডাক্তার ডেকে টাকা দেখাতে হবে না! গরীব দুঃখীকে একটা পয়সা দিতে হলে বুক ফেটে যায়, উনি আবার ডাক্তার আনতে যাচ্ছেন।

নটবরের মুখ পাংশু হইয়া আসিল। অতি বড় শত্রু-তেও এই একটা অপবাদ দিতে পারিত না। গরীব দুঃখী হাত পাতিয়া নিষ্ফল তাঁহার কাছে কখনও হয় নাই। আফিসের মাহিনার দিন তিনি পনেরো কুড়ি টাকার চক-চকে পয়সা কারেন্সি আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিতেন এবং সেগুলি পথের আতুর, ভিক্ষুকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। এই টাকা কটা ছাড়া সমস্তই তিনি অপব্যয় মনে করিতেন। কাজেই তীব্র প্রতিবাদ তিনি করিতে পারিতেন; কিন্তু জ্বালার শরীরে জ্বালা বাড়াইতে পারে কোন্ হৃদয়হীন, কোন্ দোজবরে, কোন্ বৃদ্ধ?

প্রভা যন্ত্রণায় কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিলেন— আমার খুড়তুতো ভাই মণিকে চেন?

আকাশ যে কি বর্ণ ধরিতেছে, তাহা ভাবিতেও নট-বরের হৃৎকম্প উপস্থিত।

—বলি চেন, না, না?

—চিনি বৈ-কি!

—সে কাল তোমার সঙ্গে আফিসে দেখা করতে গেছল, দেখা কর নি, কেন?

বড়বাবু ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভা ক্লিষ্ট স্বরে কহিলেন,—বাবাই তাকে চিঠি দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। নইলে সে যে ঘরের ছেলে, কারু কাছে হাত পাতবার আগে গলায় দড়ি দিত, আফিং খেত, আত্তহত্যে হ'ত!

বড়বাবু স্তব্ধ।

—তাদের নাকি বড্ডই অবস্থাটা খারাপ হয়ে পড়েছে, হাঁড়ী চড়ছে না বল্লেই হয়, তাই বাবার চিঠিখানা নিয়ে তোমার দরজায় গেছল।

ঈশ্বর জানেন, বড়বাবু এ সকলের বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না; কিন্তু দোজবরে বৃদ্ধ স্বামীর সত্য উক্তি কি কখনও কোন নবোঢ়ার নিকট আদৃত হয়? না, সত্য বলিয়া গৃহীত হয়? নটবর দেড় বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা প্রণিধান করিয়াছেন।

জ্বালার শরীরে, জ্বলিতে জ্বলিতে প্রভা বলিলেন— অপমানটা ত আর তাকে করা হল না, আমার বাবারই অপমান হল! তাঁর চিঠি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে…

কুচি কুচি? চিঠি? ওঃ! নটবর কি অপকর্ম্মটাই করিয়া ফেলিয়াছেন! সত্যবাদী কুমার বাহাদুর কি অল্প কষ্টে কথাগুলা জেঠতুতো ভগিনীর গোচর করিয়া গিয়াছেন!

প্রভা বলিলেন—ফেলে দেওয়া হল, এতে অপমানটা কি মণির হল! না, আমার বাবার মাথায় জুতো মারা হল?

নটবর ত্রস্তে কি একটা বলিতে গেলেন, প্রভা সে অবসর দিলেন না, বলিলেন—বাবারও যেমন মরণ হয় না, তাই বড়বাবু জামাইয়ের কাছে চিঠি পাঠাতে গেলেন! ওঃ, কি আমার জামাই গো! হ্যাঁ, প্রথম পক্ষের জামাই হত, প্রাণ দিয়ে শ্বশুরের মান রাখতো! দ্বিতীয় পক্ষের আবার বিয়ে! তার আবার জামাই! আসুন-না বাবা একবার এখানে, বেশ করে দশ কথা না শুনিয়া দিই ত আমি তাঁর মেয়েই নই।

নটবর সে-রাত্রে মুহ্যমান হইয়া বিছানার পাশে পড়িয়া রহিলেন; ঘুম হইল না। একা বিছানায় পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে অশেষ যন্ত্রণায় জ্বালায়

পুড়িয়া তাঁহার যুবতী স্ত্রী নিদ্রিতা হইয়াছেন। পাছে জ্বালা বাড়ে, যন্ত্রণা দেখা দেয়, কাতরানি আরম্ভ হয়, তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া যে দু'টা কথা কহিবেন, তাহারও সাহস বা সুযোগ নটবরের হইল না।

৩

বড় সাহেব জোন্স বিলাত চলিয়া গেল; ফিলিপ বিলাতে ছিল, ফিরিয়া আফিস্ তরণীর হাল ধরিল। তাহার এক দিন পরেই কুমার মণি বাহাদুর পঞ্চাশটাকা মাহিনার একটি কর্ম পাইল।

ফিলিপ জোন্স কোম্পানীর আফিসটি খুব বড় নয়। জন বাইশ বাবু, একজন বড় বাবু, দুইটা সাহেব, একটা দরওয়ান, দুইটা বেহারা, ইহা লইয়াই আফিস। বর্ত্তমানে বাইশজন বাবুর মধ্যে বিশ জন বহুকালপূর্ব-লুপ্ত নবাবী আমলের অনুগৃহীত রাজা ও একটা সুবৃহৎ বংশ-প্রতিষ্ঠা-তার বংশ হইতে সমুদ্গত। দুইজন পুরাণো বাবু যাঁহারা দুর্গা নাম স্মরিয়া এখনো টিকিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন, ক্যাসিয়ার। যে টাকা জমা দিয়া এই চাকরির চেয়ারটিতে বসিতে হয়, তাহা রাজ-বংশের আয়রণচেষ্টে আপাততঃ অবর্ত্তমান। অপর বাবুটি, বাজার-ম্যান্! বাজার তাঁহার নখ-দর্পণে! আর বাজারের উপরই আফিস অধিষ্ঠিত, বড়বাবু সেখানে হাত দিতে সাহস করেন নাই। বেহারা দুইজনের একজনকে চাকরী খোওয়াইয়া দেশে যাইতে হইয়াছে, তাহার স্থানে শ্বশুরবাটীর পুরাতন কালের একটি পাচিকা-পুত্র নিয়োজিত হইয়াছে।

আফিসের খবর ঐ; বাড়ীর খবর খুবই সুখপ্রদ। এখন নটবর জুতা না ছাড়িতেই চা পাইয়া থাকেন। আজকাল আর পাণের চুণে গণ্ড বিদগ্ধ হয় না এবং জামার বোতামের অভাবে আফিসের আলপিন গুঁজিয়া সদাই যাত্রার সং সাজিয়া থাকিতে হয় না। এখন আফিস বাহির হইবার সময় প্রিয়ার স্ব-হস্তে ভাজা ও শ্রীহস্তে কলাপাতা কাগজমোড়া খাবারের পুঁটুলি পকেটে ভারি হইয়া উঠে; টিফিনের সময় মোড়ক খুলিয়া, নিত্য নূতন তরকারী ও মিষ্টের সন্দর্শন লাভে বৃদ্ধ নটবরের যৌবন ফিরিয়া আসিতে লালায়িত হইয়া পড়ে।

ফিলিপ সাহেব এবার বিলাত হইতে আসিয়া অবধি আমাশয়ে ভুগিতেছে; মাঝে মাঝে সারে, আবার বাড়িয়া উঠে। তিন মাসে তাহার ওজন তের সের কমিয়া গিয়াছে। ফিলিপ বড়ই চিন্তিত। বিলাত হইতে প্রতি মেলে ফিলিপ-পত্নী ফিলিপকে দেশে ফিরিতে লিখিতেছে; এখানকার বন্ধুরাও সেই পরামর্শ দিতেছে। তবু যে ফিলিপ যাইতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ দেড় বৎসরের বিরহক্লিষ্ট জোন্স ছ' মাসের জন্য দেশে গিয়াছে, তাহাকে এত শীঘ্র ফিরাইয়া আনিয়া তাহার পত্নীর অভিশাপগ্রস্ত হইতে সে প্রস্তুত নহে।

কিন্তু আর উপায়ও নাই। ফিলিপ দুই একদিন রক্ত-বিন্দুও লক্ষ্য করিল। ডাক্তাররা বলিলেন—এখনই প্যাসেজ বুক কর, নহিলে হাড় ক'টা ড্যাম ইণ্ডিয়ার কালা মাটীতেই থাকিয়া যাইবে। অগত্যা ফিলিপ জোন্সকে তার করিল।

জোন্স দেশে ফিরিয়াই ডাইভোর্স কেসের প্রতিবাদী হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার সুন্দরী স্ত্রী দেড় বছরের বিরহে দ্বিগুণ সুন্দরী হইয়া যুদ্ধ-ফেরত এক কর্ণেলের সঙ্গে সুখ-বাস করিতেছে, স্বামীকে দেখিয়াই আদালতের আশ্রয় লইয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া ফেলিল। জোন্স এই সময়েই, ফিলিপের তার পাইয়া ভারতবর্ষে রওনা হইল। বিবাহ আর করিবে না, নারী জাতির উপর তাহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। সে দারুণ ঘৃণা, বিরক্তি ও ক্রোধ লইয়া ভারতের মাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ফিলিপ হাড় কখানাকে টানিতে টানিতে জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেল।

জোন্স আফিসে বসিল বটে, কিন্তু প্রথম কয়দিন কাজে তেমন মন দিতে পারিল না। তার পর ধাতটা বসিয়া গেল, জোন্স বলদের মত কাজে মাতিয়া উঠিল।

প্রথমেই নজর পড়িল, কুমার বাহাদুরের উপর। আজ আর সে বড়বাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইল না; ঘণ্টা বাজাইয়া বেহারা ডাকাইয়া সেলাম পৌছাইয়া দিল।

—ও লোকটাকে কে নিয়াছে?

বড় বাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, আমিই নিয়াছি। বড় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, অত্যন্ত দরিদ্র...

সাহেব বলিল, আমি গীর্জার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। আমি জানিতে চাই, আমি দুইবার উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি—তুমি জানিতে?

—জানিতাম।

—আবার তাহাকে লইয়া তুমি...

—অন্যায় হইয়া গেছে।

—আজই উহাকে তাড়াইয়া দাও।

—সাহেব...

—একটি কথাও নয়! মনে রাখিও, আফিস তোমার নয়, আমার! উহাকে ডাক...

বড়বাবু মণিকে ডাকিলেন। সাহেব বলিল—গেট্ আউট্! আভি নিকালো! তোমকো হাম নেহি মাংতা! মণি পলাইয়া গেল।

সাহেব বলিল, ফিলিপ আমাকে বলিয়া গেছে, আফিসের ষ্টাফ্ পরীক্ষা করিতে। তাহার বিশ্বাস, আফিসে কতকগুলা অকর্মণ্য জীবে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার আরও বিশ্বাস, কোন লোকের আত্মীয় কুটুম্ব এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে আফিসে কাজের বদলে অকাজ বেশী হইতেছে। বড়বাবু, আমি সোমবার হইতে ষ্টাফ্ পরীক্ষা করিব। কে কাহার আত্মীয় ও কার কি কোয়ালিফিকেসন, তুমি লিষ্ট ঠিক করিয়া লিখিয়া রাখিও! আমার মন কোন কারণে ভাল নাই, বেশী ঘাঁটাঘাটি যেন আমাকে না করিতে হয়, ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখিও। বলিয়া জোন্স সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল ও এক মুহূর্ত্তকাল বড়বাবুর মুখের পানে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, টুপি লইয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

বড়বাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, আফিস খালি!

৪

পঞ্জিকাতে লেখা ছিল কি না জানি না, লক্ষণ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা অবধারিত যে আজ প্রলয় হইবেই! প্রভা খুড়তুতো ভাই মণিকে সান্ত্বনা দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া শয়ন-মন্দিরকে গোসা ঘরে রূপান্তরিত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ের অনেক পরে নটবর গৃহে ফিরিলেন। কোথায় বা চা! কোথায় বা কি! নটবর দ্বিতলে উঠিতে সাহস করিলেন না।

রাত্রের ভাত বামুন ঠাকুর বাহিরের ঘরেই দিয়া গেল; চারিটি মুখে তুলিয়া, হাতমুখ ধুইয়া নবমী পূজার সন্ধিক্ষণ স্মরিয়া দ্বিতলে উঠিলেন।

প্রথম সম্ভাষণ—বলি বেঁচে আছ? আমি ত সিঁদুর তোলবার যোগাড় করছিলুম।

নটবর নীরব।

দ্বিতীয় প্রেমালাপ—তুমি কি ভেবেছ আমাকে বলতে পার? তুমি আফিসের বড়বাবু, দু'শ টাকা মাইনে পাও, আমাকে বিয়ে করে' আমার চোদ্দো পুরুষকে স্বর্গে তুলেছ! এই ত তোমার মনের ভাব! থাক তুমি তাই নিয়ে, আমি আজ...এটা কি দেখ্‌ছ?

নটবর চাহিয়া দেখিলেন, এক আউন্সের শিশি! বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে গায়ে আঁটা—বিষ!

তৃতীয় মধুরোক্তি—আর তোমাকে আমাদের জন্যে কষ্ট পেতে হবে না। আজ নিজের হাতেই তার শেষ করছি!—প্রভা শিশির ছিপি খুলিলেন।

নটবর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া বলিলেন—কি হয়েছে প্রভা? অমন করছ কেন?

প্রভা বলিলেন—অমন করছি কেন? এ কথা জিজ্ঞেস করতে তোমার মুখ খসে গেল না! না, না তোমার মুখ খসবে কেন? যে মুখে নিজের খুড়তুতো ভায়ের বাপ-মা তুলেছ...

—বাপ্-মা!

—শ্বশুর শ্বাশুড়ী নিজের বাপ মারই সমান! তাদের গাল পাড়তেও যার মুখ খসে পড়ে না...

নটবর বলিলেন—কি পাগলের মত বকছ?

—মণির চাকরী গেছে?

—গেছে! শুধু তার নয়...

প্রভার হস্তধৃত শিশি মৃত্তিকা হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। বলিলেন—শুধু তার নয়? তাহলে আরও গেছে? এ পোড়ারমুখ আমি বাপের বাড়ীর কাউকে দেখাব না, দেখাব না, দেখাব না! শুধু তার নয়? তবে আরও...

—হাঁ, আরও গেছে?

এই পৃথিবী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সকল কথা জানিয়া লওয়াই ভাল; নচেৎ আগ্রহ লইয়া অনন্তকাল ভ্রাম্যমান নরকের জীবের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সুতরাং প্রভা জিজ্ঞাসিলেন—আর কার গেল?

নটবর আস্তে আস্তে বলিলেন—আর আমার!

—তোমার!

—হ্যাঁ!

—কেন?

যায় নি; ছেড়ে দিয়ে এলাম।

এত বড় চাকরি, দু'শ টাকা মাহিনা, ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে শুনিয়া প্রভার সর্ব্বদেহ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; অতিকষ্টে জিজ্ঞাসিলেন—ছেড়ে দিয়ে এলে কেন?

তোমাকে সন্তুষ্ট করতে! নইলে আর উপায় ছিল না। সোমবারে তোমার আত্মীয়গুলির চাকরি যাবেই। আমার চাকরী থাকতে তাদের চাকরী গেলে—তুমি কি আর আমাকে জ্যান্ত রাখতে প্রভা? তোমাকে স্বামী-হত্যার পাতক থেকে বাঁচাবার জন্যেই আজ রেজিগ্‌নেসন লেটার লিখে বড় সাহেবের টেবিলে রেখে এসেছি।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

মার্কনীর নূতন কীর্ত্তি

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব অভূতপূর্ব্ব যন্ত্রের উদ্ভাবন হ'চ্ছে তা' দেখে জগতের লোক স্তম্ভিত হ'য়ে যা'চ্ছে। সম্প্রতি মার্কনি সাহেব ও তাঁর সহকারী W. C. Franklin সাহেব দুজনে মিলিত হয়ে এক রকম নূতন ধরণের বেতার সঙ্কেত উদ্ভাবন ক'রেছেন, যা' ইঙ্গিত রাত্রিকালে অর্ণবপোতের কর্ণধারকে এমনভাবে সাবধান ক'রে দেবে যে, জাহাজের গতিশীল অবস্থায় জলমগ্ন পর্ব্বতে আঘাতপ্রাপ্ত হ'য়ে নিমজ্জিত হ'বার সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না।

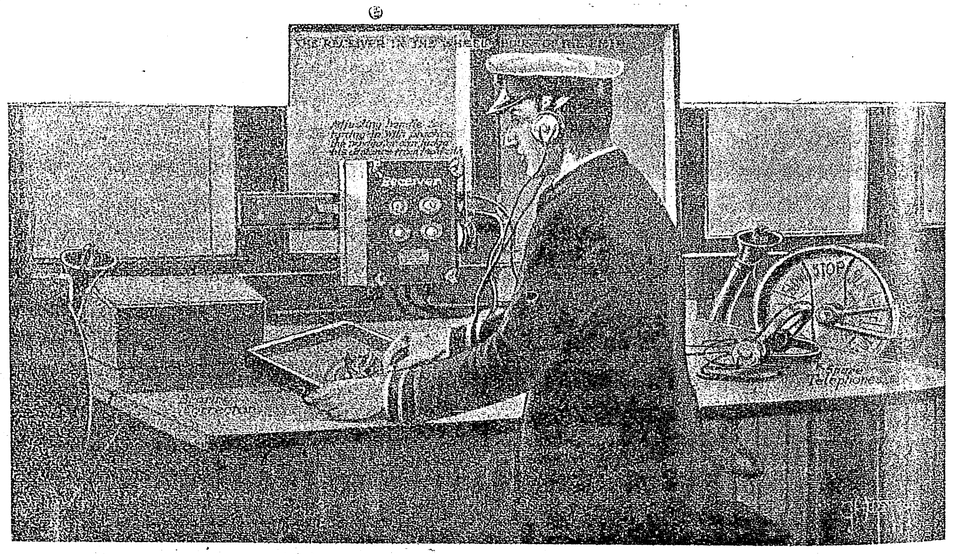

বার্ত্তা গ্রাহক (বেতার সঙ্কেত থেকে বার্ত্তা পেয়ে জাহাজের বার্ত্তা-গ্রাহক সেই বার্ত্তানুযায়ী জাহাজ চালাবার সঙ্কেত দিচ্ছে)

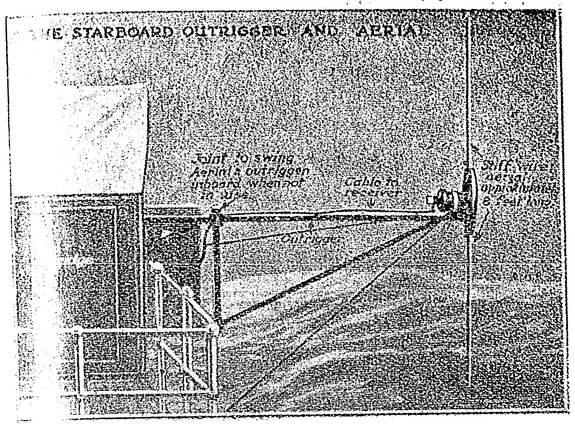

বেতার এরিয়াল (aerial)

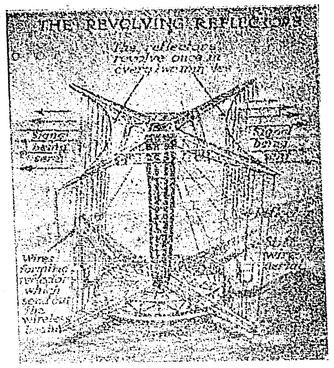

বেতার সঙ্কেত

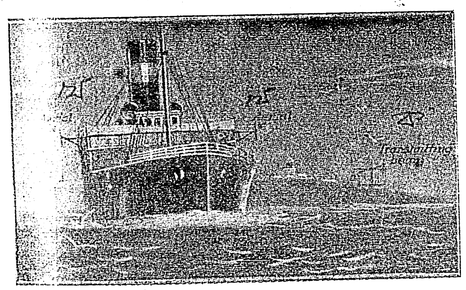

বেতার-সঙ্কেতের কার্য্য ('ক' চিহ্নিত স্থান থেকে বেতার-সঙ্কেত বার্ত্তা প্রেরণ ক'রছে আর জাহাজ 'খ' চিহ্নিত স্থানের সাহায্যে সেই বার্ত্তা গ্রহণ ক'রছে)

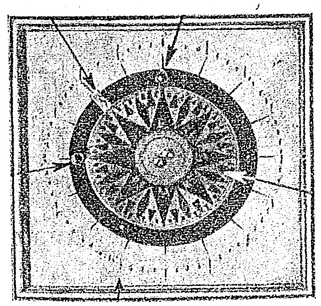

গতি পরিবর্ত্তনকারী (এই যন্ত্রের সাহায্যে বেতারবিদ্ জাহাজের গতি পরিবর্ত্তন ক'রে থাকেন)

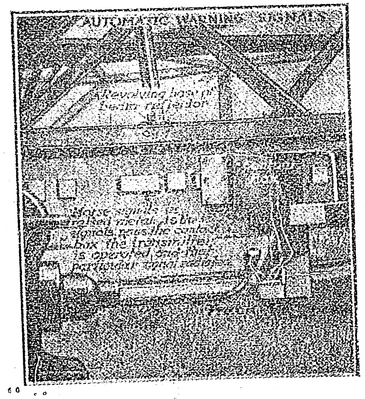

স্বয়ঞ্চল বেতার সঙ্কেত

আগ্নেয়গিরির রূপান্তর

আগ্নেয়গিরি যা'তে আর ভবিষ্যতে মানবজাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে না যেতে পারে সেজন্য দক্ষিণ মার্কিণ-রাজ্যের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত তা'র পরীক্ষা ক'রছেন। তাঁদের পরীক্ষার সর্ব্বপ্রথম ও

সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হ'চ্ছে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা এবং সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানবের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করা। তাঁরা আরও চেষ্টা ক'রছেন যা'তে আগ্নেয়গিরির ভগ্নস্তূপ থেকে সহজ-দাহ্য পদার্থ তৈয়ারী করা যেতে পারে।

নব-রূপ (আগ্নেয়গিরির ভস্মস্তূপ থেকে সহজ-দাহ্য পদার্থ তৈয়ারী ক'রা যেতে পারে কি না, তা' একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন)

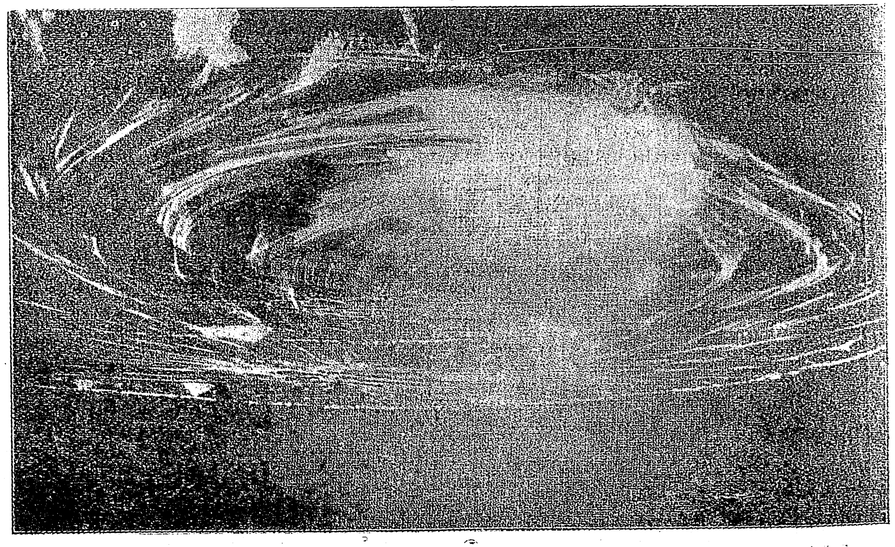

নশ-দৃশ্য (জামুখীর গহ্বরের রাত্রিকালের দৃশ্য)

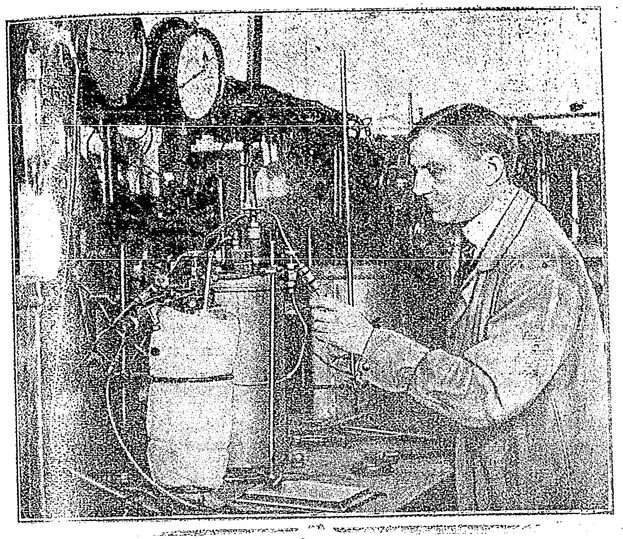

আগ্নেয়গিরির রূপান্তর
(বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈয়ারী ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন)

পরশনের ভাষা

মূক ও বধির যাঁরা তাঁরা ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ ক'রতে অক্ষম। কিন্তু তাঁদের স্পর্শশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে যে, তাঁরা শুধু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে এই শ্রেণীর লোকেরা বাক্‌শক্তির অভাবে তাঁদের পরশনের ভাষা প্রকাশের জন্য হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার ক'রতে বাধ্য হ'ন। তা'র কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের অঙ্গুলীর অগ্রভাগই স্পর্শ দ্বারা মনোভাব প্রকাশ ক'রবার একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। কারণ মানবের করাঙ্গুলীর অগ্রভাবে স্পর্শানুভূতি সংক্রান্ত স্নায়বিক শক্তিবিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাবেশ বলে বাক্‌শক্তিহীন মানুষ অঙ্গুলীর অগ্রভাগের স্পর্শের দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত ক'রতে পারে।

পরশনের ভাষা
(দু'জন মূক ও বধির নারী পরশনে পরস্পরের মনোভাব জান্‌ছে একজন ঠোঁটের উপরে হাত দিয়ে ঠোঁটনাড়া দেখে তার কথা বুঝ্‌ছে; আর একজন বুকে হাত দিয়ে তার মর্ম্মের ভাষা বুঝ্‌ছে)

চোরধরা কল

অনেক সময়ে খুব চতুর অপরাধীকে প্রমাণাভাবে ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ে; কিন্তু Mr. Albert Schneider নামক California সহরের একজন বৈজ্ঞানিক Third degree নাম দিয়ে যে যন্ত্রটি উদ্ভাবন ক'রেছেন, তা'র সাহায্যে

চোরধরা কল (বৈজ্ঞানিক যন্ত্র স্পর্শ ক'রে বিভিন্ন প্রকারের লিপির অনুভূতি লিপিবদ্ধ ক'রছেন)

প্রত্যেক অপরাধীকে ধরা এখন সহজসাধ্য হবে। এই যন্ত্রের একটি নিরূপিত স্থানে স্পর্শ ক'রলেই সেই স্পর্শের,

অনুভূতি তৎক্ষণাৎ সেই যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হ'য়ে যায়। পরে সেই অনুভূতি-লিপির বিশেষত্ব পরীক্ষা ক'রে বৈজ্ঞানিক তৎক্ষণাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ ক'রে দিতে পারেন।

সূর্য্য-সারথি

সম্প্রতি Bernard A. Grossman নামক একজন নবীন মার্কিন বৈজ্ঞানিক একটি অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে তিনি সূর্য্যকিরণ প্রভাবে রেলগাড়ী চালাতে পা'রবেন। দিবাভাগে এই যন্ত্রটীর সাহায্যে যন্ত্রাধারে সূর্য্যরশ্মি সঞ্চিত ক'রে নিয়ে, সেই সূর্য্যরশ্মিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত ক'রে, সেই শক্তির সাহায্যে তিনি রেলগাড়ী চালাতে সমর্থ হ'য়েছেন।

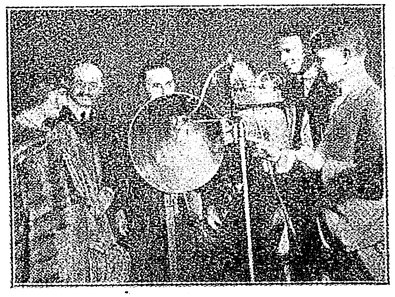

সূর্য্যসারথি

গ্রহাচার্য্যের ঘড়ি

বার্লিন সহরের Osward Schulz নামক একজন হোরা বৈজ্ঞানিক এমন একটি ঘড়ি নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যা'র সাহায্যে তিনি সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ ও তা'দের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম গতিবিধি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করতে পারেন। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত ঘড়ির নাম দিয়াছেন শুল্‌জ্‌-ঘড়ি। এটি তিনি আমাদের ভারতীয় মানমন্দিরেরই হোরাচক্রের অনুকরণে প্রস্তুত ক'রেছেন।

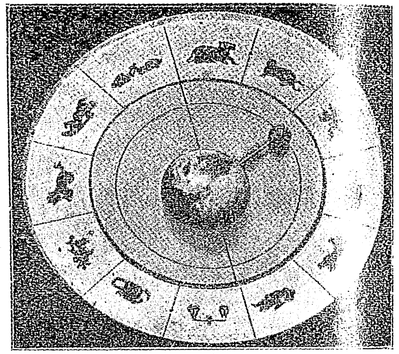

ঘড়ির অন্তর্দৃশ্য

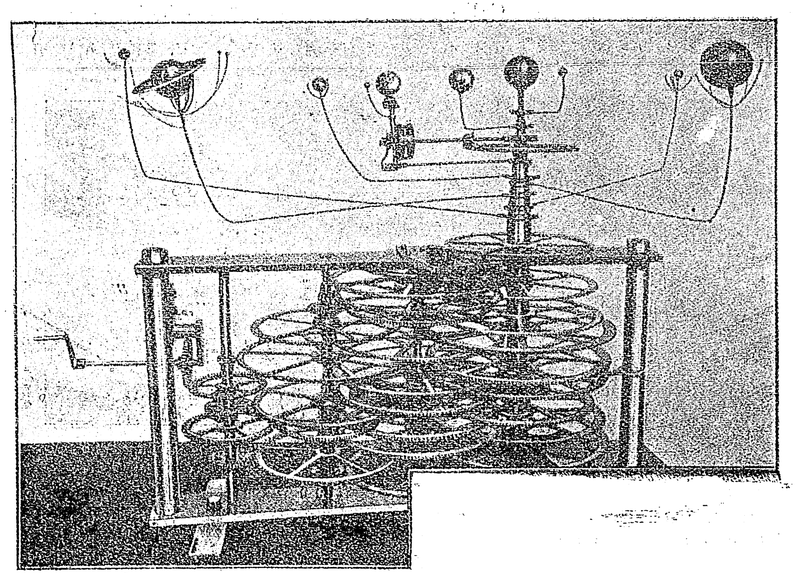

গ্রহাচার্য্যের ঘড়ি

তাড়িত পত্রবাহক

বৈদ্যুতিক শক্তি ও যন্ত্রসাহায্যে যাহাতে মানুষের হস্তাক্ষর এক স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা যেতে পারে, সেজন্য বেলিন নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক গত তিন বৎসর ধরে ক্রমাগত পরীক্ষা ক'রবার পর কতকটা সফল-কাম হ'য়েছেন। তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্র Belinogram এর সাহায্যে তিনি এক স্থান থেকে স্থানান্তরে হস্তাক্ষর প্রেরণে কৃত-কার্য্য হয়েছেন।

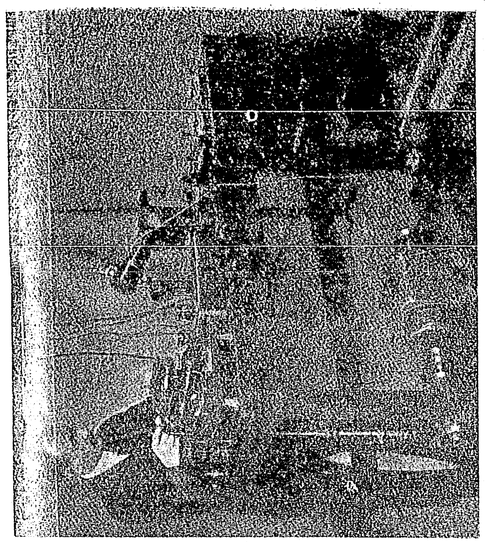

লিপি প্রেরক (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে স্থানান্তরে লিপি প্রেরণ ক'রছেন)

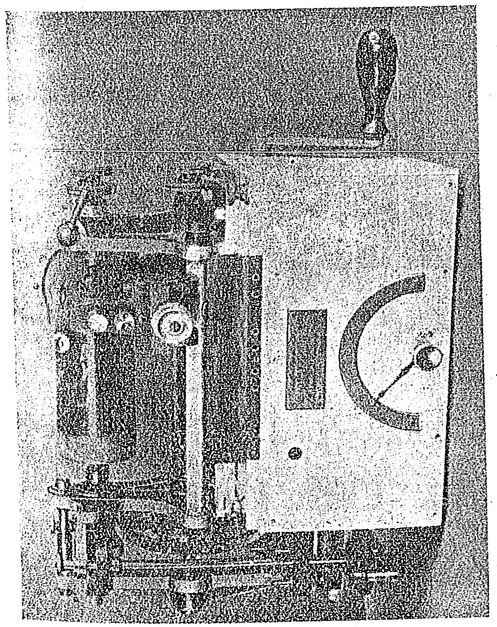

প্রতিকৃতি গ্রাহক (বৈজ্ঞানিক স্থানান্তর হ'তে আগত প্রতিকৃতি যন্ত্রে লিপিবদ্ধ ক'রছেন)

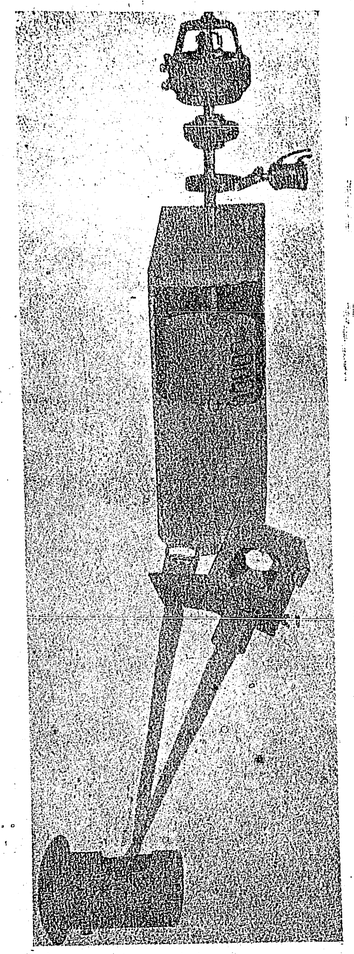

যন্ত্রের কার্য্যকলাপ

প্রতিকৃতি-প্রেরক (বৈজ্ঞানিক স্থানান্তরে প্রতিকৃতি প্রেরণ ক'রছেন)

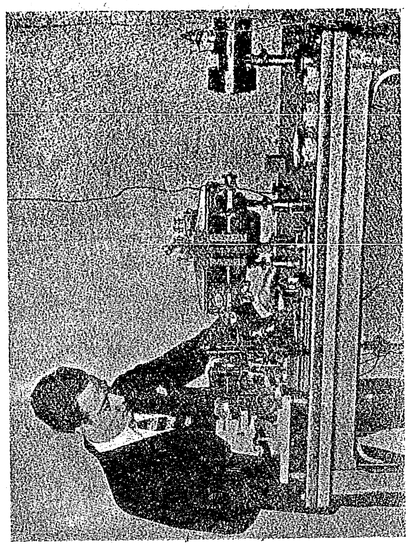

লিপি গ্রাহক (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে স্থানান্তর থেকে লিপি গ্রহণ ক'রছেন)

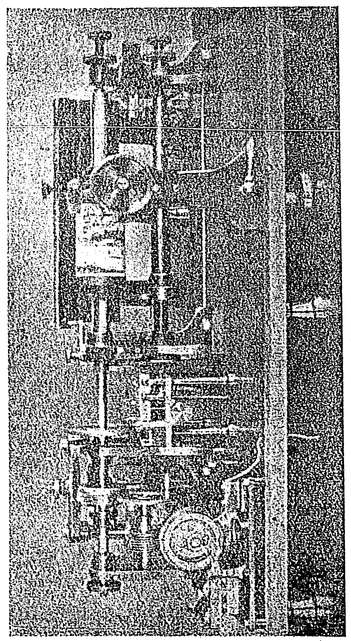

যন্ত্রের অভ্যন্তর

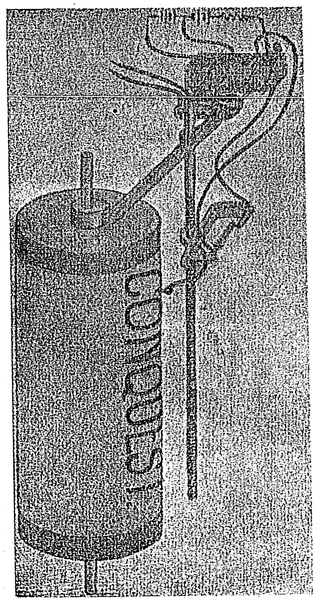

তাড়িত-পত্রবাহক যন্ত্র

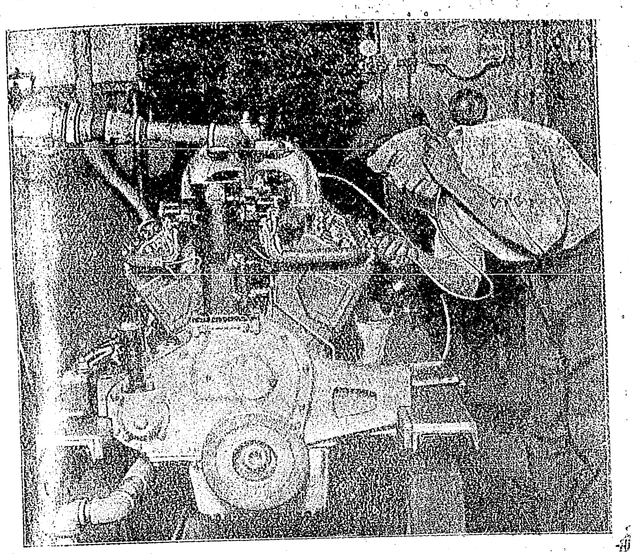

এঞ্জিনের অন্তর্বিচার (বৈজ্ঞানিক এঞ্জিনবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এঞ্জিন পরীক্ষা ক'রছেন)

এঞ্জিনের অন্তর্বিচার

মোটরগাড়ীর এঞ্জিন তৈয়ারী ক'রবার সময় অনবধানতাবশতঃ অনেক সময় এঞ্জিনের অনেক স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে যায়। এই ছিদ্রগুলি গাড়ীখানি ব্যবহার ক'রতে ক'রতে ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ ক'রে শেষে এঞ্জিনকে একেবারে বিকল ক'রে দেয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক এক প্রকার হৃদ্‌বীক্ষণ যন্ত্রের মতো এঞ্জিন পরীক্ষার যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন যা'র সাহায্যে এঞ্জিনের কোথাও ছিদ্র আছে কি না তা' সুন্দর ভাবে নিরূপণ করা যায়।

হৃদ্‌পিণ্ড দর্শন

ব্যাধিগ্রস্ত হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা যে হৃদ্‌বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও সকল সময়ে সঠিক ভাবে জানা যায় না, এ কথা চিকিৎসক মাত্রেই জানেন। তাঁদের এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্যই British National Hospitalএর অধ্যক্ষ একটি নূতন ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন। তা'র নাম "Orthiograph"। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা বাহির হইতেই সুন্দর ভাবে চিত্রিত ক'রে দেখাতে পারেন। তবে হৃদ্‌পিণ্ডের স্বরূপ প্রতিকৃতি পা'বার জন্য তাঁকে এই যন্ত্রের মধ্যে রণজেন রশ্মিও ব্যবহার ক'রতে হ'য়েছে।

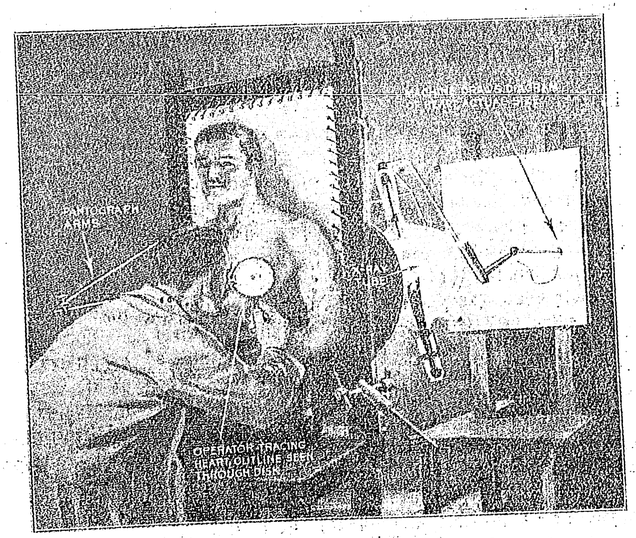

হৃদ্‌পিণ্ড দর্শন(বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর হৃৎপিণ্ড চিত্রিত ক'রছেন)

সূর্য্যকরে ধাতুপিণ্ড

আকরিক ধাতু (ore) দ্রবীভূত ক'রতে হ'লে প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন এবং সেই তাপের সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রপাতি সমূহ ক্রয় ক'রতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। খনির মালিকদের এই অসুবিধা দূর করবার জন্য William Thomas নামক একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তিনি সূর্য্য-রশ্মিকে সমকেন্দ্রে ঘনীভূত ক'রে, তা'রই উত্তাপে আকরিক ধাতু অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে বিদ্রাবিত ক'রতে পারেন।

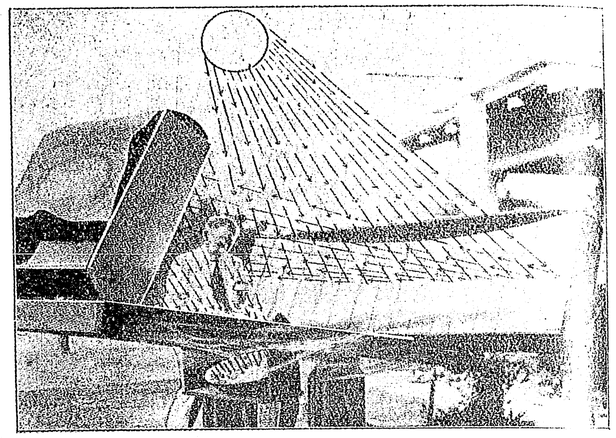

সূর্য্যকরে ধাতুপিণ্ড (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আকরিক ধাতু দ্রবীভূত ক'রছে)

পাঠকের নিকট প্রার্থনা

একখানি অপ্রকাশিত কিন্ত বহুমূল্য পুঁথির সন্ধান পাইবার নিমিত্ত পাঠকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পুঁথিখানি আমি দেখি নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্ বেণ্ট্লি নামক এক সাহেবের চক্ষু ব্যতীত অদ্যাপি আর কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে নাই। পুঁথিখানির নামও জানা নাই। কাজেই ইহার একটু বৃত্তান্ত দ্বারা বলিতে হইতেছে।

জন্ বেণ্ট্লি ভাগলপুরে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি আমাদের জ্যোতিষের ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া একখানি বই লেখেন। বইখানির নাম A Historical view of the Hindu Astronomy.

বইখানি এশিয়াটিক্ সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি সার অসার অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপের দুই একজন জ্যোতির্বিদ্ তাঁহার মতামত বিচার করিয়া গিয়াছেন। এক দোষে বইখানি আমাদের নিকট অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। তাঁহার যত কিছু আস্ফালন, তাহা পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া নিজের কল্পনাতরঙ্গ। পদে পদে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ জুটিয়া সত্য মিথ্যা মিশাইয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার বইতে একস্থলে এক বর্ষচক্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কোথা হইতে তিনি এই চক্র (cycle) পাইয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন দেন নাই। এতকাল কেহ এই চক্রের আলোচনাও করেন নাই। তিন বৎসর পূর্বে বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর মহাশয় এই বর্ষচক্র হইতে আমাদের জ্যোতিষের এক অজ্ঞাতপূর্ব ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, এই বর্ষচক্র এক অমূল্য বস্তু। ইহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে আমাদের পঞ্জিকার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত হইবে।

আমাদের পাঁজিতে নিম্নলিখিত পুণ্যতিথিগুলির নাম সকলেই পড়িয়াছেন। যথা—আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী; ইহার অপর নাম আদিকল্প। এই দিন দুর্গাপূজা আরম্ভ। অগ্রহায়ণ মাসে গুহষষ্ঠী, চৈত্রমাসে স্কন্দষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লুণ্ঠন বা চাপড়া-ষষ্ঠী। পুনশ্চ, বৈশাখ মাসে জহ্নু সপ্তমী, আষাঢ় মাসে বিবস্বৎ সপ্তমী, ভাদ্র মাসে ললিতা সপ্তমী, মাঘ মাসে আরোগ্য, রথ, মিত্র বা ভাস্করী সপ্তমী। এই এই তিথি কেন প্রসিদ্ধ হইল, তাহার উত্তর অদ্যাপি অজ্ঞাত ছিল। পুরাণে অবশ্য তিথিগুলির বিধান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায় না। বেণ্ট্লি সাহেব প্রাচীন বর্ষচক্রের অকস্মাৎ উল্লেখ না করিলে এই প্রার্থনা করিতে হইত না। কত ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে; উপস্থিত বিষয় লুপ্তের প্রকোষ্ঠে ফেলা হইত। ২৪৭ সায়নবর্ষ ১ মাসে এক চক্র হইত। প্রথম চক্রের প্রথম তিথি আদিকল্পষষ্ঠী। ইহা খিষ্টপূর্ব ১১৯৩ সনে হইয়াছিল, আশ্বিন মাসে। দ্বিতীয় চক্রের আরম্ভ গুহষষ্ঠী। ইহা খিষ্টপূর্ব ৯৪৬ সনে হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে। এই চক্র বিস্তার করিয়া এবং তাহার উপযোগ দেখাইয়া শ্রীযুত কেতকর মহাশয় আমাদের আগ্রহ আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে 'পঞ্জিকা-সংস্কার' নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন।

আমার বোধ হইয়াছে এই বর্ষচক্র কোন প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদের আবিষ্কার। বেণ্ট্লি সাহেব বঙ্গদেশে ছিলেন। চক্রখানি প্রাচীন গ্রহাচার্যদিগের বাড়ীতে এখনও থাকিতে পারে। যদি পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রামে অনুসন্ধান করেন, প্রাচীন বাঙ্গালীর লুপ্তকীর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হইতে পারে। ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে পরে এবং নিয়ত শুক্ল সপ্তমী তিথিতে চক্র আরম্ভ হইত,—এইটুকু ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন। ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
বাঁকুড়া।

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

নানাবিধ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে সহসা ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন—দিনাজপুরে এক গরীব কেরাণীর তহবিল তসরূপ মোকদ্দমায় আশুকে তাহারা লইয়া গেল। আশু দক্ষতার সঙ্গে সেই মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া অত্যন্ত সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইল। ক্রমে সেখানে অনেকগুলি মোকদ্দমা পাইলে চারিদিকে সুনাম বাহির হওয়ায়, হাইকোর্টেও ছোটখাট মোকদ্দমা জুটিতে লাগিল। খ্যাতনামা এটর্ণি অপূর্ব্ব গাঙ্গুলী মহাশয় আশুর হাতে প্রথমেই ব্রিফ্ দেন, ও সাহায্য করিতে থাকেন। দিনাজপুর হইতে ফিরিবার পথে আশু চুয়াডাঙ্গা নামিয়া সমস্ত ফিএর টাকা পিতৃদেবের পায় দিয়া প্রণাম করিলে, তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণে পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রায় সমস্ত টাকা তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। গরীব চাকর দাসীদিগকে মিষ্টান্ন দিবার নিমিত্ত সামান্য কয়েকটা টাকামাত্র মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে আশু শনি রবিবারে পিতৃদেবের নিকট চুয়াডাঙ্গা আসিত। তিনি তখন চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিসন্ অফিসার।

বিলাত-ফেরত যুবকগণের বিবাহের জন্য দলে-দলে কন্যার পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ উপযাচক হইয়া থাকেন। ঘটক সমাগমের শেষ করা কঠিন। অথচ বিবাহ-বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। অবস্থা বিবাহের অনুকূল নহে—উমেদার ঢের। সেই বিলাতযাত্রার পথে রবিবাবু ও সত্যবাবুর সহিত যে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাতে ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভার সহিত তাঁহারা আবার বিবাহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। খুল্লতাতের মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া মনোমত পাত্র বিবেচনায় প্রতিভাদেবী ও মনে মনে আশুকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কথাটা ভ্রাতার কর্ণগোচর হইল। ক্রমে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পিতৃদেবের মত না হইলে ত আশু বিবাহে সম্মত হইবে না। অবশেষে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করা হইল। তিনি কন্যার রূপ গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে শুনিয়া ঐ কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহে মত দিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিবার আর সময় পাওয়া গেল না ও বেশী দরদস্তুর হইল না। পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে শ্রীমান যোগেশ, কুমুদ, প্রমথ, মনো উপস্থিত থাকিয়া যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "দাদার" বিবাহ দিয়া নববধূ গৃহে আনিল। পিতৃদেব দিনাজপুরেই রহিয়া গেলেন। স্কট্স লেনের ক্ষুদ্র বাড়ীতে আশুরা তেমনি রহিল।

আজিকার দিনের দেনা পাওনার মত বন্দোবস্ত কিছুই করা হয় নাই। আবার এদিকে "marriage without dowry" (হাল ফ্যাসান) খবরের কাগজেও ঘোষিত হইল না। অমন ছেলের অমনি বিয়ে একটু আশ্চর্য্যের কথা—বৈষয়িক লোকদের অনেকেই মনে করিলেন—সব বাজে—বিশেষতঃ "ঠাকুর বাড়ীতে" যখন বিবাহ। ক্ষুদ্র স্কট্স লেনের বাটীতে চারি ভ্রাতা, নববধূ, শ্রীমতী মৃণালিনী ও প্রিয়ম্বদা, থাকিয়া বেথুন স্কুলে যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। সুনিপুণা সুশীলা প্রতিভা দেবীর গৃহিণীপণায় ক্ষুদ্র সংসারটী দিব্য চলিতে লাগিল। অনেক সময়ে অর্থাভাব ঘটিত; তাহাতে কেহই কষ্ট বোধ করিত না। আশু অতিশয় পরিশ্রম সহকারে কাজকর্ম্ম করিত। সেই সময়ে শ্রীমান যোগেশ এম্-এ পাশ করিয়া ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে প্রফেসারের পদ গ্রহণ করে।

যোগেশের কাজে কতকটা সাংসারিক সুবিধা হইয়া গেল। পিতৃদেবের আজ্ঞানুসারে ও স্বইচ্ছায় সে উপার্জ্জনের সমস্তই বধূমাতার হস্তে দিয়া দিত। আমাদিগের পরিবারে টাকা কড়ি ও হিসাবপত্র সব বধূদিগের হস্তেই দিবার নিয়ম। পুরুষদিগের প্রয়োজন মত তাঁহারা বধূগণের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

এই সময় আশু কয়েক সপ্তাহের জন্য Indian Association-এর Secretary পদ প্রাপ্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত

কাজ চালাইয়া ফললাভ করে। তাহার কার্য্যে মেম্বরগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ৺দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সহকারী ছিলেন। সেই হইতেই স্বদেশের উন্নতিকল্পে আশু নানাদিকে চেষ্টা করে। মহানগরী কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, যুবক আশু তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিল।

কংগ্রেসের সান্ধ্য সম্মিলনে আশু উৎসাহের সহিত কনিষ্ঠ সহোদর সুহৃদ ও অমিয়কে স্বদেশী পরিচ্ছদে সাজাইয়া সম্মিলনী দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে যে কাজেই অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছে। তখন হইতেই ব্যারিষ্টারীর আয় অপেক্ষাকৃত কতক বাড়িয়া যাওয়ায় ধর্ম্মতলায় আর একটী বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া সকলে সেখানে উঠিয়া যায়। সেই হইতেই সভা সমিতিতে যাওয়া আসা, ছোটখাট বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রগণের সহিত মিলা মিশা করিতে সে আলস্য বোধ করিত না। সে তৎকালে ভারতীতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে সমস্ত প্রবন্ধ এখনও ভারতীর অঙ্গ শোভা করিতেছে। সুলক্ষণা বধূ প্রতিভার সঙ্গীতে অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বন্ধুগণ, ও প্রতিভার আত্মীয় স্বজনে শনি রবি বারে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তৎকালে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ও সত্যবাবু আশুর গৃহে সদাসর্ব্বদা আসিয়া ক্ষুদ্র গৃহটীকে আনন্দ নিকেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন আমরাও তাহার কলিকাতাস্থ ভবনে আসিয়া সুখী হইতাম। মহর্ষিদেব আশুর সহিত পৌত্রীর বিবাহ দিয়া বড় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আশু আমার একটা অর্জ্জন। অনেক সাধনায় প্রতিভা এমন পাত্রে পরিণীতা হইয়াছে।"

১৮৮৭ সালের ২৫শে আগষ্ট মহর্ষি দেবের গৃহে আশুতোষের প্রথম পুত্র প্রিয়দর্শন শ্রীমান আর্য্যকুমারের জন্ম হইয়াছিল। নাম—ঋষিপ্রতিম সত্যেন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সুকুমার পুত্রের জন্মে পরিবারস্থ সকলেরই মনে অসীম আনন্দ হয়। যথাকালে শিশু পুত্র লইয়া বধূমাতা আবার নিজ বাসায় আসিয়াছিল। আমাদিগের দেশে মাতুলালয়ে অন্নপ্রাশন হইবার নিয়ম নাই। পিতৃ ঠাকুর কলিকাতার বাসা বাটীতে আসিয়া অতি সমারোহে পৌত্রের অন্নপ্রাশন দিয়াছিলেন। তাহার পরে ১৮৯২ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ধর্ম্মতলার বাসাতে দ্বিতীয় পুত্র ফুটফুটে সুন্দর অশ্বিনীকুমারের জন্ম হইয়াছিল।

পিতৃদেব পেন্সন লইয়া তখন কলিকাতায়। অশ্বিনীকুমারের জন্মের সময় তিনি সেই বাটীতেই উপস্থিত ছিলেন। সদ্যপ্রসূত দিব্য-কান্তি শিশুকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তিনি অসীম আহ্লাদ প্রকাশ করেন। চিরজীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় প্রবাসে প্রবাসে ঘুরিয়া কখন নবজাত শিশু দেখেন নাই,—এটা তাঁহার জীবনের একটা নবযুগ। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়েই সূতিকা-গৃহে বসিয়া বসিয়া শিশু পৌত্রকে রাখিতেন ও ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সুখী হইতেন। মাও সেই জন্ম দিন হইতেই অশ্বিনীকুমারকে পুত্রাধিক অপার স্নেহে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। শিশু আশুও এক মুহূর্ত্ত তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। মা মণি পিতামহী ও দাদাবাবুকে অত্যধিক ভালবসিয়া তাঁহাদের সঙ্গ কখন ছাড়িয়া কোনখানেই যাইত না। "অশ্বিনীকুমার" নাম পিতৃদেব নিজেই দিয়া শিশুর অন্নপ্রাশনের অন্ন নিজ হস্তে তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছিলেন। তখন পেন্সন লইয়াছিলেন জন্য শিশুর অন্নপ্রাশনে তেমন আর ধুমধাম করেন নাই। এই সময় আশু পিতৃ আজ্ঞায় শ্রীমান মন্মথকে ডাক্তারী পড়িতে বিলাত পাঠাইয়া দিয়াছিল ও সময় প্রয়োজনীয় ব্যয় সানন্দচিত্তেই বহন করিত। তাহাতে কোন ক্রটী কখন করে নাই। রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর পিতৃঠাকুর একা কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে আর বাস করিতে পারিলেন না। আশুতোষ আমাদিগের সবাইকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। মন্মথর বিলাত-গমনের পরই ভগিনী মৃণালিনীর বিবাহ স্থির করা হয়। অধুনা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীমান উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিবাহ আশুই দিয়াছে। উমাদাস আশুর পরম বন্ধু। কৈশোরে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে উভয়ে এক সঙ্গে পড়াশুনা করিতেন। বিলাতেও দুইজন একত্র বাস করাতে সেই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ভাবে আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল। জীবনের কত সুখ দুঃখের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে অতিশয় ভালবাসিত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই অকৃত্রিম ভালবাসা সমান ভাবেই রহিয়া যায়। ভগিনীর বিবাহ অন্তে আবার আশু ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদার বিবাহ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উমাদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর) সহিত দিয়া সুখী হয়। তারাদাস একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, স্নেহশীল, বদান্য ছিলেন। মিষ্টভাষিতা ও জনপ্রিয়তাগুণে তাঁহার কাহারো সহিত কখনও মনোমালিন্য হয় নাই। সবাইকে তিনি আপনার বলিয়া জানিতেন। দেশানুরাগের এই চরমবাক্য সতত তাঁহার মুখে শুনা যাইত—"দেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"। তাঁহার অকাল মৃত্যু জনিত শোকে আশু নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে সব অসহনীয় শোক দুঃখের কাহিনী আর বিশেষভাবে লেখা সাধ্যাতীত।

স্নানযাত্রা

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

চমকিয়া নারী শুনিল, "উঠমা, শোভনা, আমার কন্যা,
পুণ্য তিথি আজ, গঙ্গায় নামি হও শুচি, হও ধন্যা।"
স্বপনে সে সতী, দেখা দিয়া গেছে, যার সুকোমল অঙ্কে
ফুটেছে বালা অমল কুসুম। কেন সে ঝাঁপিল পঙ্কে,
কঠিন কুলিশ হানি মার বুকে, বহায়ে শোকের বন্যা?—
প্রতিবাসী কয়, "এমন কি হয় সতী জননীর কন্যা?
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, শেষে কলঙ্কিনী মাঝে গণ্যা!
এ কি সতী-মার কন্যা?"
জনক কহিল "মরিল না কেন?"—কুলের কলঙ্কে ক্রুদ্ধ,
অঝোরে ঝরিল মায়ের নয়ন, ব্যথায় বচন রুদ্ধ।
চির ক্ষমাশীল মায়ের হৃদয়, স্নেহের সুধায় পূর্ণ,
পর্ব্বত-ভার লজ্জার তলে পিষিয়া হইল চূর্ণ!

* * * *

সুদূর নগরে অভাগীর যদি বেদনা ভরিত চিত্ত,
ভুলিতে চাহিত দেখিয়া দেখিয়া সঞ্চিল কত বিত্ত
দেহ ভাড়া দিয়া, হাসিটি বেচিয়া, সুমোহন করি সজ্জা,
তুলিতনা কানে কে গেল শ্মশানে' সহিতে না পারি লজ্জা।
কত গেছে দিন গেছে বর্ষ মাস। আজি না পোহাতে রাত্রি
জাহ্নবী তীরে চলেছে যখন অগণ্য স্নানের যাত্রী,
কে গেল ডাকিয়া—"উঠমা, উঠমা, শোভনা, আমার কন্যা,
আজ পুণ্য তিথি, গঙ্গায় নামি হও শুচি, হও ধন্যা।"
শান্ত মহিমায় বলে পুনরায়—"শোভনা, আমার কন্যা,
শুদ্ধা যাহারা সুন্দরী তারা, ধরণীতে তারা ধন্যা।
এ শুভ ঊষায় আলোক ভূষায় উজ্জ্বল কর চিত্ত,
নূতন জনম, নূতন জীবন, লভিবে নূতন বিত্ত।"

পূরব আকাশে ঊষা হাসি ডাকে—"সতী জননীর কন্যা!"
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ডেকে কহে, "আজি সতী-সুতা হবে ধন্যা।"
"পড়েছিল বলে পড়েই রবেনা, সাধ্বী মায়ের কন্যা
লভিয়া আবার নূতন জনম সতীকুলে হবে গণ্যা—"
শান্ত সমীর শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ যেন বর্ষে;
জাহ্নবী ধারা উছলি চলিছে যেন কি গভীর হর্ষে।
কেঁদে নারী বলে—"নামি নদীজলে দেহ করা যায় শুদ্ধ,
কে দিবে ধুইয়া কলঙ্কিত হিয়া, নিরন্ধ্র, কারায় রুদ্ধ?"
তবুও উঠেছে, স্মরি মাতৃ মুখ, কহিছে—"মায়েরি জন্য,
মায়ের দেবতা মোরে দয়া ক'রো, ভরসা তো নাহি অন্য।"
পাছে পরিচিত কেহ চিনে ফেলে, চালায় চরণ ক্ষিপ্র;
দলে দলে চলে সধবা, বিধবা, দোকানী, পসারী বিপ্র।
বিলাসিনী মানি কহে একজন—"দিব স্নান-মন্ত্র' শিক্ষা
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বেশী নাহি চাই, অঙ্গুরীয় দিও ভিক্ষা।"
নীরবে সে চলে। দেখে, তার পানে পড়িছে যতেক দৃষ্টি
হয় ঘৃণা ঢালে, নয় হেসে হেসে করিছে কলুষ বৃষ্টি।
গূঢ় বেদনায় জলে নামি যায়, সে দৃষ্টির মলা অঙ্গে,
তারে ধুয়ে দিবে জাহ্নবী জলে, কারেও চাহেনা সঙ্গে।
তীর হতে যায় দূরে—আরো দূরে—"ডুবিল! ডুবিল!" শব্দ
কেহ জিজ্ঞাসিল—"জানে কি সাঁতার?" কেহবা রহিল স্তব্ধ।

মনের পরশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিষ্টার টমাস মুখ নীচু ক'রে গৃহচুল্লীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লেন : "অর্থাগম একদম না হ'লে যে বাঁচা মুস্কিল এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের জীবনে এ সত্যটিকে আমি সময়ে সময়ে খুব বড় রকমের ট্রাজিডি মনে না ক'রেই পারি না। কারণ একদিকে খৃষ্টের ফকীর হবার উপদেশও আমি ঠিক্ পরিপাক করতে পারি না। অপরদিকে আধুনিক সভ্যতার অভিঘাতে ও আলোতে যতদূর দেখা যায় তাতে মনে হয় যে আত্মসম্মান ও ভিক্ষোপজীবিকা এ দুয়ের সামঞ্জস্য সাধন করা অসাধ্য। তবে ওটা একটু অবান্তর কথা। তুমি যে সমস্যার কথা বল্‌লে সেটার সমাধান তুমি নিজেই খুঁজলে পাবে। অথচ এ প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজেই হয়ে যায় যদি তোমাদের দেশে গান গেয়ে নিতান্ত জীবনধারণের জন্য দরকার টাকাও রোজগার করা অসম্ভব হয়। অর্থাৎ কি না তাহ'লে গান ছেড়ে অন্য কোনও পেশা নিতে হয়। কারণ বাঁচাটা যে দরকার এ সম্বন্ধে বোধ হয় জগতে বড় বেশি মতভেদ নেই—এক বৌদ্ধদের মধ্যে ছাড়া।" শেষ কথাটি বলার সময় তিনি একটু মৃদু হাস্‌লেন।

মিসেস টমাস এ নিহিত ব্যঙ্গে আপত্তি ক'রে বল্‌লেন : "বৌদ্ধরা কি তাই বলে ?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন, "আমি অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দু চারখানি মাত্র বই পড়েছি ও তাই এ বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে কিছু বল্‌তে পারি না। তবে আমার যা মনে হয়েছে তাতে নির্ব্বাণ মানে আমি ত বুঝেছি annihilation বা শূন্যবাদ। কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক নীতি ব্যবস্থা আমার কাছে আদর্শস্থানীয় মনে হলেও তার মধ্যে সুসঙ্গতি আমি একেবারেই দেখ্‌তে পাই না। কেন না যদি জীবনে শূন্যবাদই চরম সত্য হয় তবে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার প্রয়োজন ত বুঝি না। জীবন অশেষ দুঃখের আকর হ'তে পারে; কিন্তু শূন্যবাদ ত অসহনীয়ও অতীত ও সুতরাং 'নাস্তি'! তবু যদি 'নাস্তি'কেই চরম সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়—যদিও সেটা অযৌক্তিক—তা'হলে সুখ দুঃখ অশ্রু হাসি মাখা জীবনও কি তার চেয়ে কাম্য নয়? এক কথায় বৌদ্ধদের মর্ম্মকথা 'বাঁচা কেবল মরার জন্য'; অথচ এ নীতিতে এক নিতান্ত cynic ছাড়া বোধ হয় আর কেউ সাড়া দেবে না।"

মিসেস টমাস বল্‌লেন : "কিন্তু আর্চিবল্‌ড্, এ রকম নীতি কি কোনও ধর্ম্মের ভিত্তি হ'তে পারে!"

উত্তরে মিষ্টার টমাস কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌ল : "মাপ করবেন মিষ্টার টমাস, আমার বোধ হয় এ সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা মূলতঃ ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ যদিও আমি নিজে আজ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পড়িনি, তবু আমি আমার এক সুপণ্ডিত পিতৃবন্ধুর মুখে শুনেছিলাম যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্তের ভিতরকার কথা একই।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন "তা হ'তে পারে অবশ্য। আর আমার এখন মনে হচ্ছে যে, আমি সেদিন হঠাৎ তোমাদের দার্শনিক অরবিন্দের 'আর্য্যে' যোগবাদ সম্বন্ধে এই রকমই একটা কথা পড়ছিলাম বটে যে সমাধি ও নির্ব্বাণ একই উপলব্ধি।* তবে যেহেতু এ দুটোর একটারও সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে ওঠেনি, তাই এ বিষয়ে কিছু

* "Even the sense of being may disappear in an experience in which the word existence loses its sense and the Buddhistic symbol of Nirvana seems alone and sovereignly justified."

Essay on Samadhi.....Synthesis of Yoga.

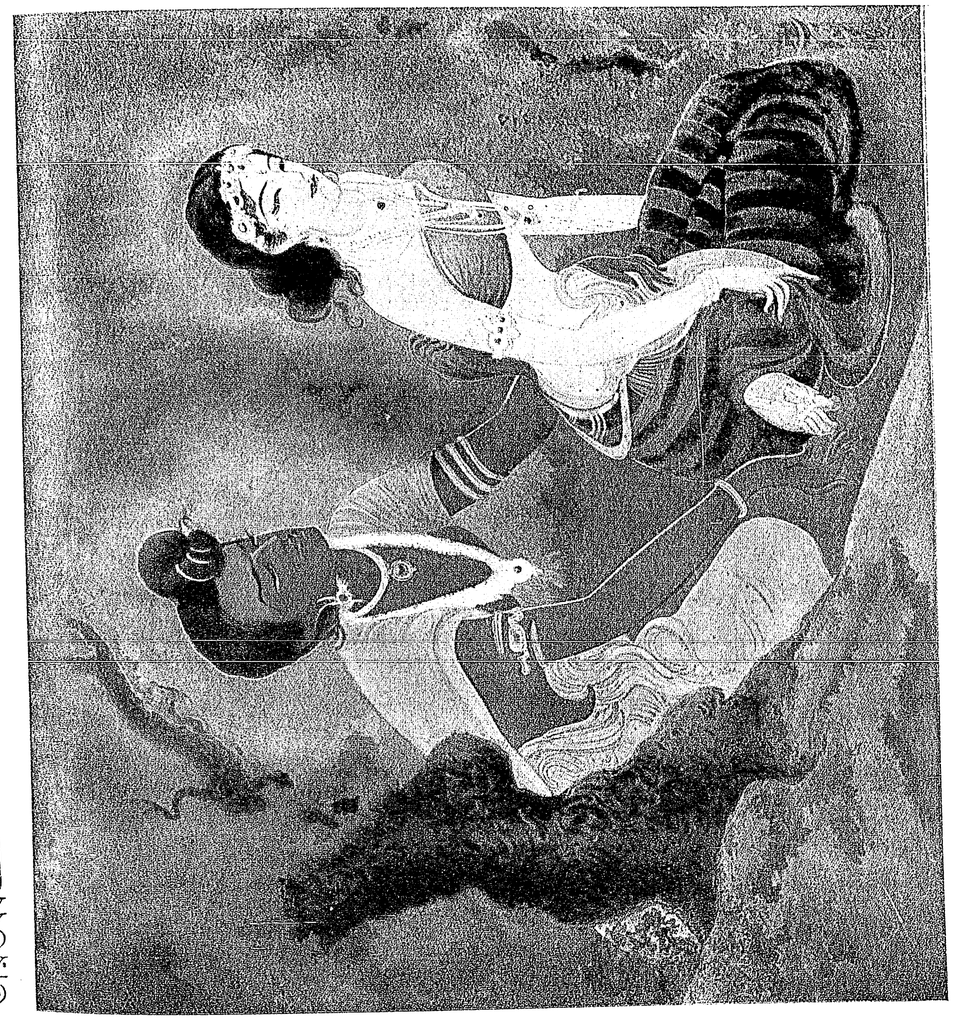

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকিশোর চট্টোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

না বলাই ভাল। কেবল একটা কথা ব'লে রাখি যে, বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আমি যা অল্পস্বল্প পড়েছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে, বেদান্ত একটা মস্ত দর্শন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে রাখি যে, বেদান্তের মায়াবাদে আমাদের মন একেবারেই সাড়া দেয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বেদান্তের আমি ভক্ত, তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ, বেদান্তের মূল প্রতীতিগুলির মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন, অযৌক্তিকতা কিছু নেই। দ্বিতীয় কারণ, তার মধ্যে আর যারই অভাব থাকুক না কেন, কল্পনার বিরাটত্বের অভাব নেই।"

মিসেস টমাস বল্‌লেন: "কিন্তু কাণ্ট, হেগেল—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "তাদের চেয়ে বেদান্তকে আমি দর্শন হিসেবে অনেক বড় মনে করি। জান বাকৃচি, তোমাদের দর্শনের মধ্যে একটা গুণ আমার বড় ভাল লাগে। সেটা এই যে তোমাদের দর্শন কাণ্ট হেগেল প্রমুখ অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের দর্শনের মতন উড়ো আইডিয়ার সমষ্টি মাত্র নয়।"

মিসেস টমাস প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে এরূপ তুলনায় ও য়ুরোপীয় দর্শনের প্রতি কটাক্ষে আবার ঈষৎ আহত হয়ে আপত্তি করলেন: "তার মানে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "তার মানে ভারতীয় দর্শনের গভীরতম ধারণার উপলব্ধিরও একটা পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের দর্শনে abstract আইডিয়া আছে; কিন্তু সেগুলোর প্রভাব যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে কাজ করা দরকার এ কথা আমরা জানিই না।"

পল্লব বল্‌ল: "কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না মিষ্টার টমাস।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "এ কথা আমার এক জৈন দার্শনিক বন্ধু এক দিন আমাকে বলেছিলেন, যদিও তখন আমিও ঠিক্ কথাটা ধরতে পারিনি। কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে বোধ হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শনের মনোরাজ্যে উপলব্ধির নানান্ স্তর আছে। এবং পর পর এ সব স্তরে আরোহণ করার পদ্ধতিও ভারতীয় দর্শনে নির্দ্দিষ্ট আছে।"

মিসেস টমাস বল্‌লেন "কিন্তু কাণ্ট—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন, "Categorical Imperatives বল্‌ছ ত? হাঁ, সেটা আছে বটে, তবে সে সব নীতি অনুসারে কোনও য়ুরোপীয়কে কি জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে দেখা যায়? য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনও কম বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে হয় খৃষ্টের মতন দু একজন নীতিবাদীর নীতিসূত্র দ্বারা, না হয় বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কারের দ্বারা;—দার্শনিকের তত্ত্বকথা দ্বারা নয়। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের জীবনে দর্শনের প্রভাব বড়ই কম। সুতরাং আমাদের সভ্যতায় দর্শন জীবন্ত হ'য়ে উঠবার সুযোগও পায় নি। কিন্তু ভারতে যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি নানান্ সাধন-পদ্ধতির কথা আমার সেই দার্শনিক জৈন বন্ধুটির কাছে শুনে আমার মনে হ'ত যে, দর্শন শাস্ত্র জীবন্ত বোধ হয় এক ভারতবর্ষে।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু শুনেছি গ্রীক দার্শনিকগণ—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "Neo-Platonistরা? হাঁ, য়ুরোপে যদি কেউ জীবন্ত দর্শন ভেবে থাকে, তবে তাঁরাই হচ্ছেন একমাত্র সম্প্রদায়। তবে তাঁরাও তাঁদের দর্শনের জন্য বোধ হয় ভারতের কাছেই প্রধানতঃ ঋণী। এ কথা শুধু যে আমার জৈন দার্শনিক বন্ধু বল্‌তেন তাই নয়, এ কথার একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, গ্রীক সভ্যতার বহির্মুখ দিকটা য়ুরোপের সভ্যতার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কর্‌লেও, তার অন্তর্মুখীনতা—যেমন প্লেটো বা neo-platonistদের আইডিয়া—রোমক সভ্যতার সময় থেকেই য়ুরোপ বর্জ্জন করে এসেছে।"

পল্লবের এ কথাগুলি ভারি ভাল লাগ্‌ল। সে এর আগে কখনও এমন কোনও ইংরাজের মুখে ভারতের অন্তর্মুখীনতার সম্বন্ধে এমন গভীর শ্রদ্ধার কথা শোনে নি। সঙ্গে সঙ্গে তার হঠাৎ একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'ল এই ভেবে যে, মিষ্টার টমাসের মতন স্ফূর্ত্তি, রসিকতা, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি প্রাণশক্তিময় লোকও মনে মনে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে এতটা ভেবে থাক্‌তে পারেন!

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবতা বিরাজ কর্‌ল। কারণ পল্লবও এ কথার উত্তরে কি বলা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না, মিসেস টমাসও না। কি ভেবে মিসেস টমাস হঠাৎ কথাবার্ত্তার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য বল্‌লেন:

"কিন্তু আর্চিবল্‌ড্—মিষ্টার বাকৃচির আসল প্রশ্নের উত্তর যে তোমার এ সব অবান্তর প্রসঙ্গে একেবারে চাপা পড়ে গেল!"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে বল্‌লেন: "ঠিক্ ঠিক্। তবে জানই ত আইরিণ, তর্ক করতে গেলেই এরকম ধান ভান্‌তে শিবের গীত এসে পড়ে। হাঁ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ ওঠ্‌বার ঠিক্ আগেই আমি কি যেন বল্‌ছিলাম?—"

মিসেস টমাস বল্‌লেন: "বাঁচার ইতিকর্ত্তব্যতার কথা—"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "হাঁ হাঁ ঠিক্। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে বাঁচাটা মোটের ওপর সুবুদ্ধিরই কাজ। সুতরাং বাঁচার ব্যবস্থা করাটাও যে কম সুবুদ্ধির কাজ নয়, এ কথা বোধ হয় তর্কশাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে? কি বল? কিন্তু একটা কথা আমাকে আগে ঠিক্ করে বল বাকৃচি। তোমাদের দেশে কি সঙ্গীতকারের জীবিকা-উপার্জ্জন করা একেবারেই অসম্ভব?"

পল্লব বল্‌ল: "হাঁ, এক পেশাদার গাইয়ে বা বাইজীদের পক্ষে ছাড়া।"

মিসেস টমাস আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন: "তাই নাকি!"

পল্লব বল্‌ল: "হাঁ মিসেস টমাস। আমাদের দেশে সঙ্গীতকলা অশিক্ষিত অসচ্চরিত্র পেশাদার ও বাইজীদের হাতে পড়ার দরুণ সঙ্গীত দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা আজ এত হেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কাজে কাজেই ভদ্রলোকের পক্ষে আমাদের দেশে গান গেয়ে টাকা রোজগার করা মহা কলঙ্কের কথা। তাছাড়া আমাদের দেশ গরীবও বটে। তাই গান শুনে টাকা দেবার লোক বড় বেশি নেই।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "দেশ গরীব ব'লেই যে তোমাদের দেশে গান গেয়ে টাকা রোজগার অসম্ভব তা নয় বাকৃচি। কারণ, ভেবে দেখ, তোমাদের ধনী ও মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে কি ঘোড়দৌড়ের book-makerরা কম টাকা উপায় করে? এবং সম্ভবতঃ তাঁরা অন্য নানারকম বাজে খরচও ক'রে থাকেন। আমার মনে হয় আসল কথা হচ্ছে দাম দেওয়া নিয়ে। তোমাদের দেশের ধনীরা বা সঙ্গতিপন্নেরা গান প্রভৃতি শিল্পের দাম দিতে শেখে নি; শিখেছে হয়ত—ঘোড়দৌড়ে বাজি ফেলার বা বাগানবাড়ীতে ফর্ত্তি, আড়ম্বর প্রভৃতি করার দাম দিতে। তাছাড়া দেখ না কেন, বিগত মহাযুদ্ধে তোমাদের দেশের লোকে কি কম চাঁদা ও ধার দিয়েছে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে, আমরা যুদ্ধে, চাঁদা দেওয়ায় ও বাজি ফেলায়ও অর্থ-ব্যয় করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও অর্থব্যয় করি। তোমরা কেবল বাজি ফেলায় কর।"

পল্লব একটু ভেবে বল্‌ল: "বোধ হয় কথাটা সত্য। কিন্তু রোগের নিদান ত হ'ল। এখন অষুধ?"

মিষ্টার টমাস খানিক চুপ করে রইলেন। একটু পরে চিন্তাকুল ভাবে বল্‌লেন: "আমার মনে হয় তোমাদের দেশেও ক্রমে হাওয়া ফিরে যাবে ও আমাদের দেশের মতন অবস্থা হবে। ও তখন গান করে টাকা রোজগার করাটা ডাক্তারী বা ওকালতি ক'রে অর্থোপার্জ্জন করার মতনই ভদ্র পেশা ব'লে গণ্য হবে।"

পল্লব সন্দিগ্ধ ভাবে বল্‌ল: "তা কি হবে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "আমার বোধ হয় হবে। কারণ একটু ভেবে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, আমাদের দেশে চার পাঁচশ বছর আগে ললিতকলার যে অবস্থা ছিল আজ তোমাদের দেশের অবস্থা অনেকটা সেই রকম। তাই আমার বোধ হয় যে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার সঙ্গে তোমাদের দেশের অবস্থার ভেদ—মূলগত বা প্রকৃতিগত নয়, সময়গত মাত্র।"

পল্লব সবিস্ময়ে বল্‌ল: "কি রকম?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "জান বোধ হয় যে বিখ্যাত মাইকেল এঞ্জেলোর পিতা তাকে ধরে মারতেন যখন তিনি ভাস্কর হবার জন্য প্রথম বায়না ধরেছিলেন?"

পল্লব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল: "সে কি!"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "অর্থাৎ তখনকার দিনে আমাদের য়ুরোপে শিল্পী তেম্‌নিই সমাদৃত হ'ত আজকের দিনে তোমাদের দেশে সঙ্গীতকার যেমন অবজ্ঞাত। মাইকেল এঞ্জেলোর পিতা বল্‌তেন, 'আমার উচ্চ বংশে কি না শেষে শিল্পচর্চ্চা!' কিন্তু আজ য়ুরোপে শিল্পের প্রতিপত্তি কতখানি একবার ভেবে দেখ দেখি! আজ য়ুরোপে কারুসো, শালিয়াপিন, ক্রাইস্‌লার, পাদরিউস্কি প্রভৃতি গায়ক বাদকদের সম্মান সত্যি বড় বড় রাজারাজড়ার চেয়েও কম নয়। এমন কি এ কথা বল্‌লেও বোধ হয় বেশি বলা হবে না যে, আজ যদি বিধাতা হঠাৎ এসে কোনও সাধারণ যুবককে জিজ্ঞাসা করেন, সে কারুসো হবে, না স্পেনের রাজা হবে, তাহ'লে বোধ হয় সে কারুসো হবারই বর প্রার্থনা করবে।"

কথাগুলি পল্লবের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত কর্‌ল। তবু সে বল্‌ল: "কিন্তু আপনি আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দিলেন না মিষ্টার টমাস। আমার অনেক দিন থেকে মনে হয়েছে যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করাটা একটা বড় জিনিষ, যেহেতু টাকা নইলে সংসারে কোনও বড় হিতকর অনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। অথচ গান বেছে নিলে অর্থোপার্জ্জনের আশা ছেড়ে দিতেই হয়, কারণ ত বলেইছি যে গানে আমাদের দেশে অর্থোপার্জ্জন সম্ভব নয়।"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "হাঁ—হাঁ। তুমি এ প্রশ্নটা করেছিলে বটে। কিন্তু আমিও বোধ হয় বলেছিলাম যে এ সমস্যার সমাধান তোমার নিজের মনের কাছে খুঁজলেই পাবে। তবে তুমি যখন এ বিষয়ে আমার মতামত জান্‌তে চেয়েছ, তখন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি এসো। প্রথমতঃ দেখ, বেশি অর্থোপার্জ্জন করা জগতের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘট্‌তে পারে। অর্থাৎ মানুষের উৎপাদিকা শক্তির এখনও এত বৃদ্ধি হয় নি, যাতে ক'রে শতকরা দু একজনের বেশি লোক প্রচুর অর্থশালী হ'তে পারে। তার পর আর একটা কথা ভেবে দেখ। যদি বেশি অর্থ রোজগার করতে হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছাড়া গতি নেই। অথচ এ উপায়ে যত লোককে অল্প মাইনেতে বিপর্য্যয় রকম খাটাতে হয়, তাতে সমাজে দুঃখ কষ্টের ও অত্যাচারের বড় কম প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।"

পল্লব বল্‌ল: "কি রকম!"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "কাপিটালিস্‌মের বিরুদ্ধে সোশ্যালিষ্টদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থপিপাসু লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে রাতদিন পশুর মতন খেটে পশু হ'য়ে যেতে হয়। তাই তাঁরা বলেন যে, কাপিটালিষ্টদের অত্যাচারে ও চাপে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যহ মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এ শোচনীয় দৃশ্য দেখে সত্যই কবির ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছে হয় না কি What man has made of man? অর্থাৎ এক কথায় সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, বেশি অর্থ রোজগার করতে হ'লেই যখন বর্ত্তমান সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় বিস্তর লোককে পদদলিত করে রাখতে হয়, তখন ব্যক্তিগত জীবনে কি উপার্জ্জিত অর্থ থেকে কিছু দান করলেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে? দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলা যেতে পারে যে লক্ষপতি হ'তে হলে যত লোকের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করতে হয়, লক্ষপতি হয়ে বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান কর্‌লেও কি সে পাপের প্রতিবিধান হয়?"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু এ কথা মূলতঃ খাটে কাপিটালিষ্টদের সম্পর্কে। অথচ সংসারে ঢের লোক ত কাপিটালিস্‌ম ছাড়াও অন্য উপায়ে টাকা রোজগার করছে!"

মিষ্টার টমাস হেসে বল্‌লেন: "আমিও এক সময়ে তাই ভাব্‌তাম বাকৃচি। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, যে কোনও উপায়ে বেশি টাকা রোজগার করা যায় প্রায় সে সবেরই মূলে কাপিটালিস্‌মের প্রকাশ্য বা উহ্য উৎপীড়ন নিহিত আছে।"

মিসেস টমাস তাঁর উলবোনা রেখে মুখ তুলে সবিস্ময়ে বল্‌লেন: "এ কথা ঠিক্ বুঝতে পারলাম না আচিবল্‌ড্। যে লণ্ডনে আট দশখানা বাড়ী ক'রে ধনী হয় তার পক্ষে, বা যে বই লিখে অর্থশালী হয় তার পক্ষে এ কথা কেমন ক'রে খাট্‌তে পারে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "এ কথার উত্তর প্রিন্স ক্রপটকিন তাঁর Conquest of bread বইখানিতে বড় চমৎকার দিয়েছেন। আমরা একটু তলিয়ে ভেবে দেখি না ব'লেই এ বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হ'য়ে উঠ্‌তে পারি না!"

পল্লব বল্‌ল: "যথা?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "যথা?—আচ্ছা যেটা আমরা আজকাল অর্থার্জ্জনের একটা খুব প্রশস্য পন্থা মনে করি সেইটেই নেওয়া যাক্। ধর বই লিখে টাকা করা। প্রিন্স ক্রপটকিন দেখিয়েছেন যে ছাপাখানার লোকেরা লেখকের বইয়ের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে অতি সামান্য পারিশ্রমিক নেয় ব'লেই তাঁর বই বিক্রি ক'রে বেশি লাভ হওয়া সম্ভব হয়। অথচ তারা কখনই লেখকের টাকা

সরবরাহ করার জন্য এ হাড়ভাঙা পরিশ্রম কর্‌তে রাজি হ'ত না যদি তাদের প্রাণ ধারণের জন্য এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাক্‌ত। রাইডার হ্যাগার্ড She লিখে যে রাতারাতি বড়মানুষ হ'য়ে গেলেন সেটা কি She যারা ছেপেছিল তারা তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জন্য অতি সামান্য পারিশ্রমিক না নিলে সম্ভব হ'ত? যাঁরা লণ্ডনের মত বড় বড় সহরে বাড়ী ভাড়া দিয়ে বড়মানুষ, তাঁদের ধন সম্বন্ধেও ঐ কথা। অর্থাৎ যদি মজুরদের পর্য্যাপ্ত পরিশ্রমে পর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন সম্ভব হ'ত, তাহলে তারা অত্যন্ত কম টাকার জন্য দিন্‌রাত খেটে বাড়ীওয়ালার বিলাসের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতে রাজি হ'ত না। প্রিন্স ক্রপটকিন এরূপ নানান উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কাপিটালিস্‌মের রাজত্বে প্রায় কোনও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দুর্ব্বল ও অজ্ঞান শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার না ক'রেই পারেন না।"

পল্লবের কাণে কথাটা সম্পূর্ণ নূতন ঠেক্‌ল। সে তার এক প্রিয় রুষ লেখকের লেখায় একবার পড়েছিল যে, সংসারে যেখানে যা কিছু অত্যাচার বা উৎপীড়ন হয়, তার জন্য আমরা স্বীকার করি বা না করি প্রত্যেকেই দায়ী।* তখন সে কথাটার সদর্থ সে ঠিক্ পরিগ্রহ কর্‌তে পারে নি। আজ যেন তার মনে সে সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর জ্ঞানগর্ভ বাণীর মর্ম্মার্থ বিদ্যুতের মতন চকিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌ল।

সে একটু চিন্তিতভাবে বল্‌ল "কথাটা এভাবে আমার কখনও মনে হয় নি মিষ্টার টমাস্।"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে বল্‌লেন: "তার জন্য কুণ্ঠিত বোধ করবার কারণ নেই বাক্‌চি। তুমি ত ছেলে-মানুষ। শতকরা নিরানব্বই জন জ্ঞানবৃদ্ধ প্রৌঢ়রাও মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বের গুরুতর দিক্‌টা এভাবে ভেবে দেখ্‌বার সময় পান না বা পেতেও চান না। যদি চাইতেন তাহ'লে সমাজ-সংস্কার ঢের সহজ হ'ত। মানুষের হৃদয়ে কল্পনার ধারা অতি ক্ষীণস্রোত ব'লেই জগতে দুঃখ কষ্ট আজ এত বেশি।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু দানের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের ছোট-বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি না-ও হয়, তাহ'লেও দানের দ্বারা যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় সেটাকে ত ছোট করে দেখা চলে না!"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "তা সত্য। কিন্তু এ বিষয়েও একটা বড় রকমের 'কিন্তু' আছে। অর্থাৎ দানের মধ্যে একটা পবিত্র আত্মপ্রসাদের সার্থকতা মিল্‌তে পারে 'যদি' সেটা যথার্থ দান হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে এ 'যদি'র প্রতি বড় একটা কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। যীশুখৃষ্টের নীতি অনুসারে কটা লোক দান করে বল ত? অর্থাৎ কটা লোক দানের সময় 'বাঁ হাত ডান হাতের দান টের পাবে না' নীতি মেনে চলে বল ত! এ কথা বল্‌লে কি বেশি বলা হবে যে অধিকাংশ লোকই এ নীতি স্বীকার করা দূরে থাকুক নিজেদের তিলপ্রমাণ দানকে লোকের কাছে তালপ্রমাণ প্রতীয়মান কর্‌তেই বেশি সচেষ্ট হ'য়ে থাকে?"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু তবু এতে খানিকটা চিত্তশুদ্ধি ত হয়! অন্ততঃ আমাদের শাস্ত্রে ত তাই বলে। প্রথম থেকেই নিষ্কাম ভাবে কটা লোকে দান করতে শেখে?"

মিষ্টার টমাস বল্‌লেন: "এ কথা আমি মানি। তবে শেষটায় চিত্তশুদ্ধি ও আত্মপ্রসাদের ওপরই যখন এতটা জোর দিতে চাচ্ছ তখনই দেখ বাক্‌চি, যে, তোমার অজ্ঞাতে তুমি গোড়ার কথায় এসে পড়েছ। এতক্ষণ তুমি জগতের হিতসাধন করা প্রভৃতি বড় বড় কথা বল্‌ছিলে—কিছু মনে কোরো না বাক্‌চি—অনেকটা আমেরিকান পাদ্রীর মতন। আমার মনে হয় আসল কথা হচ্ছে ঐ ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির কথা। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে সব জিনিষেরই মত এটাও স্পষ্টভাবে চাওয়া দরকার, নইলে পাওয়া যায় না। খৃষ্ট একটা বড় মস্ত কথা বলেছেন যেটা আমার মনে হয় জগতে একটা চিরন্তন সত্য। সে কথাটা হচ্ছে 'খোঁজ, তাহ'লেই পাবে; চাও তাহ'লেই তোমাকে দেওয়া হবে; দুয়ারে আঘাত কর, তাহ'লেই দুয়ার খুল্‌বে।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু আমার আসল প্রশ্নের—"

মিষ্টার টমাস বাধা দিয়ে বল্‌লেন: "—উত্তর এরই মধ্যে মিল্‌বে। কারণ আসলে প্রত্যেকেরই উপলব্ধি নির্ভর করে তার আন্তরিক চাওয়ার ওপর। তাই আসল সমস্যা দাঁড়াচ্ছে—তুমি কি চাও!—যদি নাম করতে চাও ও কয়েক বৎসরের জন্য একটা ক্ষণভঙ্গুর হৈ-চৈ করে যেতে চাও তবে মনে প্রাণে সাংসারিক হও, উচিত অনুচিতের চুলচেরা বিচার নিয়ে সময় নষ্ট কর্‌তে যেয়ো না ও দরকার হ'লে কুটিল পথের আশ্রয় নিও। কেবল এইটুকু জেনো যে তাতে শেষরক্ষা হবে না ও কোনও গভীর পরিতৃপ্তির স্বাদ মিল্‌বার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে যদি এ রকম ক্ষণস্থায়ী দেহ-সুখের ও তরল অহমিকার চরিতার্থতা না চাও, যদি কোনও বড় সার্থকতার আস্বাদ পেতে চাও, এক কথায় যদি জীবনে কোনও গভীর উপলব্ধির রসধারা আকণ্ঠ পান কর্‌তে চাও—তা'হলে—তাহ'লে—কিছু মনে কোরো না বাক্‌চি—তাহ'লে অগভীর আদর্শবাদের মোহে পড়ে নিজের গভীর প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যেয়ে না। কারণ—" ব'লে তিনি একটু থেমে গাঢ়স্বরে বল্‌লেন: "কারণ—জগতের হিতসাধন প্রভৃতি বড় বড় কথার মোহে প'ড়ে আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হই বাক্‌চি। এটা আমার কথার কথা মনে কোরো না—আমার নিজের জীবনে ঠিক্ এ ট্রাজিডিটা হয়েছে বলেই আমি তোমাকে এ কথা এত জোর ক'রে বল্‌তে সাহসী হচ্ছি।"

এ কথা ব'লেই তিনি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লেন: "তবে আমার কথা থাক্। আমার মোট কথাটি এই যে, তোমার ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ মানে এই যে, তোমার পক্ষে সঙ্গীত ছেড়ে বেশি অর্থ বা সস্তা যশের জন্য আইন বা এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাওয়া বোধ হয় আত্মহত্যারই সামিল হবে। অন্ততঃ তোমাকে আমি যতটুকু জানি তাতে আমার ত তাই মনে হয়। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা তার প্রতি রক্তকণা দিয়ে যা কামনা করে মানুষ জোর্ করলেই তার কণ্ঠরোধ কর্‌তে পারে না। তবু আমাদের অহমিকা আমাদের চোখ ঠেরে বোঝাতে চেষ্টা পায় যে এটা পারা যায়। কিন্তু সে স্তোকবাক্যে ভুল্‌লে আখেরে আমাদের জীবন এক বিরাট্ ব্যর্থতায় ভ'রে না উঠেই পারে না।"

পল্লবের মনটা এ কথাগুলি শুনে কেমন যেন পরস্পর বিরোধী অস্পষ্ট ভাবে ভ'রে উঠ্‌ল। তার মনে এ রকম একটা ধারণা গত কয়মাস প্রায়ই আনাগোনা কর্‌ত। তবে সে এরূপ ধারণাকে স্বার্থ-প্রণোদিত মনে করে বড় একটা আমল দিত না। তাই আজ মিষ্টার টমাসের কথাগুলি শুনে তার মনটি একদিকে যেমন সায়ও দিল, অপরদিকে তেম্‌নি বিদ্রোহও করে বস্‌তে চাইল। সে বল্‌ল: "কিন্তু, মিষ্টার টমাস! মানুষের নিজের হৃদয় যা চায় তারই পেছনে ছোটাটা ত একটা মস্ত আদর্শ হ'তে পারে না। কারণ এটা কি নিতান্ত স্বার্থপরের মতনই কথা হ'ল না!"

মিষ্টার টমাস একটু হেসে তখনই আবার গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন: "তোমার এ ইতস্ততঃ করাটা তোমার অন্তরের একটা ভাল প্রবণতারই পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার ক'রে দেখ্‌তে গেলে কি আমরা দেখ্‌তে পাই না যে, সংসারে ছোট জিনিষও যেমন স্বার্থকেন্দ্র, বড় জিনিষও তাই? কথাটা ভুল বুঝো না। কারণ এ দুই ক্ষেত্রে স্বার্থের প্রকৃতি যে একরকম, তা অবশ্য আমি বল্‌ছি না। আমি বল্‌তে চাই কেবল এই কথা যে, মানুষের ছোট আদর্শ যেমন তার স্বার্থ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, বড় আদর্শও তেম্‌নি উদারতর স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বড় স্বার্থ তার সার্থকতায় অন্য পাঁচজনকেও কমবেশি সার্থক ক'রে তোলে, যেখানে ছোট স্বার্থ তার পরিসরের সঙ্কীর্ণতার দরুণ এরূপ কোনও গভীর আনন্দের পরশ পায় না। এ কথা জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে খাটে ব'লেই আমার মনে হয়, যদিও উপর-উপর দেখ্‌লে এটা হয়ত ঠিক্ প্রতীয়মান হয় না। যেমন দেখ, আমরা অনেক সময়েই ভুল ক'রে বলি যে, বুদ্ধ পাঁচজনের দুঃখশোকের দৃশ্যে অশান্ত হ'য়ে রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আসল কথাটা কি এই নয় যে বুদ্ধ বিলাসের মধ্যেও মানুষের দুঃখজ্বালার দৃশ্যে কোনও গভীর সান্ত্বনার অমৃতস্পর্শ পাচ্ছিলেন না বলেই সেটা খুঁজতে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন? না, না বাক্‌চি, স্বার্থ জিনিষটা খারাপ নয়—স্বার্থের ধারণাকে সঙ্কীর্ণ করাটাই অকর্ত্তব্য। কারণ সংসারে সব বড় উপলব্ধির ধর্ম্মই এই যে আত্মোৎকর্ষ-রূপ স্বার্থ তার প্রেরণা হ'লেও সে তার দানের গরিমায় পাঁচজনের মনের ওপরেও কমবেশি প্রভাব বিস্তার না ক'রেই পারে না। সঙ্গীত সম্বন্ধেও এ কথা সমান খাটে। Beethoven তাঁর Moonlight Sonata বা Ninth Symphony রচনা করেছিলেন অবশ্য মূলতঃ তাঁর সৃষ্টির প্রেরণায়। তাই এ প্রেরণার উৎস যে প্রকাশের প্রবৃত্তি চরিতার্থতারূপ স্বার্থ, সে কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে জীবনের

* Brothers Karamazov..... Dostoievski.

মধ্যে একটা গভীর মিলের সুর আছে বলে Beethovenএর অনুপম সঙ্গীত সৃষ্টিতে শুধু তাঁর স্বার্থের সার্থকতাই মেলে নি, তাতে মানুষ একটা অভিনব রস-নির্ঝরের সন্ধানও পেয়েছে। জীবনে অশেষ দুঃখ দৈন্যের মাঝখানে এ মিলের সুরের রেশটি আমার কাছে পরম ও পবিত্র মনে হয়। তাই আমি কিছুতেই মনে কর্‌তে পারি না যে Beethovenএর সঙ্গীতচর্চ্চা ছেড়ে ব্যবসা করে লাখ দুই চার টাকা দেশের হিতের জন্য দান করাই কর্ত্তব্য ছিল।"

পল্লবের তখনকার প্রশ্নসঙ্কুল মনে মিষ্টার টমাসের গভীর কথাগুলি একটা অনপনেয় ছাপ অঙ্কিত ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। কারণ চিন্তাশীল টমাস সাহেবের আন্তরিক কথাগুলি তার কাছে অনেকটা আকুল তৃষার্ত্তের সাম্‌নে বারির মতই মনে হ'য়েছিল।...সেদিন রাত্রে শুয়ে তার চোখে ঘুম আর আস্‌ছিল না।

সম্প্রতি একজন বড় মার্কিন দার্শনিকের কোনও প্রবন্ধে একটা কথা সে বুঝতে পারে নি। তিনি ব'লেছিলেন যে প্রতি মানুষই সমগ্র বিশ্বজগৎকে মাত্র নিজের বিকাশের খোরাক হিসেবে গণ্য কর্‌তে পারে। আজ যেন সে হঠাৎ এ গভীর কথাটির মর্ম্মস্থল অবধি দেখ্‌তে পেল।...সত্যিই ত। পরহিত, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, সমাজ স্থাপন এ সবই ত মানুষ ক'রেছে মূলতঃ নিজেরই জন্য।...কেবল আমরা দেখ্‌তে জানি না ব'লেই এ রকম গভীর সত্যকে স্বার্থের চশ্‌মার মধ্য দিয়ে বিকৃত ক'রে দেখি।...সঙ্গে সঙ্গে তার কাণে ক্রমাগতই মিষ্টার টমাসের কথাগুলি বাজছিল যে হৃদয়কে উপবাসী রাখ্‌লে দেশের বেশি হিতসাধন করা যায়, এর চেয়ে ভুল ধারণা আর হ'তে পারে না। তার মনে হ'ল যে ঠিক্ কথা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সব বড় উপলব্ধিই একদিন না একদিন তার লাভ-লোকসানের খাতায় লাভের পাতায় অঙ্কপাত করে ব'লে আমরা সে সব উপলব্ধির মূল্য দেই। তাছাড়া তার ক্রমাগতই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, শিল্পকলার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও বড় সত্য ও উদার সার্থকতা আছে। কারণ তা যদি না থাক্‌ত তাহ'লে কেনই বা মানুষ সৃষ্টির আদিম কাল হ'তে অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শিল্পের মধ্য দিয়ে নিজের সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকেই বারবার মূর্ত্ত ক'রে তুল্‌বার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে এসেছে?

তবে সব চেয়ে বড় যুক্তি সে ক্রমশঃ পাচ্ছিল—তার হৃদয়ের কাছ থেকে, যা টমাস সাহেব বলেছিলেন যে সে পাবেই পাবে।...তার ক্রমেই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে হৃদয়ের এই রঙীন কামনা ও দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা মস্ত সার্থকতা না থাক্‌লে বিধাতা কখনই তার মধ্যে এ গভীর শিল্পানুরাগ এমন গভীরভাবে বপন কর্‌তেন না।...

তার ক্রমশঃই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে তার কর্ত্তব্য মিষ্টার টমাস ঠিকই নির্ণয় করে দিয়েছেন। সঙ্গীত ছেড়ে অন্য কোনও পেশা নিলে সে সুখী হবে না।...সঙ্গীতের চর্চ্চায়ই তার জীবনের একটা সত্য সার্থকতা লাভ হবে, এ বিশ্বাস তার মনে উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।...কিন্তু তবু লোকমতের ভয়?...পল্লব ক্রমশঃই বুঝতে আরম্ভ কর্‌ল মানুষের হৃদয়ে লোকমতের কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! সে অবশ্য তার মনের সবল মুহূর্ত্তে সহজেই কৃতনিশ্চয় হ'য়ে উঠ্‌ত যে লোকমতকে সে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তার কাছে যেন তার সবল মুহূর্ত্তের প্রতিচ্ছবি অপরিচিত ব'লে মনে হ'ত। কারণ সে সময়ে কোথায়ই বা থাক্‌ত তার উদ্ধতফণা বিদ্রোহের ভাব, আর কোথায়ই বা থাক্‌ত তার নিশ্চিন্ত কৃতনিশ্চয়তার আত্মবিশ্বাস!...সে যে আত্মীয়-বন্ধুর আপত্তি ও অসার লোকনিন্দা কল্পনা ক'রেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌ত! তবে?... কল্পনায়ই যে সম্ভাবনার সাম্‌নে সে মাথা নীচু করতে বাধ্য হচ্ছে, বাস্তবে সে প্রভাব কি তাকে একেবারে নিষ্পিষ্ট ক'রে দেবে না?

সে সেদিনকার আলোচনার পর থেকে আর নিয়মিত পিয়ানো বাজাবার বা বই পড়বার ইচ্ছাও নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেত না। যেন কিছুতেই তার মন বসে না।... সে নানা যায়গায় বেড়াতে যেত, মিষ্টার টমাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্পালাপ কর্‌ত, মিসেস টমাসের সঙ্গে বেড়াতে যেত...এক কথায় সবই কর্‌ত...তবু...যেন এ সবের মধ্যে সে আর কোনও রস খুঁজে পেত না।... এতটা বিচিত্র বিস্বাদরসে তার সমগ্র মনটি ভ'রে উঠ্‌ল।...

এমন সময়ে একদিন মিষ্টার টমাসের সঙ্গে সে Oscar Wildeএর বিখ্যাত Lady Windermere's Fan নাটকটি দেখ্‌তে গেল। নাটকটি তার মনে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুল্‌ল। বিশেষতঃ নাটকের শেষ অঙ্কে

নায়কের উচ্ছ্বসিত আবেদন তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল যেখানে নায়ক তাঁর প্রণয়িনীকে বল্‌ছেন: "তুমি যদি আমাকে সত্য ভালবাস তবে স্বামীত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো। তবে আমি একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখ্‌তে চাই। আমি তোমাকে এ স্তোকবাক্যে ভোলাতে চাই না যে এজন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেওয়ায় কিছু যায় আসে না। সমাজের মতামতে যায় আসে—খুবই যায় আসে। তবে তা সত্ত্বেও আমি বল্‌ব যে মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন সে এরূপ গভীর কলঙ্ককেও বহন কর্‌তে সঙ্কুচিত ত হয়ই না, বরং তাকে বরণ করতেই আকুল হ'য়ে ওঠে। কারণ তখন সে বোঝে যে সমাজের জন্য যন্ত্রপুত্তলীর মতন জীবন যাপন করা এক জিনিষ—যার নাম ভণ্ডামি—আর যথার্থ 'বাঁচা' আর এক জিনিষ,—যার নাম সার্থকতা।"

এ কথাটি সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের সূত্রে বলা হ'লেও, এবং নারীর কুলত্যাগিনী হওয়ার সপক্ষে প্রযুক্ত হ'লেও পল্লব এ কথাগুলির মধ্যে যেন একটা বড় সত্যের আভাষ পেল। অথচ এ কথা স্বীকার কর্‌তেও তার মনে কেমন যেন একটা গ্লানি ও কুণ্ঠার ভাবের উদয় হ'তে লাগ্‌ল।...কারণ বাল্যকাল থেকে সে ছিল একটু puritan প্রকৃতির মানুষ, যে জন্য তার সহপাঠীরা তাকে অনেক সময়ে 'ব্রাহ্ম সুবোধ বালক' ব'লে ঠাট্টা কর্‌ত। তাই নারীর কুলত্যাগ করার স্বপক্ষে এ যুক্তিতে তার মন বিদ্রোহী হ'য়ে না উঠেই পারে নি। এমন কি এরূপ যুক্তি মন দিয়ে শোনাও সে দুর্নীতি মনে কর্‌ত।...কিন্তু সে ভারি আশ্চর্য্য বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল যখন সে দেখ্‌ল যে তার মনটি তার বিদ্রোহ সত্ত্বেও এই যুক্তিগুলিকেই তার সৎসঙ্কল্পের স্বপক্ষে যুক্তি স্বরূপে খাড়া কর্‌তে প্রয়াসী!...তবে সে এই ব'লে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল যে মানুষের মনের এমন সময় আসে যখন সে নিজের প্রবণতার স্বপক্ষে যুক্তি যেন সব তাতেই খুঁজে পেতে চায়। অন্ততঃ সে এ সময়ে নানা সূত্রে, অপরের নানান্ চিন্তার মধ্যে সর্ব্বদা যেন নিজেরই তদানীন্তন সমস্যা প্রতিফলিত দেখ্‌তে লাগ্‌ল। অভিনয়টি দেখার পর তার মন তার কাণে কাণে বল্‌তে লাগ্‌ল: 'সত্য কথা। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন তার সত্যকার বাঁচার আদর্শের সঙ্গে সমাজ-আদিষ্ট জীবনযাপনের আদর্শের সংঘর্ষের একটা রফা নিষ্পত্তি না কর্‌লে চলে না।'...

এই সব সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে একদিন সে ভাব্‌ল যে তার পিতাকে তার সঙ্কল্প ও যুক্তির কথা বিস্তারিতভাবে লিখে জানানোর সময় হয়েছে। তার পত্রের উত্তরে অনুপম তাকে যা লিখেছিলেন সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে।

পল্লব পিতার উত্তর পেয়ে মনস্থির করে ফেল্‌ল যে আর সে ইতস্ততঃ কর্‌বে না...বৎসর খানেক কেম্ব্রিজে 'হার্মনি' পড়বে ও পিয়ানো শিখ্‌বে; তারপর জার্ম্মানিতে বা ফ্রান্সে গান শিখ্‌তে যাবে। (অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পিতার ইচ্ছামত ব্যারিষ্টারিটাও পাশ ক'রে যাবে।)

(৭)

পল্লব মাসাধিককাল মিষ্টার টমাসের বাড়ীতে থেকে কিছুদিন লণ্ডনে কাটাবার জন্য টমাস পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার বিদায় নিতে আর ইচ্ছা করছিল না। কারণ কয় সপ্তাহে শুধু যে সে মিষ্টার টমাসের প্রতি একটা আন্তরিক টান অনুভব করছিল তাই নয়, তার এ কয়দিনের অভিজ্ঞতায়ই একটা কথা বড় বেশি ক'রে মনে হ'য়ে তার এ পরিবারের মনোজ্ঞ সাহচর্য্য ছেড়ে যেতে কষ্টবোধ হচ্ছিল। দেশে সে বরাবর ইংরাজকে একটা বিশেষ চশ্‌মার মধ্য দিয়ে দেখ্‌ত। তার মনে হ'ত যেন ইংরাজের ও ভারতীয়ের মনোজগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে। মিষ্টার টমাসের সঙ্গে পরিচয়ের আগে বৎসরাধিককাল কেম্ব্রিজে থেকেও তার এ বিশ্বাস বিশেষ ক্ষীণমূল হ'য়ে আসে নি। সত্য বটে, মিসেস নর্টনের সঙ্গে তার প্রীতির সম্বন্ধটা একটা তৃপ্তিদ আন্তরিকতার রসে সিঞ্চিত হ'য়ে তার কাছে উজ্জ্বল হ'য়েই ধরা দিয়েছিল,—কিন্তু তবু পল্লব ইংরাজ রমণীর সঙ্গে সে আন্তরিক সৌহার্দ্দের সম্বন্ধকেও একটু অন্য চক্ষে না দেখে পার্‌ত না। কারণ সে কৈশোরে পদার্পণ করার সময় হ'তে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে প্রায়ই কেমন যেন এক বিচিত্র অনুভূতির স্নিগ্ধতার পরশ পেত। সে বেশ স্পষ্ট অনুভব কর্‌ত যে নিকটাত্মীয়া নারীর সঙ্গেও যে স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধটি স্থাপন করা যায় সেটা পুরুষ বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ হ'তে কেমন যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির

না হ'য়েই পারে না। কৈশোরে উপনীত হবার সময়ে এ আবিষ্কারে সে প্রথমটায় যথেষ্ট আশ্চর্য্য না হ'য়েই পারে নি। তবে তার এ আশ্চর্য্যের মাত্রা একটু বেশি হওয়ার একটু কারণও ছিল। দেশে থাক্‌তে সে নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধের ভিতরকার কথাটা নিয়ে বড় বেশি আলোচনা করার সুযোগ পায় নি; কেননা কুঙ্কুম মোহন-লাল প্রভৃতির বন্ধুত্ব, পড়াশুনো ও খেলাধূলোই তার মনোযোগের ও চিন্তার বার-আনা অংশ অধিকার ক'রে থাক্‌ত। তবু দৈনিক জীবনেও নানান্ সামান্য ছোটবড় অভিজ্ঞতাই সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তার মনে পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অনুভূতিটি বহন ক'রে এনে দিত। অর্থাৎ সে অস্পষ্ট ভাবে হ'লেও অনেকবারই অনুভব না ক'রেই পারে নি যে নারীর সঙ্গে স্নেহপ্রীতির আদান প্রদানে চিরকালই এমন একটা কোমলতা বা মাধুর্য্যের রসধারা বিরাজ ক'রে থাকে যেটা নিতান্ত অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধুর ভালবাসার মধ্যেও পাওয়া যায় না।

বিলেতে এসে মিসেস নর্টনকে অনেকটা কাছ থেকে পেয়ে পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতাটিই তার কাছে আরও বিচিত্রশ্রী হ'য়ে ধরা দিয়েছিল মাত্র। তাই, মিসেস নর্টনের সঙ্গে তার নিকট পরিচয়কে সে তাঁর নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক সৌকুমার্য্য ও কোমলতার ওপরই আরোপ কর্‌ত। এজন্য ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে তার বরাবরকার ধারণা মূলতঃ অটুটই ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু তার এ ধারণায় সব চেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে দিয়েছিলেন—মিষ্টার টমাস। তাঁর উদার সৌজন্যে ও সহজ প্রীতির ব্যবহারে পল্লবের মনের বহুদিনলালিত ইংরাজবিদ্বেষ যেন যাদুকরের মোহস্পর্শের মতনই নিমেষে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল। তাই সে য়ুরোপে এ অভিজ্ঞতাটিকে খুব বড় ক'রে না দেখেই পার্‌ত না। তার এ কয়দিনে বিশেষ ক'রে মনে হ'ত একটা কথা। সেটা হচ্ছে—টমাস পরিবারের অপরিচিত জনকে অযাচিত-ভাবে এমন আপন ক'রে নেওয়ার একান্ত সহজ সৌজন্য। তার স্বদেশী কোনও ভদ্র পরিবারের মধ্যে কি কখনও এক অজ্ঞাতকুলশীল য়ুরোপীয় যুবকের এরূপ আন্তরিক সমাদর মেলা কল্পনাও কর্‌তে পার্‌ত? অথচ য়ুরোপে এটা প্রায়ই ঘটে থাকে।

টমাস পরিবারের নানান সদয় সস্নেহ ব্যবহারে এই কথাটাই তার মনে নিরন্তর নানা রূপে নানা ছন্দে মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। সে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত বোধ কর্‌ত যে না জেনে অতিথির কাছ থেকে টাকা-নেওয়া-রূপ প্রথাকে হেয় প্রতিপন্ন কর্‌তে গিয়ে সে বিদেশীয়ের আতিথ্য সৎকারের এ মহনীয় দিক্‌টার প্রতি কি অবিচারই না করেছে! বিশেষতঃ যখন তার স্বদেশীয়দের এ বিষয়ে প্রথা-আচার এত পেছিয়ে পড়ে আছে!

সে ভারত আতিথ্য সৎকার জানে এক ভারতবাসী। কিন্তু সত্যই কি দুএকদিন অভ্যাগতকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য-পানীয় দিলেই তার চরম সমাদর করা হয়? বিদেশীকে আপনার করে নেওয়া, তার সঙ্গে একত্র আহার বিহার করা, এমন কি তাকে নিজ-পরিবারের একজন ব'লে গণ্য করা,—এ সব কি ভারতের তথাকথিত অতিথি-পূজার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ নয়? হায়, একদেশদর্শী স্বদেশগর্ব্ব কত বড় অজ্ঞতার ও কূপমণ্ডুকতার পরিচায়ক!

(৮)

তবু পল্লব মিষ্টার টমাসের কাছ থেকে বিদায় নিল, কারণ, লণ্ডনে তার মিসেস ইভেলিন সিংহ ব'লে একটি বিধবা বর্ষিয়সী ইংরাজ রমণীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবারই তিনি পল্লবকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু পল্লব এর আগের দুইটি ছুটি কুঙ্কুম ও মোহনলালের সঙ্গে একত্র কাটিয়েছিল। তাই এবার মাসখানেক সাউথেণ্ডে থাকার পর টমাস পরিবারে আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা হ'লেও সে অনেকটা কর্ত্তব্যবোধেই তাঁদের সস্নেহ আতিথ্যের মায়া পরিত্যাগ করে লণ্ডনে যাওয়া স্থির কর্‌ল।

'কর্ত্তব্যবোধে' কথাটির অর্থ একটু বিশদ করে তোলার দরকার আছে।

মিসেস সিংহ রণেন্দ্র সিংহ বলে একজন বাঙালী সিভিলিয়ানকে বিবাহ ক'রেছিলেন। পল্লবের পিতা যখন পাটনায় জজিয়তি কর্‌তেন, তখন রণেন্দ্র সিংহ ছিলেন সেখানকার কমিশনর। দুজনেই খুব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন ব'লে তাঁদের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। রণেন্দ্র প্রায়ই অনুপমের ওখানে আস্‌তেন ও অনুপমও মাঝে মাঝে রণেন্দ্রের ওখানে যেতেন। দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চল্‌ত।

প্রতি মানুষেরই মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটি রূপ থাকে বলা যেতে পারে। একটা সে বাইরে যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেই রূপ, ও আর একটা অন্তরঙ্গদের কাছে যেভাবে প্রাণ ও রসের আদান প্রদান করে সেই রূপ। এ দুটির মধ্যে প্রভেদ অনেক সময়ে গভীর হ'য়ে ওঠে, যেমন অনুপমের ক্ষেত্রে হয়েছিল। সচরাচর অল্পভাষী, সংযত-ব্যবহার ও গম্ভীরানন অনুপম রণেন্দ্রের সঙ্গে প্রাণখোলা তর্ক ও হাসির সময়ে এক অন্য রূপ ধারণ কর্‌তেন। তখন তাঁর কি উচ্চ হাস্য, কি টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত, কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্দীপ্ত বাক্যস্রোত ও যুক্তি প্রদর্শন—কিছুরই বিরাম ছিল না। অনেক সময়েই তর্ক গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চল্‌ত। পল্লব একেই বাল্যকাল থেকে তর্ক কর্‌তে ও শুন্‌তে একটু বিশেষ রকম ভালবাস্‌তে শিখেছিল। তার ওপর অনুপম তাকে মাঝে মাঝেই সঙ্গে ক'রে রণেন্দ্রের ওখানে নিয়ে যেতেন ব'লে সে ক্রমে অল্প বয়সেও ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্টচিত্তে পিতার ও রণেন্দ্রের তর্ক শুন্‌তে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। তখন পল্লবের বয়স হবে ১৩।১৪। মিসেস সিংহ তাকে বড়ই ভালবাস্‌তেন। নিজে অপুত্রবতী ছিলেন বলেই হোক্ বা স্নেহের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় ব'লেই হোক্, পল্লবের ওপর তাঁর প্রথম থেকেই কেমন একটা বিশেষ মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। মাতৃহীন পল্লবও তাঁকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তার একটা প্রকাণ্ড কারণ ছিল এই যে, মিসেস সিংহ ছেলেদের নানাবিধ চকলেট ও হৃদয়স্পর্শী বিস্কুট বিতরণ করায় বিশ্বাস কর্‌তেন। পল্লবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে এদিকে একটা দুরারোগ্য হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রায়ই প্রকট না ক'রেই পার্‌ত না। ফলে পল্লব দু চার দিন তাঁর কাছে না এলে তিনি অনেক সময়ে চাপরাশীর হাত দিয়ে তাকে পূর্ব্ববিধ হৃদয়গ্রাহী উপহার পাঠিয়ে দিতেন। পল্লবের পিতা এতে প্রথমটায় একটু আপত্তি কর্‌লেও এ আপত্তিতে পুত্রের সহানুভূতি একেবারেই না পেয়ে শেষটায় নিরস্ত হতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। পরিণামে পল্লব তার শুভার্থিনী উপহারদাত্রীর এতই 'নেওটো' হ'য়ে পড়েছিল যে লোকে বল্‌ত পল্লব মিসেস সিংহের পোষ্যপুত্র। এতে পল্লব কেন যেন মনে মনে ভারি রাগ কর্‌ত। কিন্তু সে রাগের গভীরতা তার রসনাদৌর্ব্বল্যকে জয় কর্‌তে পার্‌ত না। সুতরাং এ সব তুচ্ছ রাগ তার মিসেস সিংহের কাছে সময়ে অসময়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি।

এমন সময়ে একদিন রণেন্দ্র হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে পরজগতের নৌকায় অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। তখন মিসেস সিংহ বিলেত চ'লে আসেন। কারণ প্রথমতঃ তিনি আবাল্য বিলেতেই মানুষ ও দ্বিতীয়তঃ লণ্ডনে হাম্‌ষ্টেড্ নামক মনোজ্ঞ পল্লীতে মিষ্টার সিংহ তাঁর ইংরাজ পত্নীর জন্য একটি মনোজ্ঞ বাড়ী কিনে রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল চাকুরী হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি এই বাড়ীতেই জীবনের শেষভাগ যাপন কর্‌বেন। কিন্তু কালের অভিলাষ তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে দিল না। স্বামীশোকাতুরা সাশ্রুনেত্রে স্বামীর প্রিয় হর্ম্ম্যে এসে আশ্রয় নিলেন।

বিলেতে আস্‌বার সময়ে তিনি অনুপমকে বার বার ব'লে আসেন যেন পল্লবকে তিনি বি-এস্‌সি পাশ করার পরই লণ্ডনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পল্লব লণ্ডনে পড়ে ও তাঁর কাছে থাকে। কিন্তু পল্লব গেল কেম্ব্রিজে। তখন তিনি একটু নিরাশ হ'য়ে পল্লবকে দু'তিনবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন—তাঁর কাছে একটা ছুটি যাপন করবার জন্য। পল্লবের নানা কারণে প্রথম বৎসরে দু' একদিনের জন্য ছাড়া লণ্ডনে আসা হ'য়ে ওঠে নি। তাই এবার চার মাস ব্যাপী লম্বা ছুটিতে সে স্থির করেছিল যে মিষ্টার টমাসের আতিথ্যে মাস দুই কাটিয়ে বাকী অর্দ্ধেক ছুটি মিসেস সিংহের ওখানে যাপন করবে।

তবে গম্ভীর সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পল্লবের এ কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে স্বার্থও যে একেবারে বিজড়িত ছিল না এমন নয়। কারণ লণ্ডনে সে মাঝে মাঝে এক আধবার মিসেস সিংহের ওখানে যখনই দর্শন দিয়েছিল, তখনই তিনি তাকে তাঁর নিজের হাতের দুএকটা বাঙালীগৌরব ব্যঞ্জন রেঁধে খেতে দিতেন। য়ুরোপের রন্ধনৈপুণ্যের অভাবকে দার্শনিকের চোখে দেখার চেষ্টা কর্‌লেও পল্লব এ যাবৎ তাতে সফলতা লাভ কর্‌তে পারে নি। বিশেষতঃ দিনের পর দিন রন্ধন-অপটু বিলাতী রাঁধুনীর রান্না খেয়ে খেয়ে তার ক্লিষ্ট মনটি তার নৈতিক

আত্মশাসনকে বেমালুম উপেক্ষা ক'রে মিসেস সিংহের বাঙালী পরিবেষণের দিকে একটু বেশি রকমই ঝুঁকে পড়ত। যদিও তাঁর অশিক্ষিতপটু হাতের বাঙালী রান্না অনেক সময়ে এক বিচিত্র ও অদ্ভুত মৌলিকতায় গরীয়ান্ হ'য়ে উঠত, তবু সে অনত্যুচ্চ অঙ্গের রান্নাও সম্পূর্ণ কলা-কারু বিহীন ছিল না। বিশেষতঃ লবণ-মশলা-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত, ব্যঞ্জন ঝোল লেশহীন সিদ্ধ-ভর্জ্জন মাত্র পর্য্যবসিত, দৃষ্টিমাত্রে-লালসা-সঞ্চারণে-অপটু, এক কথায় আধ্যাত্মিকতার-নামগন্ধ-বিরহিত বিলাতী রান্নার পর যে বাংলাদেশের যে-কোনও রান্না শুধু দেশভক্ত নয় দেশাত্মবোধহীন ভারতীয়ের রসনায়ও নিরপেক্ষভাবে অমৃত সিঞ্চন করতে বাধ্য এ কথা কোনও ব্যথার ব্যথীরই অগোচর থাকতে পারে না।

মিসেস সিংহের ছবির মতন বাড়ীটি হাম্‌ষ্টেড হীথের খুব নিকটেই। সামনেই ছোট্ট বাগান। সে পল্লীতে প্রায় সব বাড়ীরই সংলগ্ন জমিতে ফুলের বাগান বা কেয়ারি। তার ওপর বাড়ীর মধ্যেও প্রতি ঘরে, সিঁড়িতে, কোণে নানা স্থলে সুন্দর সুন্দর ফুলের টব। ইংরাজ জাতির এই পুষ্পানুরাগ, বাস-পারিপাট্য ও সুন্দর গৃহসজ্জা পল্লবের বড় ভাল লাগত। মিসেস সিংহ তাঁর বাড়ীর নীচের তলাটি ভাড়া দিয়ে ওপরের তলায় থাকতেন। তাঁর ঘর ছিল মোটে চারটি। কিন্তু প্রতি ঘরই এমন পরিপাটি ও রুচিকর ভাবে সজ্জিত যে, তাতে পল্লব একটা ভারি নয়নারাম পেত। অথচ মিসেস সিংহ ধনী ছিলেন না বা গৃহসজ্জার বাহুল্য বা আড়ম্বরের এতটুকুও পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু তিনি কেমন সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করতেন। পল্লবের ইংরাজদের এ পারিপাট্য-কুশলতা ক্রমেই বেশি ভাল লাগছিল। তাদের বাসের সর্ব্বপ্রকার ধরণধারণের মধ্যেই একটা সুচারু সভ্যতা ও বহুদিন-বিকশিত সৌকুমার্য্য ফুটে উঠত। এসব দেখতে দেখতে অজ্ঞাতে বাস-করার-মধ্যেকার কলাকারু-সম্বন্ধে তার যেন ক্রমেই চোখ খুলছিল। সে দু'একবার কলিকাতায় দু'চারজন ধনী বাঙালী জমিদার ও অশিক্ষিত মাড়োয়ারির অজস্র অর্থব্যয় ক'রে ঘর সাজানো দেখেছিল। ইংরাজ মধ্যবিত্তের সান্ত উপকরণ-সম্ভারের সঙ্গে তাদের অনন্ত উপকরণ-সম্ভারের তুলনাই হ'তে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ সভ্য ইংরাজের গৃহসজ্জাকুশলতার মধ্যে পল্লব যে ভব্য মনটির পরশ পেত তার সঙ্গে তুলনায় ধনী মাড়োয়ারির উপকরণ-আড়ম্বর যেন তার কাছে বর্ব্বরতারই পরিচায়ক ব'লে মনে হ'ত। পল্লব ক্রমেই উপলব্ধি করছিল যে সুরুচি বস্তুটি মানুষের হৃদয়ের সৌকুমার্য্যের এমন একটা কষ্টিপাথর—যার অভাব অর্থের কুচকাওয়াজ দিয়ে পূর্ণ করা যায় না।

মিসেস সিংহ বস্তুতঃ বড় স্নেহপ্রবণ রমণী ছিলেন। তাঁর স্বামীর প্রতি অনুরাগ তাঁর এই স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত স্নেহ-উৎসেরই একটি প্রধান ধারা মাত্র ছিল। কারণ বলা বাহুল্য তিনি হিন্দু নারীর মতন পতিকে পরম গুরু মনে করে নিজের নারীজীবনের সার্থকতা লাভের প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি স্বামীকে সত্যই মনেপ্রাণে ভালবাসতেন, তবে সে ভালবাসার মধ্যে অসাধারণত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ তিনি মিসেস নর্টনের মতন গভীরচিত্তও ছিলেন না ও এক একটু বেশি স্নেহপ্রবণতা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়েই অসাধারণত্বের দাবী করতে পারতেন না।

ফলে স্বামীর মৃত্যুর পর হ'তে এ স্নেহশীলা নিঃসন্তানা নারী তার উচ্ছ্বসিত নারী-হৃদয়ের উদ্বেলিত স্নেহের একটি আধার খুঁজতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অবশেষে অন্য কোনও আধার না পেয়ে শেষটা তাঁর এক আধ-পাগলা বোনকে তিনি পাগলাগারদ থেকে নিয়ে এসে দুই বোনে ভাঙা ঘরে নতুন করে সংসার পেতে বসেছিলেন। তাঁর শুভাথিনী অনেক প্রতিবেশিনীই তাঁকে সদুপদেশ দিতে ত্রুটি করে নি, যে 'পাগল বোনকে কেন অনর্থক ঘাড়ে করা, দাও তোমার কৃতী ভাইদের কাছে পাঠিয়ে, না হয় পাগ্‌লা-গারদেই ফিরিয়ে'—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সে সব হিতাকাঙ্ক্ষিনীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করেন নি।

বিলেতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারে মেয়েদের প্রায় সব গৃহকর্ম্মই নিজেদের করতে হয়। পল্লব দেশে থাকতে ভাবত বুঝি বিলেতের মেয়েরা ইঙ্গবঙ্গ মেমসাহেবদের মতনই বিলাসিনী। কিন্তু বিলেতে এসে তার এ ভ্রম ভাঙতে দেরি হয় নি। সে দেখত যে বড় বড় বাড়ীতেও একটির বেশি দাসী থাকে না—ভৃত্য ত থাকেই না। মেয়েরাই সেখানে বাজার করে, রাঁধে, সেলাই করে, ঘরদোর পরিষ্কার রাখে ইত্যাদি।...মিসেস সিংহও খুব পরিশ্রম করতে পারতেন। তিনি নিজহস্তেই

রাঁধতেন। তবে বিলাতে সচরাচর আমাদের দেশের সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মতন সাতসতের রকমের ব্যঞ্জন রান্না হয় না ব'লে রন্ধনকার্য্যে মেয়েদের বেশি সময় বা শ্রম ব্যয়িত হয় না। তবু সমাজে নানা রকম মেলামেশা ক'রেও যে মিসেস সিংহ কেমন ক'রে ঘরকন্নার কাজ এত সুচারু ভাবে সম্পন্ন করতেন, তা ভেবে পল্লব বিস্মিত না হ'য়েই পারত না।

কারণ মিসেস সিংহ সত্যই বরাবরই একটু বেশি মিশুক ছিলেন। তিনি চিরকাল ভারতবর্ষে চা, টেনিস, ডিনার প্রভৃতির পার্টি দিয়ে দিয়ে এত জনকোলাহলপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে শান্তরসাস্পদ হাম্‌ষ্টেড তাঁর একটু বেশি নির্জ্জন বোধ হ'ত। তাই তাঁর লণ্ডনের বাড়ীতেও তিনি প্রায়ই ভারতীয় ছাত্রদের ও ইংরাজ বন্ধুবান্ধবীদের চা, ডিনার প্রভৃতিতে নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি নিজে কথা-বার্ত্তায়, আদবকায়দায়, চেহারায় ও শিক্ষায় পুরোদস্তর ইংরাজনারী হ'লেও তথাকথিত বঙ্কিমগ্রীবা মেমসাহেব ছিলেন না। তিনি ভারতীয়দের পর মনে করতেন না, বরং স্বামীর সম্বন্ধে মনে প্রাণে আত্মীয় ব'লেই গণ্য করতেন। এমন কি তিনি নিজেকে ভারতীয় ব'লেই পরিচয় দিতেন ও এক রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মের সময়ে ছাড়া সর্ব্বদাই শাড়ী পরতেন। এতে পল্লব মনে মনে বড়ই প্রীত হ'ত। বাঙালীর ইংরাজমহিলা বিবাহ ক'রে সুখী হওয়া সম্ভব নয় এ কথা সে বরাবরই দৃঢ় বিশ্বাস করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অস্বীকার করতে পারত না যে, মিসেস সিংহ তাঁর বিবাহিত জীবন স্বামীর সঙ্গে সুখেই কাটিয়ে-ছিলেন। তার প্রধান কারণ ছিল—তাঁর হৃদয়ে স্নেহের আধিক্য ও মেশবার ক্ষমতা। তাঁর উদারতা ও সমতন্ত্র-বাদও তাঁর এই স্নেহকোমলতার দ্বারাই প্রণোদিত হ'ত। পল্লব তাঁকে একটু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক ব'লে মনে না ক'রেই পারত না। কারণ তার মনে হ'ত যে মিসেস সিংহের জীবন অনেকটা একটানা স্রোতেই ব'য়ে এসেছে—জীবনে অধুনাতন জটিলতা বা অসঙ্গতির আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হবার সুযোগ তিনি পান নি। সংসারে এক রকম শ্রেণীর লোক থাকে যারা জীবনটাকে আমরণ অবিমিশ্র ভাল চোখেই দেখে যায়। মিসেস সিংহ ছিলেন অনেকটা এই প্রকৃতির মানুষ। তিনি চাইতেন—সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে, সব মানুষকে ভাল ভাবতে; জীবনে দুঃখের চেয়ে সুখকেই বড় ক'রে দেখতে। তিনি বলতেনও ভাল ভাল কথা, যথা :—'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই' 'মন্দ আছে শুধু ভালকেই উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্য,' 'ব্যথার আগুণের মানে হচ্ছে এই যে তাতে মানুষের খাদটুকু পুড়ে গিয়ে সোণাটুকুই উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়;' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁর সব আচরণেই তাঁর এই প্রবণতাটিই বেশি প্রকট হ'য়ে উঠত। যেমন তিনি চাইতেন, তাঁর অভ্যাগতদের সাম্‌নে পল্লব অহোরাত্র ভারতীয় গান করে। কেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল তাতে ক'রে ইংরাজেরা ভারতীয় সঙ্গীতের গরিমা বুঝতে শিখবে। পল্লব তাঁর ভারতীয় অতিথিদের সাম্‌নে মন খুলে গান করতে সঙ্কোচ বোধ না করলেও ইংরাজ অতিথিদের উপস্থিতিতে গাইতে বড় একটা রাজি হ'ত না; কারণ সে দেখেছিল যে ইংরাজদের ভারতীয় গান ভাল লাগে না। এতে মিসেস সিংহ আপত্তি ক'রে বলতেন যে, ও তার ভুল ধারণা; যেহেতু সব ভাল জিনিষই সব ভাল লোকের ভাল লাগতে বাধ্য; শেক্সপীয়র বলেছেন যে, যে মানুষ গান ভালবাসে না সে সব করতে পারে; কার্লাইল বলেছেন যে গভীর ভাবে দেখলে সর্ব্বত্রই সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

পল্লব বলত যে সংসারের সমস্ত লোক ভাল ধ'রে নিলেও এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সব রকম ভাল জিনিষ সব রকম ভাল লোকেরই ভাল লাগতে বাধ্য। এরূপ কথার উত্তরে মিসেস সিংহ বলতেন যে এরূপ ধারণা পল্লবের ভুল; যেহেতু মিসেস ড্রিঙ্কওয়াটার, মিষ্টার হেনপেক ও মিস জন্‌ষ্টনহিক্ কি প্রায়ই ভারতীয় গান শুনে সোৎসাহে কর-তালিতে ঘর মুখরিত করেন না,—ও 'কি চমৎকার', 'কি স্বর্গীয়', প্রভৃতি পুলকবচন অজস্র ব্যবহার করেন না? পল্লব এই সরলহৃদয়া সদাউৎসাহকম্পিতা মহিলার সঙ্গে প্রথম প্রথম সমান উৎসাহে তর্ক করত। কিন্তু সে অবিলম্বেই নিজের ভুল বুঝেছিল ও ক্রমেই তাঁর সঙ্গে তর্কের মাত্রা কমিয়ে এনেছিল। কারণ সে ক্রমশঃই বেশি করে উপলব্ধি করছিল যে সে নিজের অল্প অভিজ্ঞতায়ই সংসারের যতটা কুটিলতা ও ক্ষুদ্রতার সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে, এ সহৃদয়া নারী ততটা সঙ্কীর্ণতা ও অসারতার সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ

পান নি। যেন বরাবর সব জিনিষের মধ্যে ভালটাকেই বড় ক'রে দেখে দেখে মন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার ক্ষমতাটিও তাঁর বিলুপ্তপ্রায় হ'য়ে এসেছিল।

তবু সে মাঝে মাঝে তর্ক না ক'রে থাক্‌তে পার্‌ত না। বিশেষতঃ যখন সে দেখ্‌ত যে ইংরাজের মৌখিক ও লৌকিক হাততালিকেও তিনি আন্তরিক ভাব তেন, তখন সে একটু চঞ্চল না হ'য়েই পার্‌ত না। সে বল্‌ত: "মিসেস সিংহ, আমি মাঝে মাঝে সত্যই আশ্চর্য্য হই যে আপনি সারা জীবন বিলেতে থেকেও এটা বোঝেন না যে এদেশে শিষ্টসমাজে প্রায়ই হাততালি দেয় নিছক লৌকিকতার খাতিরে।"

মিসেস সিংহ উত্তরে তাঁর সুশ্রী, সদয় ও সরল মুখখানিকে যৎপরোনাস্তি বিজ্ঞতামণ্ডিত ও গম্ভীর ক'রে তোল্‌বার বিফল প্রয়াস ক'রে বল্‌তেন: "না না পল্লব। এটা তোমার মস্ত ভুল। তুমি এখনও ছেলেমানুষ্ আছ কি না, তাই এই সাদা কথাটাও ঠিক্ ধর্‌তে পার্‌ছ না।"

পল্লব মনে মনে হাস্‌ত। এরূপ মনোভাব তার অপরিচিত ছিল না। কারণ কলিকাতায়ও তার এমন কয়েকটি বয়স্কা সরলা আত্মীয়া ছিলেন, যাঁরা খুব গম্ভীর ভাবে বিশ্বাস কর্‌তেন যে, বয়সের সঙ্গে পরিপক্ক বিজ্ঞতার বুঝি একটা স্বতঃসিদ্ধ সহজ অনুপাত না থেকেই পারে না। অথচ আজীবন গৃহজীবনের স্নেহমমতার অন্তরালে সন্তর্পণে মানুষ হওয়ার দরুণ যে বস্তুতঃ এঁরাই সংসারের অসারতার স্বরূপটি জান্‌বার যথেষ্ট অবকাশ পান না, সে কথাটা এঁদের কৃপাপাত্র "ছেলেমানুষেরা" ইঙ্গিত কর্‌বারও অবকাশ পায় না। ফলে এই শ্রেণীর কোমলা, সরলা নারী তাঁদের সারল্য ও কোমলতার রঙীন চশ্‌মাকেই আসল সত্য দর্শনের অণুবীক্ষণ ব'লে ভুল ক'রে বসেন। পল্লব ভাব্‌ত যে সংসারের নিষ্ঠুর পরিচয়ের যে অভাবে শিশুর মনটি সরল বিশ্বাসকেই চরম সত্য ব'লে মনে ক'রে থাকে, সংসারের স্বরূপটি হ'তে অন্তরালে রাখ্‌তে পার্‌লে সে সারল্যকে বজায় রাখা মোটেই অসম্ভব হয় না। পল্লব মিসেস সিংহকে এই শ্রেণীর সরলপ্রাণা নারীর দলে ফেলেই তাঁর রাশি রাশি নীতিবাদের মনস্তত্ত্বটি বুঝতে চাইত।

মিসেস সিংহের সব মতামতই তাঁর ঋজু, শুভ্র, অনভিজ্ঞ হৃদয়ের একরোখা ধারণার ফল ছিল। তাই তিনি কখনও কখনও বল্‌তেন যে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে যে মূঢ় ব্যবধানটি সৃষ্ট হয়েছে, সেটা আমরা একটু ইচ্ছে কর্‌লেই অপসৃত হ'তে পারে।

পল্লব বলত: "কিন্তু মিসেস সিংহ, খাদ্য ও খাদকের মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব হওয়া কি মাত্র ভক্ষিতের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে?"

মিসেস সিংহ একটু সবিস্ময়ে ব্যথার সঙ্গে বল্‌তেন: "পল্লব, তোমার মুখে এই রকম কথা! তুমি কি সেই সরল উদার পল্লব! ছি ছি, অমন কথা বোলো না। ইংরাজ আমাদের ভক্ষক! আমরা কেবল একটু বেশি অভিমানী ও কোমল-হৃদয় ব'লে ওদের সহজ ব্যবহারকেও অপমান বা উৎপীড়ন মনে করি। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের অনেকের মনে এ ধারণার জন্য দায়ী—প্রধানতঃ আমাদের জনকয়েক হিংসুক রাজনীতিক।"

পল্লব একটু হেসে বল্‌ত: "মিসেস সিংহ, পাটনায় আপনি যে পল্লবকে দেখেছিলেন, এই সুদূর লণ্ডনেও আপনি যে অবিকল সেই পল্লবকেই দেখ্‌ছেন, এটা আমি জোর করে আপনাকে কেমন ক'রে বল্‌ব?—বিশেষতঃ যখন দার্শনিকেরা বলেন শুন্‌তে পাই যে, মানুষ দুবার কখনও এক নদীতে স্নান করতে পারে না"—

—"তার মানে?"

"সে কথা না হয় থাকুক। এটা আমি একটা অবান্তর কথা বলে ফেল্‌লাম মিসেস সিংহ। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমাদের দেশে পথেঘাটে, রেলেষ্টীমারে এমনকি গোরস্থানেও শ্বেত ও কৃষ্ণচর্ম্মের মধ্যে যে ভেদজ্ঞান বজায় রাখা হয়, সে জন্যেও কি দায়ী আমাদের হিংসাবাদী রাজনীতিকেরা?"

মিসেস সিংহ দুঃখিত হ'য়ে বল্‌তেন: "হাঁ, এরকম দুচারটে অন্যায় ওরা করে বটে, কিন্তু এ থাক্‌বে না।"

পল্লব বল্‌ত: "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মিসেস সিংহ—এ ভেদজ্ঞানের অপমান থেকে যেন মানুষ শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে। ব্যক্তিগত ভাবে আমিও বিশ্বাস করি যে এ জাতিবিরোধ থাক্‌বেনা। তবে কি জানেন মিসেস সিংহ? আমার মনে হয় যে এ ভেদজ্ঞান ওরা কেবল তখনই বর্জ্জন কর্‌বে, যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়ে ওদের সমকক্ষ বলে গণ্য হব।"

হায়! পল্লব তখনও বোঝে নি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদজ্ঞান যাওয়া এত সহজ নয়। কারণ সে তখনও কোনও খবর রাখ্‌ত না স্বাধীন জাতের মধ্যেও এ ভেদজ্ঞানের মূল কত দৃঢ়ভিত্তি!...মানুষের জাতীয় অভিমান ও শ্রেষ্ঠতায় অন্ধ বিশ্বাসের মনস্তত্ত্ব যে কত জটিল, তার কোনও খবর মিসেস সিংহও রাখ্‌তেন না পল্লবও না।...

যাই হ'ক, মিসেস সিংহ বল্‌তেন: "কিন্তু পল্লব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা স্বাধীনতার যোগ্য হওয়া মাত্র ওরা আমাদের তা দিয়ে দেবে। অর্থাৎ আমরা যেদিন একতার দাম দিতে শিখ্‌ব, নিয়মানুগত্যের (discipline) মহিমা বুঝব ও জাতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ব, সেই দিনই আমরা স্বাধীনতা লাভ ক'র্‌ব।"

পল্লব এ কথায় একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাস্‌ত। তাতে মিসেস সিংহ একটু আহত বোধ ক'রে বলে উঠ্‌তেন: "কিন্তু এ সত্যি কথা পল্লব, এক বিন্দু বাড়ানো-কথা নয়। আমার অনেকগুলি সহৃদয় ইংরাজ বন্ধুবান্ধবীই আমাকে এ কথা বলেছেন।"

পল্লব তার হাসিতে মিসেস সিংহের ব্যথা পাওয়াটা টের পেয়ে একটু লজ্জিত হয়ে গম্ভীরভাবে বল্‌ত: "কিন্তু মাপ করবেন মিসেস সিংহ! রাজনীতিতে দুচারজন সহৃদয় মধ্যবিত্তের নির্ব্বিরোধী শুভেচ্ছায় যে বিশেষ ফল হয়, ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালে ত তা মনে হয় না। তাছাড়া স্বাধীনতা না পেলে যে কোনও জাতির পক্ষে জাতীয় দায়িত্ব, নিয়মানুগত্য প্রভৃতি বড় বড় কথার মর্ম্মগ্রহণ করাই অসম্ভব হ'য়ে ওঠে! মানুষ ঠেকে তবে শেখে। পড়তে পড়তে তবে ওঠে। এ কথা ত মানেন? কাজেই আমরা রাতারাতি যোগ্য না হ'য়ে যেন কখনও স্বাধীনতার দাবী না করি এ কথা বলাও যা, সাঁতার না শিখে জলে নেমো না এ দোহাই দেওয়াও কি তাই নয়?"

মিসেস সিংহ এরূপ কথার উত্তরে প্রায়ই কয়েকটি ভাল ভাল কথা বল্‌তেন যে, "তা নয় গো তা নয়। ওরা ক্রমে আমাদের নিজে থেকেই এসব গুণ শিখিয়ে দিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চম্পট দেবে।" এ কথায় পল্লব সংশয় প্রকাশ কর্‌লে মিসেস সিংহ আরও ঘাড় নেড়ে বল্‌তেন "না দিয়েই পারে না। আমাদের শেখাতেই হবে যেমন ইংরাজি শিখিয়েছে ও শেষে শেক্সপীয়র পড়্‌তে শিখিয়েছে। আমরা কি দেড়শ বৎসর ইংরাজের শাসনে থেকে ওদের কাছ থেকে অনেক ভাল জিনিষ শিখি নি? তবে বাকী গুলোই বা শিখে নিতে পার্‌ব না কেন? যাই বল না কেন, আশা করি এ কথা তুমি বল্‌বে না যে ওদের শাসনে আমাদের জাতীয় উন্নতি কিছুই হয় নি?"

পল্লব বল্‌ত: "আমার একজন প্রিয় বন্ধু এরকম যুক্তির একটি বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। একজন ইংরাজ তাঁকে কেম্ব্রিজে ঠিক্ এই প্রশ্নই করেছিল যে ইংরাজশাসনের আমরা দোষ দেখাই বটে, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে এ কথা অস্বীকার কর্‌তে পারি কি যে ইংরাজশাসনে আমাদের জাতীয় জীবন অগ্রসর হয়েছে? উত্তরে বন্ধুবর বলেছিলেন যে, একজন লোক তার ছেলেকে তার ভাইয়ের কাছে রেখে যায়। ছেলেটির জন্য ভাইকে তিনি মাস মাস মাসোয়ারা পাঠাতেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতা কিন্তু সে টাকার বার আনা আত্মসাৎ ক'রে মাত্র বাকি চার আনায় ভ্রাতুষ্পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করতেন। ছেলেটি যথেষ্ট আহার বিহার ও শিক্ষা না পেয়ে রুগ্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন হ'য়ে অতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগ্‌ল। সাত আট বৎসর পরে পিতা ফিরে এসে পুত্রের হ্রস্ব, রুগ্ন চেহারা দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সব কথাই প্রকাশ ক'রে দেয়। তাতে ভাই মহা চ'টে বলে 'সব মিথ্যা কথা। দেখ দেখি এ আট বৎসরে ও কতটা বেড়েছে।' তাতে সে ছেলেটি ক্ষীণ হেসে উত্তর দেয় 'হাঁ কাকা, এ আট বছরে আমি আধ হাত বেড়েছি বটে, কেবল পুষ্টিকর জিনিষ খেতে পেলে এ সাত বৎসরে আধ হাতের যায়গায় দুহাত বাড়তাম, এইমাত্র।'"

এরূপ কথায় মিসেস সিংহ আরও ব্যথিত হয়ে শেষটায় এরূপ সদিচ্ছা প্রকাশ ক'রে তর্ক সাঙ্গ কর্‌তেন যে, এরকমটা থাক্‌বে না। ওরা শীঘ্রই বুঝবে যে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধের চেয়ে ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ সংসারে ঢের বড় সত্য।

এরূপ শুভেচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু বলা অনুচিত ও নিষ্ফল ভেবে পল্লবও চুপ ক'রে যেত।

(৯)

মিসেস সিংহের বাড়ীটি ছিল বড়। তাছাড়া আধপাগ্‌লা

বোনটিকে নিয়ে একা বাস করাও খুব নিরাপদ নয়। তাই তিনি নীচের তলা পল স্মিথ ব'লে এক ইংরাজ ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছিলেন। পরিবারে প্রাণী—মাত্র তিনটি। স্বামী স্ত্রী ও একটি ১৯।২০ বছরের মেয়ে। পল্লব অল্পদিনের মধ্যেই স্মিথ পরিবারের সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিল—বিশেষতঃ মিষ্টার স্মিথের সঙ্গে। সে মাঝে মাঝেই নীচের তলায় এসে তাঁর সঙ্গে গল্প কর্‌ত। সেই সূত্রে সে মিষ্টার স্মিথের জীবনের অনেক কথাই জান্‌তে পেরেছিল। মিষ্টার স্মিথের বয়স ৩৮।৩৯ হবে। বেশ বুদ্ধিমান্ লোক। যুদ্ধের আগে একটি ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চির কাজ কর্‌তেন। যুদ্ধের পরে একটি সওদাগরি আফিসে হিসাবের কাজ নিয়েছিলেন। গত যুদ্ধে তিন বৎসর ফ্রান্সে যুদ্ধ করেছিলেন।

একদিন একটী গোলার একখণ্ড ইস্পাত লেগে তাঁর বামচক্ষুটি নষ্ট হ'য়ে যায়। সে চক্ষু-গহ্বরে তিনি কাচের চোখ বসিয়ে নিয়েছিলেন। তাছাড়া বিষাক্ত বাষ্প তাঁর ফুসফুসকে চিরকালের জন্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই বুকে তিনি একটা বেদনা বোধ কর্‌তেন। ডাক্তারে তাঁকে বলেছিল যে উত্তেজিত হওয়া তাঁর পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তর্কালোচনায় প্রায়ই উদ্দীপ্ত হ'য়ে পড়্‌তেন ও তাঁর স্ত্রীকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুল্‌তেন! যুদ্ধের সম্বন্ধে তাঁর এক সময়ে খুব উৎসাহ ছিল; কিন্তু যুদ্ধের ভিতরকার চাতুরী, নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতাকে নিতান্ত কাছে থেকে দেখে দেখে তাঁর মোহ ভেঙে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি সময়ে অসময়ে যুদ্ধকে বিদ্রূপ করতেন ও যুদ্ধ-উৎসাহীদের উৎসাহকে অসার ব'লে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেতেন।

পল্লব কিন্তু দেখ্‌ত যে মিসেস স্মিথ ভুলেও এ সব বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন না—তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া ত দূরের কথা। শুধু তাই নয়, মিষ্টার স্মিথ যখন বল্‌তেন যে বিগত যুদ্ধের জন্য প্রায় সব জাতিরই দায়িত্ব সমান, তখন তিনি বেশ একটু রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তেন। কখনও কখনও এত রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তেন যে পল্লবের সাম্‌নেই স্বামীর এরূপ মতামতের বিরুদ্ধে তর্ক না ক'রে থাক্‌তে পারতেন না। নারী যে অনেক সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের মতন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের পৌরোহিত্য কার্য্যে পুরুষের চেয়ে বেশি উৎসাহ প্রকাশ কর্‌তে পারে, এ কথা পল্লব দুএকটি যুদ্ধ-প্রত্যাগত লেখকের গল্পে পড়েছিল। কিন্তু সে কথা তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নি; কারণ নারীকে কোমলতার আধার ব'লেই সে সম্মান করতে অভ্যস্ত হ'য়েছিল। এ শিক্ষা সে তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছিল—কাজেই এ শিক্ষার মূল ছিল দৃঢ়ভিত্তি। কিন্তু মিসেস স্মিথ যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধকে সমর্থন ক'রে উদ্দীপ্তভাবে তর্ক কর্‌তেন, তখন পল্লবের মনে হ'ত যে হয়ত এ বিষয়ে য়ুরোপীয় নারী ও ভারতীয় নারীর মনস্তত্ত্ব ভিন্ন প্রকৃতির। মিসেস টমাসের স্মৃতিও তাঁর এ বিশ্বাসের সমর্থক স্বরূপই হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হত পূর্ব্বোক্ত গল্পটির নায়কের একটি কথা: 'অন্ততঃ আমরা অনেকে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়াছিলাম শুধু স্ত্রীর কাছে কাপুরুষ ব'লে গণ্য হবার ভয়ে।'

মিস স্মিথ এ সব উদ্দীপ্ত তর্কে বড় একটা যোগদান কর্‌তেন না। তবে পল্লব লক্ষ্য করেছিল যে তিনি কখনও কখনও ছোটখাট দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বার সময়ে ভুলেও পিতার পক্ষ নিতেন না, মাতার মতামতেরি সমর্থন কর্‌তেন। পল্লব ভাব্‌ত 'আশ্চর্য্য! যুদ্ধের মত হত্যা-কাণ্ডকে অনভিজ্ঞা নারী কেমন করে এমন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রশংসা কর্‌তে পারে!'

মিস স্মিথের বয়স অল্পই,—উনিশ কুড়ির বেশী হবে না। তবে বয়সের তুলনায় তাঁর ভাবভঙ্গী ঢের বেশী পরিপক্ক হ'য়ে উঠেছিল। পল্লব শুনেছিল ও পড়েছিল যে বিলেতে ১৯।২০ বছরের মেয়েদের লোকে ছেলেমানুষ ব'লেই মনে ক'রে থাকে। বিলেতে এসে সে নানান্ ভদ্র পরিবারের কুমারী মেয়েদের চালচলন সম্বন্ধে এ অবধি যতটা লক্ষ্য করার অবকাশ পেয়েছিল, তাতে সে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনওরূপ দেখেও নি। অর্থাৎ সে এ অবধি যতটুকু দেখেছিল তাতে তার মনে হয়েছিল যে ১৯।২০ বছরের মেয়েকে সাধারণ্যে School girl ব'লেই মনে ক'রে থাকে; এবং বিলেতে School girlএর মানে—এক কথায় পুরুষের চিত্তাকর্ষণের অনুপযুক্তা। কিন্তু মিস স্মিথকে পল্লবের এ সাধারণ নীতির একটা ব্যতিক্রম ব'লেই মনে হ'য়েছিল। তবে সে অনেক গবেষণা ক'রে স্থির কর্‌ত যে এর কারণ শুধু এই যে মিস স্মিথ প্রথমতঃ যুদ্ধের সময়

যার সঙ্গে মিউনিশন ফ্যাক্‌টরিতে পুরুষের কাজ করার দরুণ ও দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পর সিনেমা-অভিনেত্রী হওয়ার দরুণ নিশ্চয়ই এমন অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে থাক্‌বেন, যার অভিঘাতে তিনি নিজের যৌবন-লাবণ্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে এত শীঘ্র এতটা পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর মাদকতাপূর্ণ নীল চক্ষু দুটির সুপ্রয়োগ সম্বন্ধে এতই সজাগ হ'য়ে পড়েছিলেন যে, সেটা এ বিষয়ে পল্লবের মতন অসমজ্‌দারের দৃষ্টিও আকর্ষণ না ক'রে পারে নি। তবে পল্লবের মনে এজন্য একটা অনির্দ্দেশ্য কুণ্ঠার ভাব এলেও, সে এই ভেবে মিস্ স্মিথকে একটু সদয় ভাবে বিচার করতে প্রবৃত্ত হ'ত যে, য়ুরোপে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যেও নানারকম অপাঙ্গ-দৃষ্টির চর্চ্চা করাটা মোটেই বিরল নয়। সুতরাং (সে ভাব্‌ত) যে আচরণ কোনও সমাজে কমবেশি প্রচলিত, সে আচরণে একটু বেশি অগ্রসর হওয়াটা হয়ত বাইরে থেকে যত অশোভন মনে হয়, বস্তুতঃ ততটা অশোভন নয়। তবে ইতিমধ্যে মিসেস সিংহের দু'একটা পার্টিতে মিস্ স্মিথকে নানান্ পুরুষের সঙ্গে যতটা নিঃসঙ্কোচে হাসিঠাট্টা কর্‌তে দেখেছিল, তাতে তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাঁর প্রতি মনে মনে একটু বিরূপ হ'য়ে না উঠেই পারে নি। তবে তার নিজের এ বিরূপ ভাবের আসল মনস্তত্ত্বটি যে কি, সে বিষয়ে পনর আনা নিগূঢ় তত্ত্বই তার অজ্ঞাত ছিল।...

একদিন মিসেস স্মিথ মিসেস সিংহ ও পল্লবকে সান্ধ্য-ভোজনে নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। আহারের সময় মিস স্মিথের আসন পল্লবের পাশেই নির্দ্দিষ্ট হ'ল।

পল্লব এ পর্য্যন্ত ভেবে এসেছিল যে, মিস স্মিথের ওপর সে মনে মনে একটু দৃঢ়রকমই বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে, ও সে-করাটা নিতান্ত অন্যায় নয়। কারণ মিস স্মিথের অনেক দৃষ্টি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী ও হাসিঠাট্টার ধরণধারণ তার কাছে একটু বিসদৃশ মনে হ'ত, যেজন্য তার ধর্ম্মবুদ্ধি যেন সগৌরবে দীপ্তি বিচ্ছুরিত কর্‌তে চাইত। কিন্তু আজ মিস স্মিথকে সর্ব্বপ্রথম নিজের এত নিকটে উপবিষ্ট দেখে ও তাঁর সঙ্গে একটু কাছ থেকে কথাবার্ত্তা কইবার সুযোগ পেয়ে হঠাৎ তার বক্ষস্পন্দন যেন সচকিত হ'য়ে উঠল। এরকম গতিশীলা, প্রাণচঞ্চলা, হাবভাবময়ী, চিত্তাকর্ষিণী কুমারীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ তার এ অবধি হয় নি। তাই যদিও সে মোহনলালের কাছে শুনেছিল যে, টেবিলে পার্শ্বোপবিষ্টা সঙ্গিনীর চিত্তরঞ্জন করা য়ুরোপের সভ্য-সমাজে প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে,—তবু সে নিজের মধ্যে একটা নিগূঢ় ইচ্ছা বোধ করা সত্ত্বেও মিস স্মিথের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা-বার্ত্তা চালাতে পার্‌ছিল না। ফলে মিস স্মিথ দু'তিনবার নিজে থেকে তার সঙ্গে নানান্ প্রসঙ্গে আলাপ কর্‌তে চাইলেও, সে 'হাঁ না' ছাড়া বড় একটা কিছু বল্‌তেই সাহসী হ'তে পার্‌ল না। এজন্য তার মনের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দ কুণ্ঠার ভাবের উদয় হওয়া সত্ত্বেও সে অনেক চেষ্টা ক'রেও সেটা দূর কর্‌তে পার্‌ল না।...অথচ তার মনে নানারকম পরস্পর বিরোধী ভাবের ভিড়ের মধ্যেও একটা অনুভূতি তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। সেটা এই যে মিস স্মিথের প্রতি তার বিরূপ ভাবটি কেমন যেন তার অতর্কিতে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে! শুধু তাই নয়, সে তাঁকে নিজের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট কর্ত্তে যথেষ্ট ব্যগ্র!...সঙ্গে সঙ্গে তার মনটি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, ভবে কি সে এতদিন মিস স্মিথের সাহচর্য্য না পাওয়ার দরুণই তাঁর হাবভাবের বিসদৃশ ভাব বড় ক'রে দেখত! অর্থাৎ অলভ্য দ্রাক্ষাফল বিস্বাদ ব'লেই কি সে অনধিগম্য মিস স্মিথকে প্রগল্‌ভা ভাব্‌ত! না, না—তা কখনই নয়—এ কি অদ্ভুত চিন্তা! কিন্তু যদি তার এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনই হয়, তবে আজ মিস স্মিথের দুএকটি মাত্র সামান্য সহাস্য সম্ভাষণেই কেন তার সঞ্চিত বিরূপভাবের বাষ্প বিলীন হয়ে গেল! কেনই বা মিস স্মিথের দু'একটি সস্মিত কটাক্ষে তার রক্ত এক অভূতপূর্ব্ব উল্লাসে উতলা হ'য়ে উঠেছে যে কটাক্ষ তিনি অপরের প্রতি প্রয়োগ করলে সে সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে বিচার না ক'রেই থাক্‌তে পার্‌ত না! অবশ্য এত কথা সে ঠিক্ তখন তখনই এত স্পষ্ট ক'রে ভেবে দেখ্‌বার অবকাশ পায় নি। তবে সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ এই সব চিন্তা তার নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রেছিল।

হঠাৎ মিসেস স্মিথ পল্লবের কুণ্ঠিত ভাবকে একটু পরিহাস ক'রে দূর ক'রে দেবার জন্য কন্যাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন: "ডলি! মিষ্টার বাক্‌চির কাছ থেকে য়ুরোপীয়

পুরুষের মতন সাড়ম্বর ভদ্র ব্যবহারের প্রত্যাশা কোরো না। কারণ তাঁদের দেশের প্রথা অন্য রকম।"

মিস স্মিথ একটু কপট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন: "কি রকম মিষ্টার বাক্‌চি! ও—বুঝেছি—তাই বুঝি আপনি আমার নানা প্রশ্নে এত সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিলেন!" পল্লব এ কথায় একটা ভব্যরকম উত্তর দেবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও, তার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। শেষটা তার অবস্থা এমন কিংকর্ত্তব্যমূঢ় গোছের দেখাল যে, মিষ্টার স্মিথ হেসে তার রক্ষার্থে বল্‌লেন: "যদি তাই হয় তবে তাতে তুমি অত আশ্চর্য্য হ'লে মিষ্টার বাক্‌চিকে কি একটু বিব্রত বোধ করতে হয় না ডলি? অপরের দেশের প্রথাকে এভাবে ঠেশ দিয়ে কথা বলা কি উচিত?—তাঁদের দেশে মেয়েরা থাকে অন্দরে ও পুরুষরা মেশে সদরে। কাজে কাজেই এরকম সান্ধ্যভোজনের টেবিলে বিদেশিনী সুন্দরী তরুণীর সাহচর্য্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে মিষ্টার বাক্‌চি যদি রাতা-রাতি সচেতন হ'য়ে না উঠেই থাকেন, তবে সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কেমন এডিথ, যায় কি?" ব'লে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু চোখ ঠেরে হেসে ফেল্‌লেন।

পল্লব এ কথায় সঙ্কোচে যেন আরও জড়সড় হ'য়ে পড়্‌ল। পিতা যে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বিদেশী যুবকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে এ ভাবে ঠাট্টা করতে পারেন, ও তার ওপর এ ঠাট্টায় স্বয়ং তার মাতাকে মধ্যস্থ ডাকতে পারেন, এ অভিজ্ঞতা তার আজ অবধি লাভ করার সুযোগ হয় নি।

মিস স্মিথও একটু রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু পুরুষ সমাজে অনেকটা নিঃসঙ্কোচে মেশায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন ব'লে তখনই আত্মসংবরণ ক'রে নিলেন। হঠাৎ চোখ তুলে নত-আনন পল্লবকে কি একটা বলতে যাবা মাত্রই মিসেস স্মিথ বাধা দিয়ে স্বামীকে বললেন: "কি যে বল পল!—আর তা আবার মিষ্টার বাক্‌চির মতন ছেলেমানুষকে নিয়ে!"

আবার ছেলেমানুষ! একে ত সে আজ কেমন যেন কিছুতেই আত্মস্থ হ'তে পারছে না। তার ওপর—'মৃতের উপর এই খড়্গাঘাত!' তার জড়সড় ভাবকে সে যে প্রাণপণে কাটিয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করছিলই প্রধানতঃ এই ভয়ে। পল্লবের খিন্ন মন অনুযোগ ক'রে বস্‌ল যে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই কি সন্ধ্যে হয়! সঙ্গে সঙ্গে সময় দেবতার ওপর নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্ষুব্ধ আত্মসম্মান যেন গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।···কবে সে ছেলেমানুষির কোটা পার হ'য়ে প্রবীণতার রাজটীকা পর্‌তে পার্‌বে! হায়—কবে, কবে, কবে?···

মিসেস সিংহ তাঁর স্নেহের অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে, পল্লব এরূপ আলোচনায় একটা গভীর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না ক'রেই পারে না। তাই তিনি প্রশ্নটিকে বদ্‌লে দেবার জন্য পরিহাসচ্ছলে ব'লে উঠলেন: "পল্লবকে যতটা ছেলেমানুষ ভাব্‌ছেন মিসেস স্মিথ, সে ততটা ছেলেমানুষ নয়। Things are not what they seem." (কোনও কিছু বাইরে যা ব'লে প্রতীয়মান হয় আসলে তা নয়)

কিন্তু কথাবার্ত্তায় যে ইচ্ছামাত্রই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করা যায় না,—এজন্য যথেষ্ট প্রয়োগকুশলতা থাকার প্রয়োজন—এ সহজ সত্যটি সরলহৃদয়া মিসেস স্মিথ ঠিক্ জান্‌তেন না। তাই তিনি তাঁর এ কথায় পল্লবকে আরও অস্বস্তির মধ্যে ফেল্‌লেন।

মিষ্টার স্মিথ এবার পল্লবের উদ্ধারে এলেন। কারণ তিনি দেখ্‌লেন যে পল্লব তাকেই কেন্দ্র ক'রে এরূপ আলোচনায় উত্তরোত্তর বেশি কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ছে।

তিনি হঠাৎ এই ব'লে কথাবার্ত্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন: "আমি এ কথা এডিথকে ব'লে ব'লে হাল ছেড়ে দিয়েছি। 'Things are not what they seem' এ কথার সদর্থ বুঝতে হ'লে একবার যুদ্ধে যাওয়া দরকার। কিন্তু—মাপ কর্‌বেন মিসেস সিংহ—যেহেতু মেয়েরা যুদ্ধে যায় না, সেহেতু তাদের এসব জ্ঞানগর্ভ কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা!"

মিসেস সিংহ সস্মিত মুখে বল্‌লেন: "তার মানে?"

মিষ্টার স্মিথ কথাটি মূলতঃ পরিহাসের ছলেই ব'লে-ছিলেন; কিন্তু মিসেস স্মিথ হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠ্‌লেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে অসুস্থ স্বামীর ব্যঙ্গোক্তি তিনি অনেক সময়েই নীরবে হজম ক'রে নিতেন বটে, কিন্তু ভারতীয়ের সাম্‌নে য়ুরোপীয়দের যুদ্ধপ্রবৃত্তির নিন্দায় তিনি একটু অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠেই থাক্‌তে পার্‌তেন না। তাই তিনি নিজের সংযম ভুলে হঠাৎ একটু তীব্র স্বরেই ব'লে উঠ্‌লেন: "তার মানে হচ্ছে এইমাত্র, মিসেস সিংহ, যে মেয়েদের

মহা অপরাধ তারা গত যুদ্ধে স্বদেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরার সমর্থন ক'রেছিল।"

মিষ্টার স্মিথ একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন: "এডিথ, তুমি জান যে ঠিক এ কথা আমি কখনও বলি নি বা বল্‌তে চাই নি। আমি বার বার বল্‌তে চেয়েছি শুধু এই কথাটি মাত্র যে 'যা চক্‌চক্ করে তাই সোণা নয়'।"

পল্লব এতক্ষণে প্রথম একটু স্বচ্ছন্দ বোধ কর্‌ল, কারণ প্রসঙ্গটি এখন অন্য দিকে গিয়ে পড়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটু ব্যগ্র ভাবে সহজ সুরে জিজ্ঞাসা কর্‌ল: "কি রকম?"

মিষ্টার স্মিথ বল্‌লেন: "অর্থাৎ, যুদ্ধ কর, নরহত্যা কর—ভাল কথা। কিন্তু কেবল call a spade a spade—যারা যা নয় তাকে সেই নাম দাও, এই আমাদের বক্তব্য।"

মিসেস সিংহ বল্‌লেন: "কিন্তু নরহত্যা আমাদের করতে হয়েছে ত শুধু জার্ম্মাণদের জন্য মিষ্টার স্মিথ।"

মিষ্টার স্মিথ একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে বললেন: "আমাদেরও প্রথমে তাই বোঝানো হয়েছিল বটে।"

মিসেস স্মিথ একটু বিরক্তির স্বরে বললেন: "অর্থাৎ? —তুমি কি বলতে চাও?"

মিষ্টার স্মিথ অবিচলিতভাবে উত্তর দিলেন: "—শুধু এই কথাটি মাত্র যে সত্যি কথা জান্‌তে পার্‌লে আমরা যুদ্ধ কর্‌তে যেতাম না। যুদ্ধের পুরোহিতদের কাছে এ কথা অগোচর ছিল না। তাই তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন।"

মিসেস সিংহ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন: "আপনি বেশ লোক মিষ্টার স্মিথ। আপনি কি চল্‌তে চান যে সত্য কথা জান্‌তে পার্‌লে আমরা স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজি হ'তাম না?"

মিষ্টার স্মিথ একটু উত্তেজিত ভাবে বল্‌লেন: "না।"

মিস স্মিথ এবার একটু অসহিষ্ণু ভাবে ব'লে উঠ্‌লেন: "বাবা! কি যে বল তুমি—"

মিষ্টার স্মিথ হঠাৎ আরও একটু উত্তেজিত হয়ে তীব্র স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন: "যে বিষয়ে কিছুই জানো না, সে বিষয়ে বিজ্ঞমত প্রকাশ কর্‌তে গেলে এক মূঢ়তাই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ডলি।"

অতিথির সাম্‌নে পিতার এরূপ অপ্রত্যাশিত রূঢ় ভাষায় মিস স্মিথ অপ্রতিভ হ'য়ে ক্ষোভে রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লেন। কারণ যদিও উপস্থিত কারুরই অগোচর ছিল না যে যুদ্ধের পর হ'তে মিষ্টার স্মিথের স্নায়ুমণ্ডলী একটুতেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ত, তবু নিমন্ত্রিতদের সাম্‌নে যে তিনি বয়স্থা কন্যাকে এ ভাবে ধমক দিতে পারেন এ কথা মিস স্মিথ স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মুহূর্ত্তে ঘরের মধ্যে যেন এক অস্বস্তির বাষ্প জমাট হ'য়ে উঠ্‌ল। সেটা সত্বর দূর করার জন্য মিসেস স্মিথ খানিকটা অনুযোগ ও খানিকটা উৎকণ্ঠার স্বরে বল্‌লেন: "পল—"

মিষ্টার স্মিথ নিজের রূঢ়তার জন্য তৎক্ষণাৎই লজ্জিত হ'য়েছিলেন। স্ত্রীর অনুযোগের সুরে তাঁর আরও চৈতন্য হ'ল। তিনি কন্যার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল সুরে বল্‌লেন: "কিছু মনে কোরো না ডলি, লক্ষ্মী মেয়ে। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।"

মিস স্মিথ মুখ নীচু ক'রে রইলেন। পল্লব লক্ষ্য কর্‌ল তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জ্যাকেটের হাতায় চোখের দুই বিন্দু উচ্ছলিত অশ্রু গোপন ক'রে ফেল্‌লেন। মিসেস স্মিথ স্বামীর আরাম কেদারার পিছনে এসে তাঁর দুই স্কন্ধে দুটি হাত রেখে আরও উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন: "পল, তোমার সেই বুকে বেদনাটা কি—"

মিষ্টার স্মিথ কথাবার্ত্তাকে একটু সহজ প্রণালীতে চালিত কর্‌বার জন্য কন্যার হাতটি ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন: "না—না—সামান্য একটু মাথা ধরা। ও কিছুই না। আজ আপিস থেকে ফেরবার সময় টিউবে বড় ভিড় ছিল—তাই বোধহয়।"

মিসেস স্মিথ বল্‌লেন: "তাহলে একটু aspirin দেব কি, না একটু কফি দেব?"

মিষ্টার স্মিথ বল্‌লেন: "না না aspirin দরকার নেই,—কফিই দাও।"

মিসেস স্মিথ কফি ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলে কফি পান কর্‌তে লাগ্‌লেন। ঘরের মধ্যে হঠাৎ এ অপ্রীতিকর আলোচনার দরুণ অস্বস্তির রুদ্ধ বাষ্প তখনও সহজতার বায়ু চলাচলে দূর হ'য়ে যায় নি। তাই কফি পরিবেষণ শেষ হ'লেও প্রত্যেকেই কমবেশি অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পেয়ালাতে চুমুক দিতে লাগ্‌লেন।

ঘরের মধ্যে মিনিট দুই এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে লাগ্‌ল কিছু একটা ব'লে এই কুণ্ঠার গুরু ভার লাঘব ক'রে দেয়; কিন্তু কেউই যেন ভেবে পাচ্ছিল না কি বলা যায়। শেষটা মিষ্টার স্মিথ নিজের পূর্ব্ব রূঢ় আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলে উঠ্‌লেন: "কি জানেন মিসেস সিংহ! আমাদের মেয়েরা—শুধু আমাদের কেন, সব দেশের মেয়েরাই—যুদ্ধের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, ঘরে বসে, আরাম কেদারায় শুয়ে, উল বুন্‌তে বুন্‌তে মনে করে যে দেশের জন্য যুদ্ধ একটা মস্ত জিনিষ—একটা রোম্যান্টিক ব্যাপার! তাদের যদি দিনের পর দিন পরিখার মধ্যে এক হাঁটু কাদায় ব'সে, হাড়-কাঁপানো আর্দ্র-বায়ুবিদ্ধ হ'য়ে, চারদিকের দানবী লীলার অট্টনাদের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত ভাবে স্বদেশসেবা করতে হ'ত, তা হ'লে তারা বুঝ্‌ত কত ধানে কত চাল। অবশ্য তাদের এ ভুল ধারণার জন্য আমি তাদের তত দোষ দিতাম না। কেননা সংবাদপত্র প্রভৃতিতে সৈন্যদের রোমাঞ্চকর বীরত্ব, শত্রুর জঘন্য পাশবিকতা, যুদ্ধের স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে এত সুন্দর সুন্দর উপকথা লেখা হ'য়ে থাকে যে, অনভিজ্ঞা বিশ্বাসপ্রবণা রমণীর পক্ষে তা অবিশ্বাস করার কোনও কারণই থাকে না। এ কথা আমি জানি এবং মানি। কিন্তু আমাদের ক্ষোভ হয় যখন আমরা দেশে ফিরে হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, যে আমরা যুদ্ধের অমানুষিক যন্ত্রণা বছরের পর বছর ভোগ ক'রে এসেছি ও হত্যাকাণ্ডের উষ্ণনিঃশ্বাস শয়নে স্বপনে উপভোগ করে এসেছি—সেই আমরা যুদ্ধের আসল রূপটি সম্বন্ধে কিছুই জানি নি, কিছুই শিখি নি।"

উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ মিষ্টার স্মিথ একটু কাশ্‌তে লাগ্‌লেন। পল্লব তাঁকে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তে দেখেছিল বটে, কিন্তু এতটা উত্তেজিত কখনও দেখে নি, যদিও মিসেস স্মিথ তাঁকে স্বামীর এরূপ প্রবণতার কথা দু'একবার কথাচ্ছলে বলেছিলেন।

মিষ্টার স্মিথ আজ যেন নিজের একটু আগের রূঢ় আচরণকে সমর্থন করতে গিয়ে আরও বেশি উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাঁর কাশি একটু থাম্‌লে মিসেস স্মিথ স্বামীর অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে একটু বাধা দিতে যাবা মাত্রই মিষ্টার স্মিথ আরও উষ্ণ হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন: "না না এডিথ, আমাকে কথাটা শেষ করতে দাও।... আমি বল্‌ছিলাম কি মিসেস সিংহ! আমাদের ঘরের এই সব আদরিণীগণ ভাবেন যে যুদ্ধ সম্বন্ধে জানেন কেবল তাঁরা—যাঁরা ঘরে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে নিজেদের উচ্চ শ্রেণীর জীব ব'লে মনে ক'রে থাকেন, ও চা-পার্টি, নৃত্য-সভা প্রভৃতিতে সোৎসাহে প্রচার ক'রে থাকেন যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা কাপুরুষতা, দেশদ্রোহিতা, ভণ্ডামি—"

মিসেস স্মিথ বল্‌লেন: "পল—তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ। নইলে আমাকে লক্ষ্য ক'রে এ রকম ভাষা প্রয়োগ করতে তুমি পার্‌তে না। কারণ আমি ওরকম কথা যে কখনও বলি নি—"

মিষ্টার স্মিথ তাঁর অসুস্থ উত্তেজনায় বাধা দিয়ে ব'লে বস্‌লেন: "ঠিক্ অবিকল ঐ কটি কথা উচ্চারণ না করলেই কি এরকম কথা বলা যায় না? ভাবে ভঙ্গীতে আকারে ইঙ্গিতে যে অনেক সময়ে কথার চতুর্গুণ বলা যায়, এ কথা কে না জানে? তোমরা যে ভাবে শত্রুর নিন্দা ও স্বজাতির প্রশংসা কর; যেভাবে যুদ্ধের স্বর্গীয়তা ও শান্তিপ্রিয় লোকের হেয়তা সম্বন্ধে ঢাক পেটাও; এক কথায় যেভাবে নরহত্যা সম্বন্ধে জ্বলন্ত উৎসাহ প্রকাশ কর;—তাতে আমার ত সময়ে সময়ে সত্যিই সন্দেহ হয়, মিসেস সিংহ, যে যুদ্ধ করেছে কারা? আমাদের মতন হৃতসর্ব্বস্ব, নষ্টস্বাস্থ্য ভ্রষ্টলক্ষ্য হতভাগারা, না সোফায় হেলায়িতা, পরচর্চ্চা-নিরতা পরিচারিকাসেবিতা সংবাদপত্র পাঠিকারা?"

মিস স্মিথ একটু অধীরভাবে না ব'লে থাকতে পারলেন না: "বাবা! তোমার মুখে কেবল ঐ কথাই শুনে আস্‌ছি। যেন সত্যিই আমাদের যুদ্ধের সময়ে সংবাদপত্র পড়া ও পরচর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই করতে হয় নি! যুদ্ধের সময়ে ফ্যাক্টরিতে কাজও আমরা করি নি, ট্রাম-বাস্‌ও চালাই নি, রেলের টিকিটও বেচি নি,—শুধু শত্রুর নিন্দা ও স্বজাতির স্তুতিবাদ ক'রেই দেশের দাবী-দাওয়ার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রেখে এসেছি।"

মিসেস সিংহ বল্‌লেন: "সত্যি মিষ্টার স্মিথ, যুদ্ধের সময় মেয়েদেরও কি কিছু ভুগ্‌তে হয় নি?"

মিষ্টার স্মিথ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লেন:

"সংসারে সুখের ন্যায় দুঃখও relative মিসেস সিংহ,—অর্থাৎ তার গুরুত্বের কমবেশির ওপর তার শোচনীয়ত্ব নির্ভর করে। যুদ্ধের কষ্ট যে কি তা যে নিজে জানে নি, তাকে বোঝাব কেমন ক'রে বলুন? জানেন ত The wearer only knows where the shoe pinches? শিশুকে কি পুত্রশোক বোঝানো যায়? আপনাদের কেমন করে বোঝাব বলুন যে শুধু যুদ্ধের অযোগ্য ব'লে গণ্য হবার আকাঙ্ক্ষায় কত শত লোক প্রত্যহ অঙ্গহানি কামনা করেছে? শুধু একবার শুভ্র শয্যায় শোবার স্বপ্নে অবসন্ন সৈনিক রোগ প্রার্থনা ক'রেছে? কামান গর্জ্জনের শব্দে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে শুধু ঘণ্টাখানেকের জন্য নিস্তব্ধতা ভোগ করবার জন্য কত লোক বিধাতার কাছে বধিরতার বর চেয়েছে?...ফ্যাক্‌টরিতে কাজ করা ও ট্রাম চালানো?...ফুঃ! দিনের পর দিন পরিখায় বাস; মাসের পর মাস অর্দ্ধভুক্ত হয়ে থাকা; বছরের পর বছর শুধু যন্ত্রের মত চালিত হওয়া;—তার ওপর প্রত্যহ প্রিয় সহচর বন্ধুর হস্তপদ ও এমন কি ছিন্নমুণ্ড চোখের সাম্‌নে গোলার আঘাতে উড়ে যেতে দেখা—"

বল্‌তে বল্‌তে মিষ্টার স্মিথ হঠাৎ যেন শিউরে উঠ্‌লেন। মিসেস স্মিথ এবার সত্যিই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে স্বামীর স্কন্ধে হস্তার্পণ ক'রে বল্‌লেন: "থাক্ থাক্ পল। তোমার শরীরের...ডাক্তার..."

মিষ্টার স্মিথ একটু আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌লেন: "আমার চক্ষুটি নষ্ট হ'য়ে যখন আমি ভার্দাঁতে হাঁসপাতালে ছিলাম, মিসেস সিংহ, তখন আমার একটি প্রিয় বন্ধু বিকারের ঘোরে কি দেখ্‌ত জানেন? দেখ্‌ত যে তার দেশবাসীর কারুরই ধড়ে মুণ্ড নেই—সে যায়গায় আছে গ্রামোফোনের রেকর্ড—সেগুলো কেবল চীৎকার করছে, শত্রুর মুণ্ডপাত করো, সব মুণ্ডকে রেকর্ড ক'রে দাও। মুণ্ড আবার কি? ও ত বিধাতার সৃষ্টি। মানুষ যে তাঁর চেয়ে বড়। তাই মুণ্ড চল্‌বে না—তার স্থলে রেকর্ড'—"

মিসেস সিংহ এবার সত্যই কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর "things are not what they seem" কথাটিই যে এরূপ ভীষণ আলোচনার জন্য দায়ভাগী হবে, এ কথা অবশ্য তিনি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেন নি। তবু সান্ধ্য প্রীতি-ভোজনের পর এরূপ আলোচনার জন্য তিনি নিজেকে দোষ না দিয়েই পার্‌লেন না। তা ছাড়া যুদ্ধ-প্রত্যাগত কোনও সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধের সম্বন্ধে সাম্‌না সাম্‌নি এত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ তাঁর এই প্রথম। কাজেই যুদ্ধ-প্রসঙ্গ তোলার সময়ে তাঁর একবারও মনে হয় নি যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে দেশভক্তির জন্য বিখ্যাত ইংরাজ জাতি কখনও যুদ্ধের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে এত তীব্র ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। তাই তিনি কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন। মিসেস স্মিথ ও মিস স্মিথও ঠিক্ বুঝতে পারছিলেন না, আলোচনাটি কেমন ক'রে চাপা দেওয়া যায়।

এমন সময়ে হঠাৎ মিষ্টার স্মিথ দুহাত দিয়ে বুকটি চেপে ধ'রে বল্‌লেন: "দরজা খুলে দাও এডিথ—হাওয়া—হাওয়া—সেই বুকের ব্যথাটা আবার—"

বল্‌তে বল্‌তে তিনি চেয়ারের ওপর ঢ'লে পড়লেন। পল্লব চকিতে লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে না ধরলে তিনি হয়ত মাটিতে পড়ে যেতেন।

ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে অর্দ্ধ-অচেতন স্মিথ সাহেবকে তাঁর শয্যায় শয়ন করিয়ে দেওয়া হ'ল।

পল্লব অনেক রাত্রি অবধি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগল "কি সামান্য পরিহাসের কি শোচনীয় পরিণতি!...একটি সামান্য কথার পরিণামে মানুষের জীবনে কি গভীর ট্রাজিডির সৃষ্টি হ'তে পারে, তারই কূলকিনারা আমরা ঠাহর করতে পারি নে...অথচ...ভাবি...যে আমরা সর্ব্বশক্তিমান্। মানুষ কি অসহায়...অথচ...কি দর্পান্ধ!' [ক্রমশঃ]

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি-ই

২০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে গরীবের বাসস্থান ও বস্তি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ভাবে রাখা যাইতে পারে, সেইজন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী ও সাধারণ জমীদার-মণ্ডলী ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে কিরূপে মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-

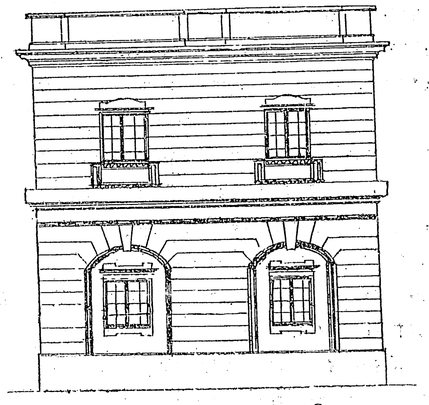

নূতন ধরণের স্বাস্থ্যকর সস্তা বাড়ী

কর গৃহে রাখা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তার ও ভাবনায় বিষয় হইয়াছে। এবং তাহাই সার্ব্বজনীন ভাবে বিবেচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

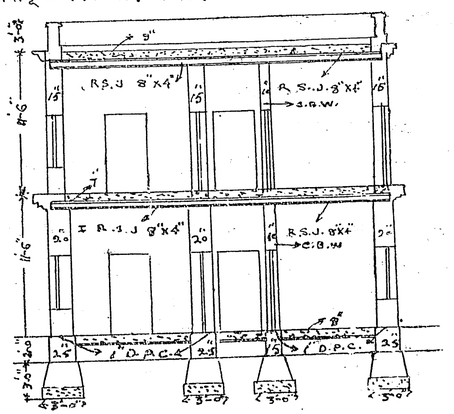

সস্তা বাড়ীর নক্সা

অধুনাতন স্বাস্থ্য বিষয় লইয়া প্রায়ই সকলেই চিন্তা করিতেছেন ও কিরূপে সাধারণ লোকে স্বাস্থ্যবান হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন। যেমন খাদ্য সামগ্রী স্বাস্থ্য রক্ষার একটি প্রধান উপকরণ, তেমনই স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসও একটি অপরিহার্য্য বিষয়।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে আমি নিম্নে কিছু বলিতে চাই।

যেরূপ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সামগ্রীর দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়, সেইরূপ স্বাস্থ্যকর ভাল বাড়ী প্রচুর পরিমাণে

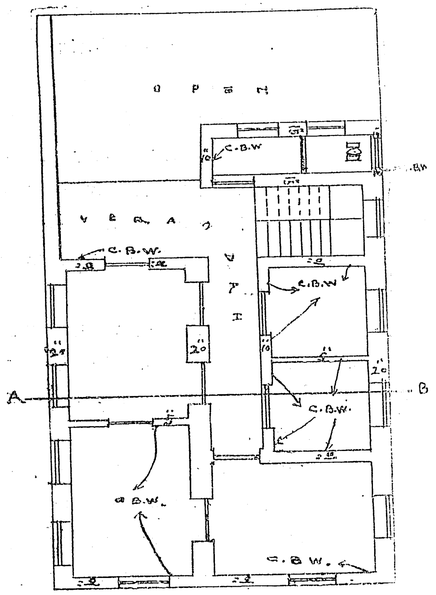

গ্রাউণ্ড প্ল্যান

না থাকায়, এই রকমের বাড়ীর ভাড়া অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে শতকরা ৯০ জন অস্বাস্থ্যকর ও বিপদ-জনক বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হয়। এবং বাড়ীওয়ালারাও, যত কম জায়গার মধ্যে যত বেশী ঘর তৈয়ারী করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টায় থাকেন। ফলে কোন ঘরেই হাওয়া আলো প্রবেশ করিবার পথ পায় না! কলিকাতার মধ্যে শতকরা ৫০ খানি বাড়ীতে এইরূপ অবস্থায় দিনের বেলায়ও আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। ইহার

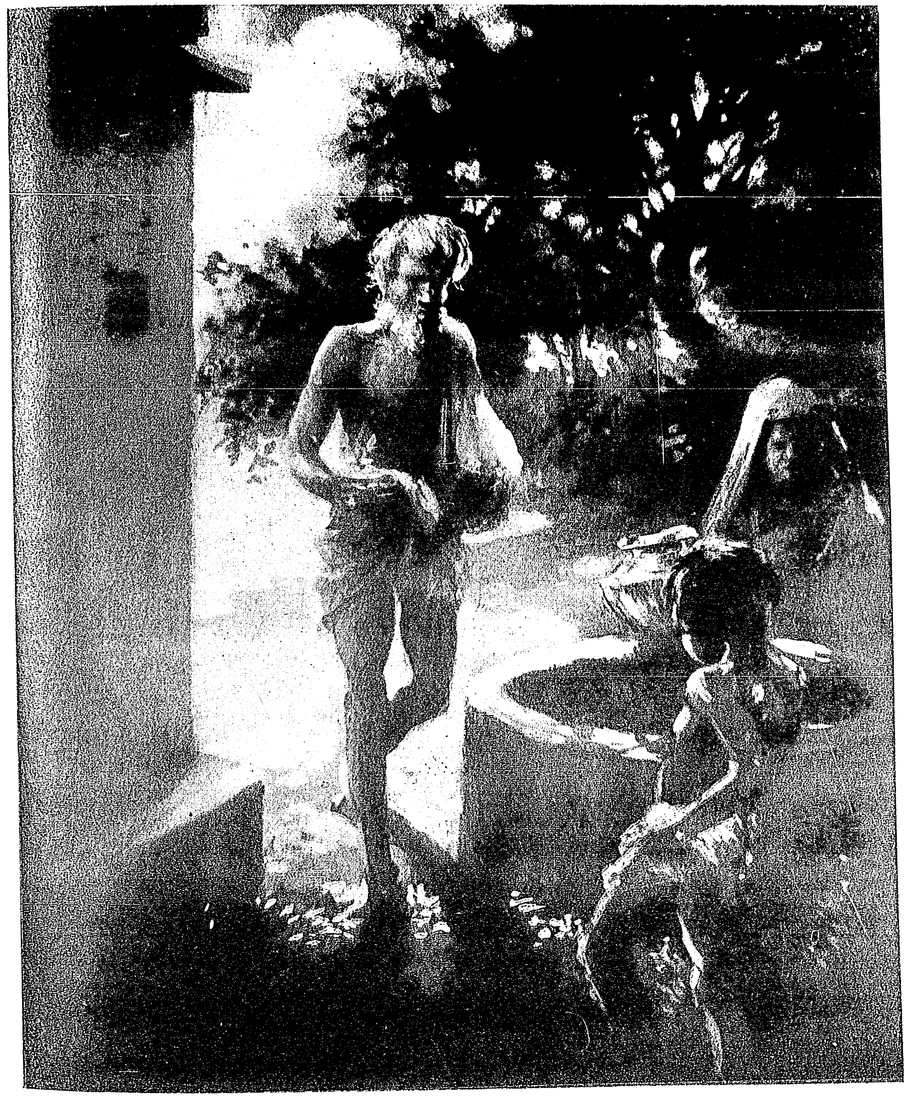

আলোর খেলা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র কর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

মধ্যে ছেলেদের ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিতে হয়। এবং ইহারই জন্য, যখন কোন মহামারী আরম্ভ হয়, তখনই মৃত্যু-সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, সস্তায় স্বাস্থ্যকর বাড়ী নির্ম্মাণ করা। তাহা হইলে বাড়ীওয়ালারাও তাঁহাদের টাকার ন্যায্য আয় পাইবেন, ভাড়াটিয়ারাও আয় অনুসারে ভাড়া দিতে পারিবেন।

এই ভাবে কার্য্য করিতে হইলে কেবল সাধারণ বাড়ী-ওয়ালাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; কতকগুলি Co-operative society চালাইলে কার্য্য ভালরূপ হইতে পারে। এখন কলিকাতায় দুই-তিনটি society আছে, যাহারা এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিতেছে। তন্মধ্যে হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ সোসাইটী এই ভাবে প্রচুর পরিমাণে বাড়ী তৈয়ার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

এই সম্বন্ধে এঞ্জিনিয়ারদের উচিত, যত সস্তায় সম্ভব সেই ভাবে বাড়ীর design করা ও এইরূপ বাড়ী তৈয়ারী করিতে সাহায্য করা। আমি ঐ রূপ কতকগুলি বাড়ীর নক্সা ও নির্ম্মাণ খরচের হিসাব এই 'ভারতবর্ষে' দিয়াছিলাম। ঐ রূপ আর একটী বাড়ীর নক্সা নিম্নে দেওয়া গেল।

ইহাতে মোট ১ কাঠা ২০ ছটাক জমী আবশ্যক। বাড়ীটি দোতালা, নীচে ৩ খানি ঘর,—একটী রান্না ঘর ও একটী ভাঁড়ার ঘর, ও স্নানের ঘর ও পায়খানা।

উপরেও এই রূপই বন্দোবস্ত—কেবল রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের উপর একটী মাত্র ঘর।

এই বাড়ীটি তৈয়ার করিতে মোট টাকা ৭০৫৯৲ খরচ হইবে; নিম্নে হিসাব দেওয়া গেল—

নম্বর	কার্য্যের তালিকা	মাপ	দর	মোট দাম
১।	মাটী কাটাই	১৬৫০ ঘনফুট	১০ টাকা প্রত্যেক শত ঘনফুট	১৬৲ টাকা
২।	বনিয়াদ ভরাই	১৩৩২ ঐ	১০৲ ঐ	১৩৲
৩।	চূণ খোয়া পেটাই	৫৫৬ ঐ	৪৫৲ ঐ	২৪৯৲
৪।	ভিতে গাঁথনির কাজ	১২৭০ ঐ	৪৮৲ ঐ	৬৫৮৲
৫।	একতলার গাঁথনি	২৫৭২ ঐ	৫০৲ ঐ	১২৮৫৲
৬।	দ্বিতলের ঐ	১৯৮২ ঐ	৫২৲ ঐ	১০২৮৲
৭।	সিমেণ্ট ড্যাম্পপ্রুফ ফোর্স	২৪৩ বর্গফুট	১৫৲ ঐ	৩০৲
৮।	একতলার পার্টিসনের ৫ ইং সিমেণ্টের গাঁথুনি	১৬৮ ঐ	।৵০ বর্গ ফুট	৬৩৲
৯।	দ্বিতলের পার্টিসনের ৫ ইং সিমেণ্টের গাঁথুনি	১৬৮ ঐ	॥০ ঐ	৮৪৲ টাকা
১০।	বালী কাজ	৭৮০৮ ঐ	৪॥ প্রতি ১০০ বর্গ ফুট	৩৫২৲
১১।	তিন কোট চূণকাম্	৫৪২৬ ঐ	৸০ ঐ	৪০৲
১২।	এককোট অন্তরের উপর দু কোট জলের রং	২৭৬৩ ঐ	১৲ ঐ	২৭৲
				৩৮৪৫৲

নম্বর	কার্য্যের তালিকা	মাপ	দর	মোট দাম
	জের.....			৩৮৪৫৲
১৩।	এক্‌খান ইটের উপর ৪ ইং টেরেশ কন্‌ক্রিট ফ্লোর	৬৬০ বর্গফুট	২৫৲ প্রতিশত বর্গফুট	১৬৪৲
১৪।	দ্বিতলে দু পরদা টাইলের উপর ৪ ইং টেরাস কন্‌ক্রিট ফ্লোর	৬৬০ ঐ	৪৫৲ ঐ	২৯৪৲
১৫।	দ্বিতলে দু পরদা টাইলের উপর ৬ ইং টেরাস কন্‌ক্রিট ছাদ,	৬৭৪ ঐ	৬০৲ ঐ	৪০৭৲
১৬।	একতলার চৌকাট এবং দ্বিতলের চৌকাট	৪৯ ঘন ফুট	৬ টাকা প্রতি ১০০ বর্গফুট	২৯৲
১৭।	নকল প্যানেল দরজা ও জানালা	৬৭৬ বর্গ ফুট	১৲	৬৭৬৲
১৮।	কড়ি (কন্টিনেণ্টাল)	২৫·৬ হন্দর	৮৲	২০৫৲
১৯।	টোনায়ন ও আরকিটেকচার	৭.৬ ঐ	১২৲	৯১৲
২০।	বরগা ২½″+২½″+⅛″ (কন্টিনেণ্টাল)	১৪·০ ঐ	৯৲	১২৬৲
২১।	জানালায় লোহার গরাদে	৪·৯ ঐ	১২৲	৫৪৲
২২।	৩ ইং পাইপ	১১০ রাঃ ফুট	৸০	৮২৲
২৩।	১২ ইং কারনিস্	৯৯ ঐ	১॥০	১০৮৲
২৪।	৬ ইং প্যারা পেট্	১৩৮ রাঃ ফুট	॥০	৬৯৲
২৫।	লোহা ও কাঠে রংএর কাজ	২৬৭২ সোঃ ফুট	৫৲	১৩৪৲
২৬।	বেড় সেটাল্	২৪	২৲	৪৮৲
২৭।	ভেটি লেটার	২৪	॥০	১২৲
২৮।	সিঁড়ি	১টী		২০০৲
২৯।	সাইট ক্লিয়ার	১টী		৫০৲
৩০।	স্যানিটারী কাজ	১টী		২০০৲
				৭০৫৯৲

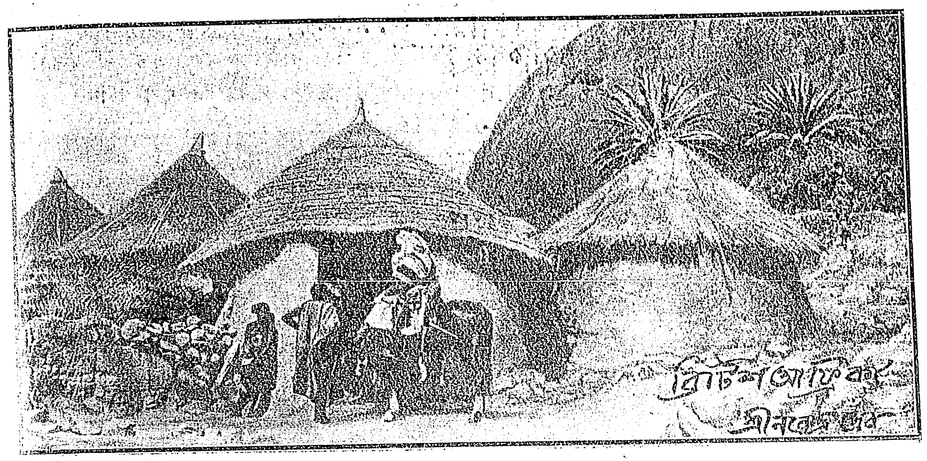

বাউটীর দোগারী (দারোগা পুলিশ !)

(২)

ইংরাজের অধীনে আসবার পর থেকে কাফ্রীরা ধীরে ধীরে সভ্যতার দিকে পা বাড়াচ্ছে। এখন তারা আইন আদালত মানতে শিখেছে। চুরি ডাকাতি ও খুন জখমের মামলার বিচার ও তার দণ্ড তারা গ্রহণ করেছে। কায়িক সাজা সেখানে প্রচলিত থাকলেও কাফ্রীরা ওটাকে তেমন গুরুতর বলে মনে করেনা, কিন্তু জনসমাজে অপমানিত বা হাস্যাস্পদ হওয়াটাকে তারা সব চেয়ে বেশী ভয় করে। এই জন্য গুরুতর অপরাধীদের কায়িক কোনও দণ্ড না দিয়ে তাদের প্রকাশ্যে অপমান করা হয়। এতে শাসককে শাসিতের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ ক'রতে হয়না ; অথচ দোষীর একেবারে মর্ম্মান্তিক সাজা হয়।

অতি সামান্য কারণে এদের মধ্যে এমন ভীষণ কলহ উপস্থিত হয় যে, সে কলহ অবিলম্বে একটা খুনোখুনি দাঙ্গা বা মারামারিতে পরিণত হয়। সময়মত এই ঝগড়া যদি

বোনুর কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ।

নিবারণ করা না হয়, তা হ'লে সত্বর উভয় পক্ষের দলবৃদ্ধি হ'য়ে সেটা একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের ব্যাপার হয়ে ওঠে। তবে একটা সুরাহা এই যে, এরা মারামারি করতেও যেমন

তৎপর, আবার মিটমাট ক'রে ফেলতেও তেমনি উৎসাহী। এদের একটা মহৎগুণ এই যে, এরা কখনও কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে রাখেনা। প্রতিহিংসা-পরায়ণতা বা

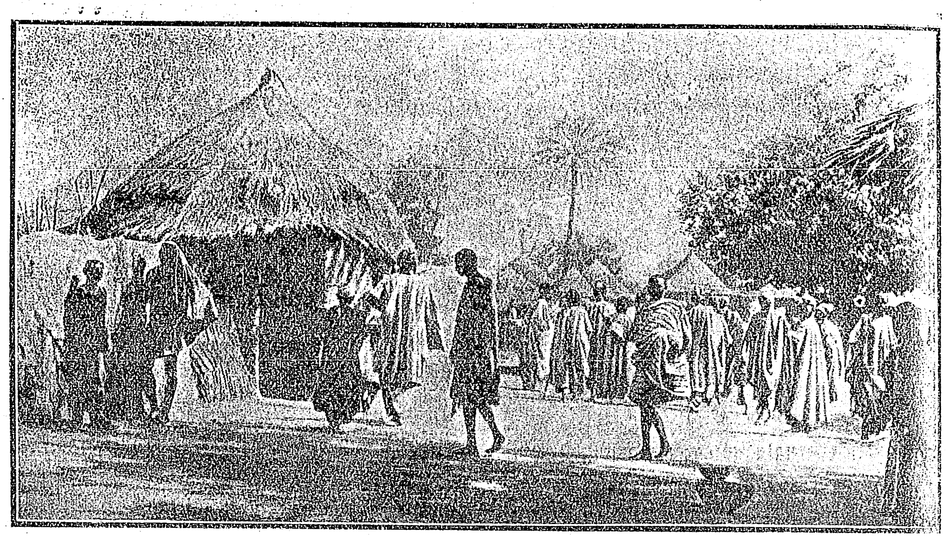

নাকাদার মুসলমান কাফ্রীগণ।

প্রতিশোধস্পৃহা এদের মধ্যে একেবারেই নেই। ঝগড়া বিবাদ এরা যখন করে, তখন করে; কিন্তু তার পর সব ভুলে যায়।

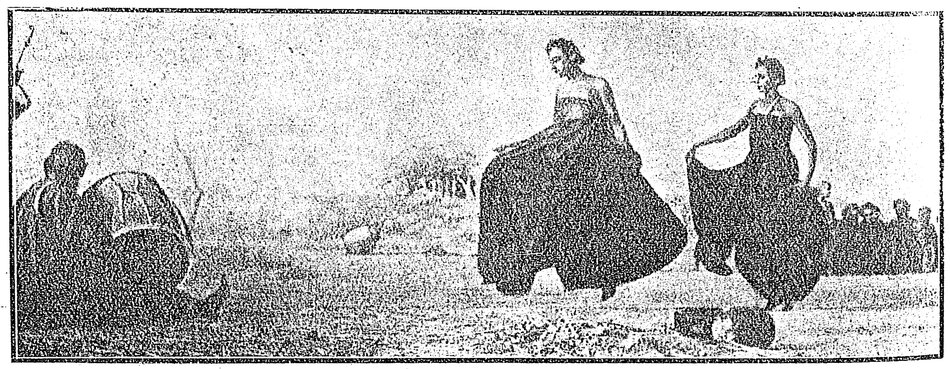

বোর্নুর কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ।

অপকার এদের মনে থাকেনা বটে, কিন্তু উপকার এরা চিরদিন স্মরণে রাখে। শিশুর মত সরল ও দেবতার মত উদার প্রকৃতির এই জাতটা কিন্তু বিলাতী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে। ব্রিটীশ আফ্রিকার বিষুব প্রদেশের অবস্থা এত বিভিন্ন রকমের যে, প্রত্যেক স্থানটি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্যুদান ও রূডলফ্ হ্রদের চারিপার্শ্বস্থ কেনীয়া প্রদেশের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণে কালাহারী প্রদেশ একেবারে মরু স্থান বললেই চলে। পশ্চিমে অনবরত এমন আঁধী উড়ছে যে, এক শত গজ তফাতে আর কিছু সেখানে দেখা যায় না! এই পশ্চিমে বাতাস শুধুই যে কেবল ধুলো বালিতে ভরা তাই

বোর্নুর কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ

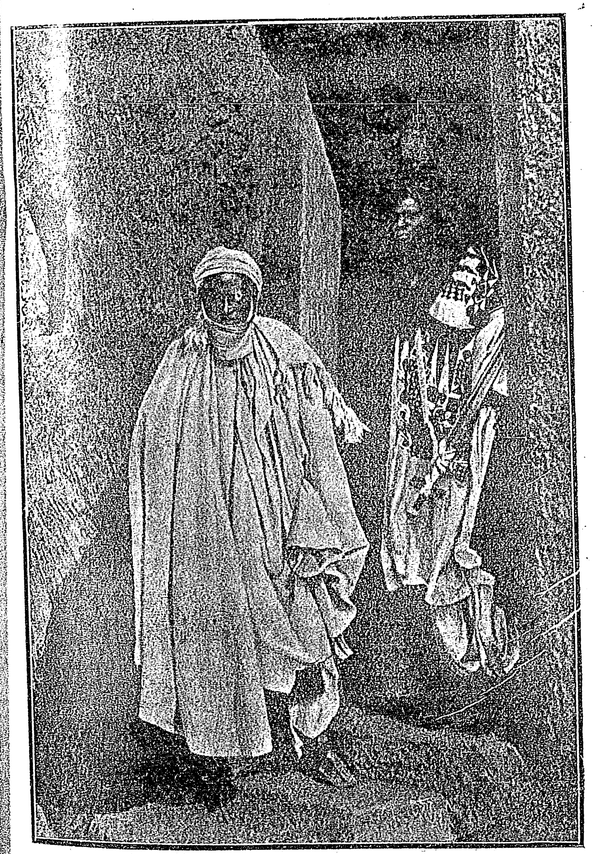

শোকোতোর সুলতান (কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র পোষাকে সুলতান পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন, সম্মুখে তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান শ্বেত পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান)

নয়, এমন বিষম শুক্‌নো যে, এই বাতাসের টানে মোটা পিস্‌বোর্ডের বাঁধানো বই-গুলো পর্য্যন্ত গুটিয়ে কুঁকড়ে যায়। রাত্রে আবার এমন ঠাণ্ডা পড়ে যে, সাহারা সীমান্তবর্ত্তী চাদ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থানে মাঝে মাঝে তুষারপাত হ'তেও দেখা যায়! এই সকল প্রদেশের তুলনায় আবার বিষুবরেখান্তর্গত স্থানের তরল উত্তাপ ও মুষলধারে বৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার পরিচয় দেয়। নাইগেরীয়ার উত্তর সীমান্তে গায়দাম অঞ্চলে মোটে পনর ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; কিন্তু সেখান থেকে কিছু দূরে দক্ষিণের ফর্কেদো অঞ্চলে বৃষ্টি হয় একেবারে ১৬০ ইঞ্চি! সুতরাং আফ্রিকার কোথাও ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ও তথায় প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয় এবং কোথাও একেবারে তৃণগুল্মহীন।

এই প্রাকৃতিক বৈপরীত্যই সেখান-কার আবহাওয়ার পার্থক্যের প্রধান কারণ। তা ছাড়া, স্থানের অত্যধিক উচ্চতা ও নিম্নতা এবং বড় বড় হ্রদের অবস্থানও এজন্য অনেকটা দায়ী। এক ভিক্টোরিয়া হ্রদই আয়তনে প্রায় সমগ্র আয়র্লণ্ডের সঙ্গে সমান। এই হ্রদটি সমুদ্রের সমতল থেকে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু! এই হ্রদের ঠিক মধ্যভাগ

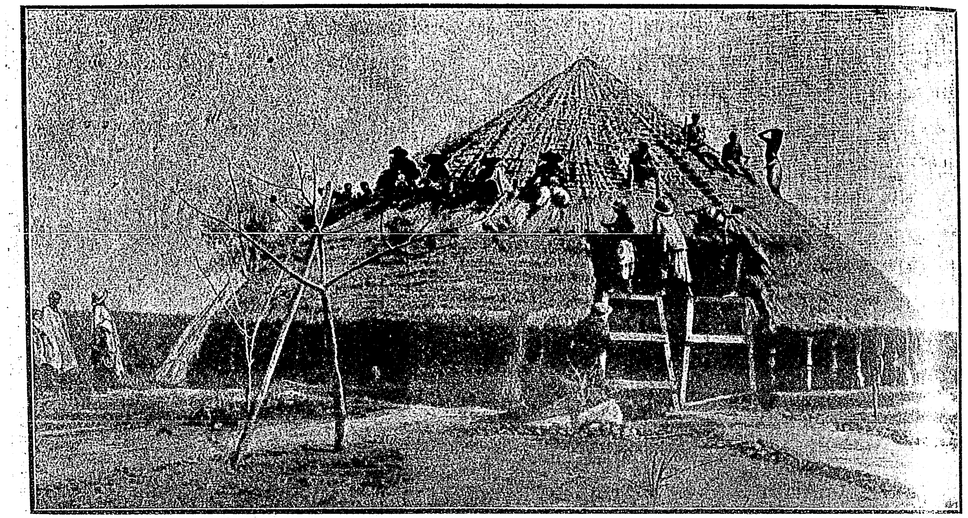

ন্যুপের আটচালা (মধ্য-নায়গেরীয়ার উত্তরে ন্যুপ্‌জাতীয় কাফ্রীরা বাস করে। এরা সপরিবারে বাস করবার জন্য বিরাট আটচালা নির্ম্মাণ করে)

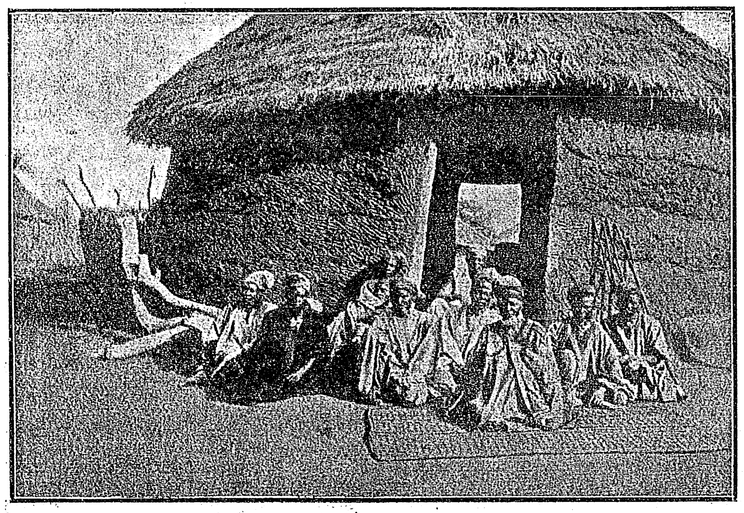

"কাতাম্বা।" (গৃহ-প্রবেশের তোরণ-দ্বারকে কাফ্রীরা 'কাতাম্বা' বলে। মাকুবা সর্দ্দার-গৃহের তোরণদ্বারে সমবেত সহকারিগণ।

ক'রতে শেখে। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কালো পাথরে খোদা পুতুলের মতো উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি কোথাও ছোট ছোট কুঁজো কলসী ক'রে খাবার জল তুলে আনছে, কোথাও উনুন ধরাবার জন্য শুক্‌নো ডাল পালা কুড়িয়ে আনছে, কোথাও বা তুলো সংগ্রহ ক'রছে।

গ্রামে শিল্পকার্য্যের মধ্যে তাঁত বোনা হয়, কাপড় রং হয়, কামারের কাজও চলে খুব। তীর ও বর্ষাফলক নির্ম্মাণই

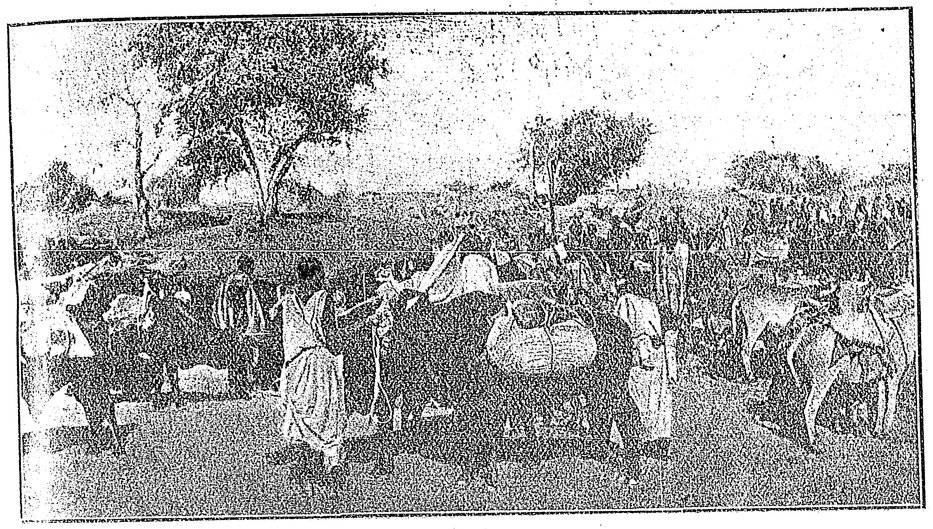

বোর্ণুর বাজারে (হাটের দিন যে যার বলদের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে ব্যাপারীরা বোর্ণুর বাজারে এসেছে)

এদের প্রধান কাজ। চ্যাটাই ও চিয়াড়ীর ঝুড়ি ঝোড়া বোনাও একটা বড় শিল্প। য়ুলাণ্ডায় কিছু দিন পূর্ব্বেও গাছের ছাল পিটে কাফ্রীরা পরিধেয় বল্কল প্রস্তুত করতো। এ ছাড়া এক একটা গ্রাম যে এক একটা বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তাদের সে সুযশ অপহরণ করবার জন্য কেউই চেষ্টা করে না। যেমন

চ্যাটাইয়ের হাটে (বোর্ণুর হাটে বড় বড় চ্যাটাই বিক্রয় হয় এই চ্যাটাইগুলির বুনানী ভারি সুন্দর ; নানা রঙীণ কারুকার্য্য করা)

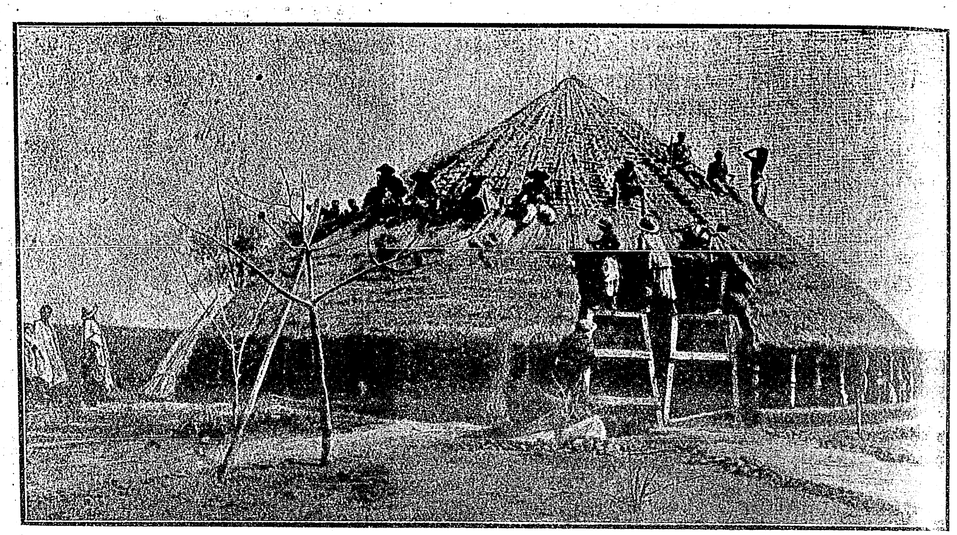

ন্যুপের আটচালা (মধ্য-নায়গেরীয়ার উত্তরে ন্যুপ্ জাতীয় কাফ্রীরা বাস করে। এরা সপরিবারে বাস করবার জন্য বিরাট আটচালা নির্ম্মাণ করে)

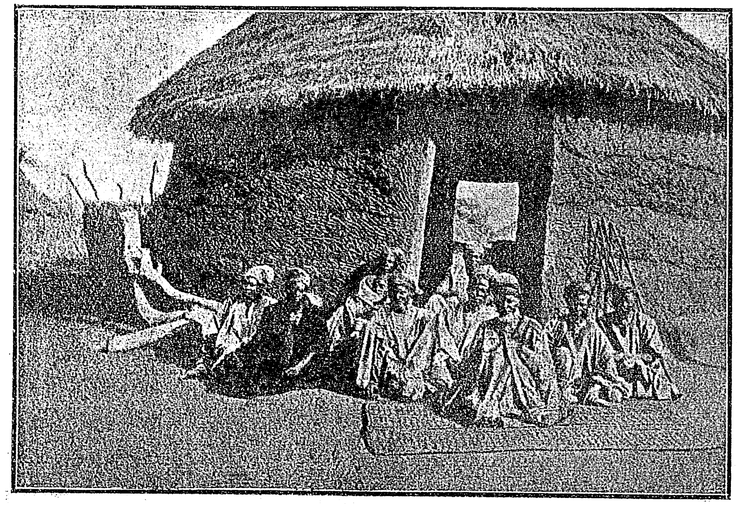

"কাতাম্বা !" (গৃহ-প্রবেশের তোরণ-দ্বারকে কাফ্রীরা 'কাতাম্বা' বলে। মাকুবা সর্দ্দার-গৃহের তোরণদ্বারে সমবেত সহকারিগণ।

ক'রতে শেখে। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কালো পাথরে খোদা পুতুলের মতো উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি কোথাও ছোট ছোট কুঁজো কলসী ক'রে খাবার জল তুলে আনছে, কোথাও উনুন ধরাবার জন্য শুক্‌নো ডাল পালা কুড়িয়ে আনছে, কোথাও বা তুলো সংগ্রহ ক'রছে।

গ্রামে শিল্পকার্য্যের মধ্যে তাঁত বোনা হয়, কাপড় রং হয়, কামারের কাজও চলে খুব। তীর ও বর্শাফলক নির্ম্মাণই

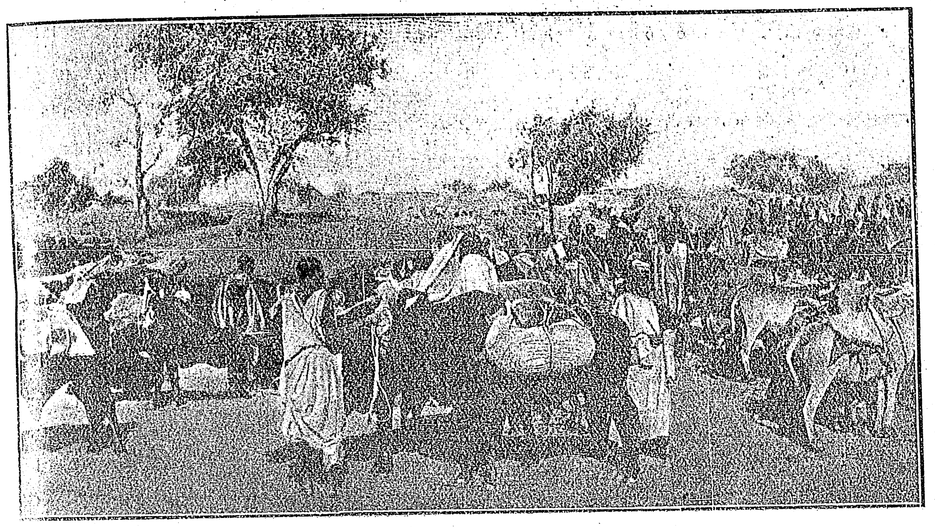

বোর্ণুর বাজারে (হাটের দিন যে যার বলদের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে ব্যাপারীরা বোর্ণুর বাজারে এসেছে)

এদের প্রধান কাজ। চ্যাটাই ও চিয়াড়ীর ঝুড়ি ঝোড়া বোনাও একটা বড় শিল্প। য়ুলাণ্ডায় কিছু দিন পূর্ব্বেও গাছের ছাল পিটে কাফ্রীরা পরিধেয় বল্কল প্রস্তুত করতো। এ ছাড়া এক একটা গ্রাম যে এক একটা বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তাদের সে সুযশ অপহরণ করবার জন্য কেউই চেষ্টা করে না। যেমন

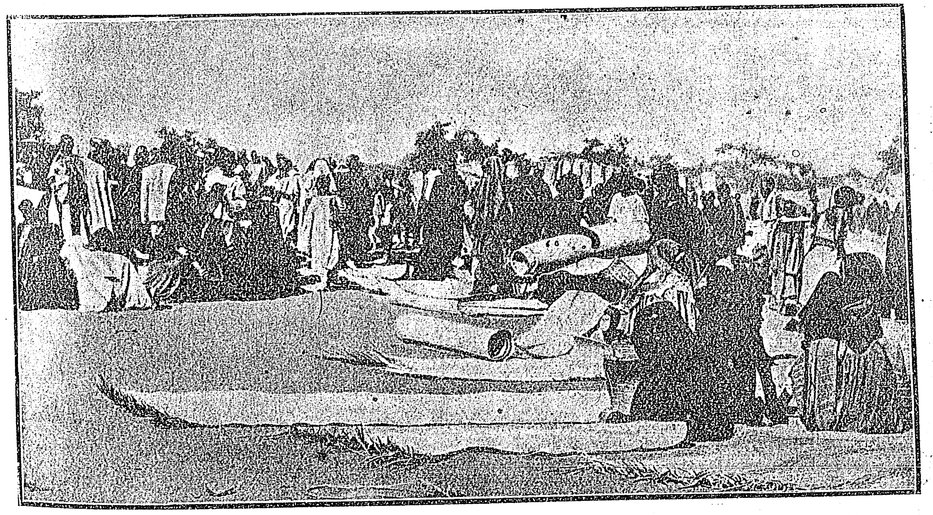

চ্যাটাইয়ের হাটে (বোর্ণুর হাটে বড় বড় চ্যাটাই বিক্রয় হয় এই চ্যাটাইগুলির বুনানী ভারি সুন্দর ; নানা রঙীণ কারুকার্য্য করা)

একটা গ্রাম কেবল সুন্দর সুন্দর মাটির হাঁড়ী কলসী মালসা গামলা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত। একটা গ্রাম কেবল লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। একটা গ্রাম কেবল চামড়ার কাজেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে! এই রকম অন্যান্য বিষয়েও।

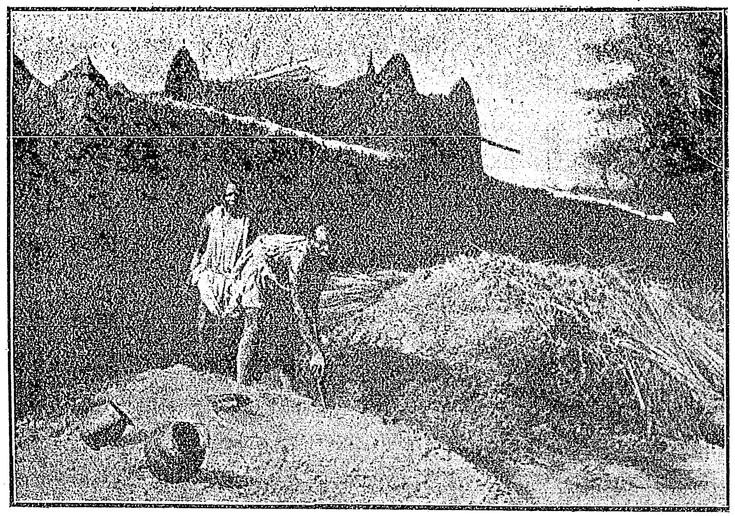

নাইগেরীয়ানদের গৃহ নির্ম্মাণ। (দেওয়াল তৈরী করবার জন্য মাটি মেখে কাদা তৈরী করা হচ্ছে)

চাষের কাজ শেষ হলেই তাদের বার্ষিক লম্বা ছুটা সুরু হয়। এই সময় তাদের মধ্যে কোনও কোনও জাত বৎসরের প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউলে সুরা প্রস্তুত করে' পানোন্মত্ত হ'য়ে কাটিয়ে দেয়। এই পানোৎসবে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিয়ে মত্ত পুরুষদের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

আজকাল দেখতে পাওয়া যায় যে, এই ছুটীর সময়টা অনেকেই কিছু উপরি রোজগার করবার চেষ্টায় থাকে। কেউ এই সময় নিকটস্থ

আমীর-সম্মেলন (নববর্ষের দরবারে ব্রিটিশ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশের আমীরগণ সমবেত হয়েছেন। মধ্যস্থলে বোর্ণর শেহ বা সুলতান দণ্ডায়মান)

কোনও য়ুরোপীয়দের খনিতে বা কারখানায় অস্থায়ীভাবে মজুরী করতে আসে, কেউ কোনও একটা ছোটখাটো ব্যবসাও করে। বিশেষ যাদের বার্ষিক কিছু খাজনা দিতে হয়, তাদের এই ছুটীর সময়টার একটা কিছু ক'রে সেই খাজনার টাকাটা সংগ্রহ ক'রতেই হয়। কারণ এইটুকু মেটাতে পারলেই সারা বছর সে আর কারুর তোয়াক্কা রাখে না! ঘরে তার পেটের ভাত সম্বৎসরের জন্য বাঁধা আছে।

ইংরাজ আফ্রিকায় পদার্পণ করবার পূর্ব্বে সেখানে এতটা নিরাপদে শান্তি উপভোগ করবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। গাঁয়ে গাঁয়ে দলা-দলি, মারামারী লেগেই থাকতো। এ তো কার ছেলে বউকে টেনে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে নিজেদের ভিতরের দাঙ্গাহাঙ্গামার ফ্যাসাদ। সদাই সশঙ্কিত ও সতর্ক হ'য়ে তাদের রাত্রিবাস করতে গেলো

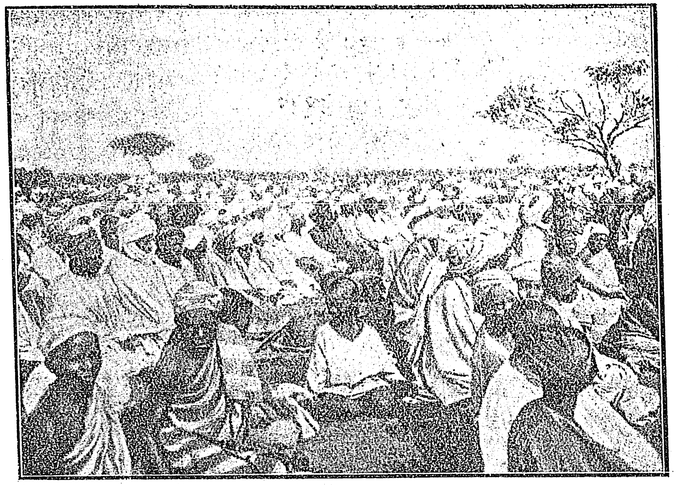

'শল্লা' পর্ব্ব (ন্যুপের কাফ্রীরা সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। 'শল্লা' পর্ব্বের দিন নুপ্যের সমস্ত মুসলমান আমীর সাহেবের সঙ্গে নমাজ পড়বার জন্য সমবেত হয়)

উত্তর নাইগেরীয়া (আমীরের অশ্বারোহী কর্ম্মচারিগণ)

হ'তো। আরবদের নিষ্ঠুরতা স্মরণ ক'রে এখনও এদের অনেকেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারা যে কেবল ডাকাতের দলের মতো এসে পড়ে এক একটা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—গ্রামের সমস্ত জোয়ান স্ত্রীপুরুষ ও ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতো, এবং বুড়োদের মেরে আধমারা করে অনাহারে শুখিয়ে মারার জন্য বেঁধে ফেলে রেখে দিয়ে যেতো তাই নয়; যাদের তারা ধরে নিয়ে যেতো, তাদের প্রতিও পথে যে দারুণ অত্যাচার ক'রতো, তা জগতের সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতাকে লজ্জা দিতে পারে!

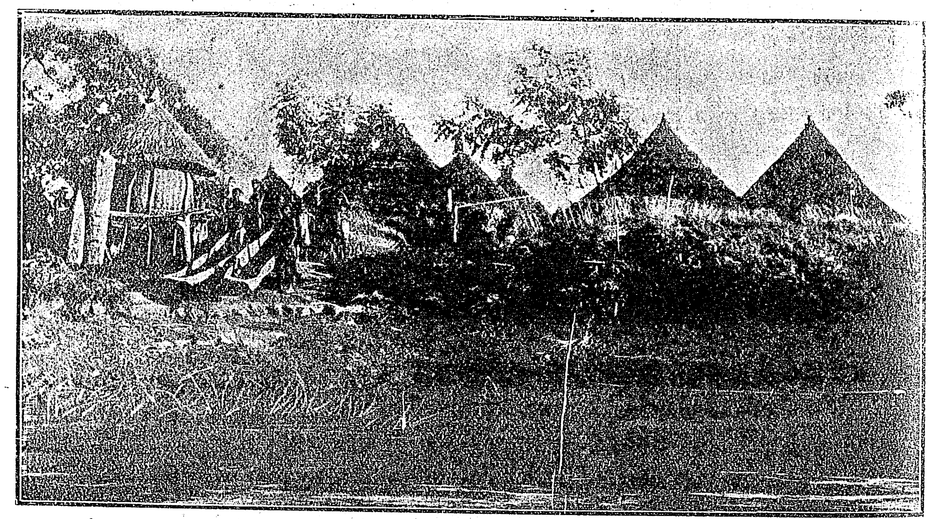

বেণু নদী-তীরে (বেণু নদীতীরে কাফ্রী জেলেদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এরা মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি কুঁদে এক রকম ছোট ছোট নৌকা প্রস্তুত করে, এবং সেই নৌকা নিয়ে গিয়ে বেণু নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে)

একটা দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে তুলে দিচ্ছি—একবার এই নৃশংস আরব দস্যুদের একটা দল কোনও গ্রাম থেকে জনকতক তরুণ-বয়স্ক নরনারীকে দাস ব্যবসায়ের জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় পথে তাদের ন্যায়সা হ্রদের নিকটবর্ত্তী একটা জলা-ভূমি পার হ'য়ে যেতে হয়েছিল। এই জলাভূমির এক প্রান্তে বিস্তীর্ণ শর বন, অপর প্রান্তে অসংখ্য কুম্ভীর শুয়ে রৌদ্র তাপে দেহ উষ্ণ করে নিচ্ছিল। বর্ব্বরদের এই স্থানে এসে হঠাৎ একটু মজা দেখবার সখ হ'ল। তারা ধৃত নরনারীদের সেই শরবন ও কুম্ভীরকুলের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে শরবনে আগুণ ধরিয়ে দিলে, এবং দূরে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় উঠে মজা দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে, লোকগুলোর কি অবস্থা হয়। হতভাগ্য বন্দীরা যদি কুম্ভীরের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য শরবনে এসে ঢোকে, তাহলে আগুনে পুড়ে মরবে; আর আগুনের ভয়ে যদি জলের দিকে যায়, তা হ'লে সেই অসংখ্য বুভুক্ষু কুম্ভীরের গ্রাসে তাদের জীবন দিতে হবে! বুঝুন তাদের কী অবস্থা! শয়তানেরা মহা উল্লাসে তাদের এই দুর্দ্দশা উপভোগ করতে লাগল! ওরই মধ্যে যে দু'একজন প্রাণ ভয়ে ছুটে প্রজ্বলিত শরবন ও কুম্ভীরের গ্রাস এড়িয়ে পথে উঠে আসছিল, নর পিশাচেরা গাছের উপর থেকে পশুর মতো তাদের গুলি ক'রে মারছিল। ইংরাজ আফ্রিকা দখল করে আর কিছু করুক আর নাই করুক, এই আরব দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার থেকে কাফ্রীদের রক্ষা করেছে।

সাময়িকী

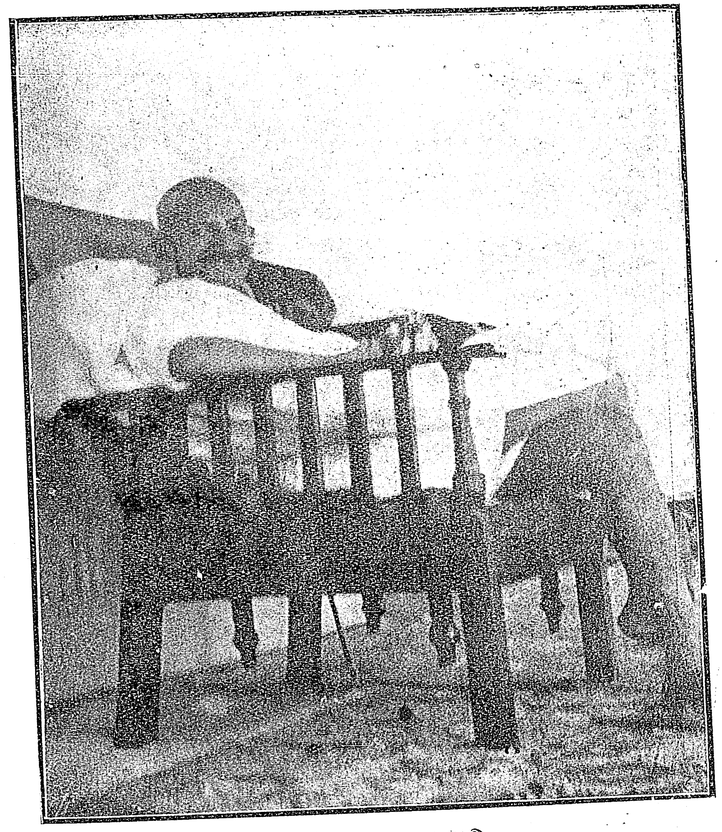

দার্জ্জিলিংয়ে মহাত্মা গান্ধী

(চিত্তরঞ্জনের শেষ প্রবাস ভবন ষ্টেপ-এসাইডে ৫ই জুন গৃহীত)

Photo by—Sj. Subodh Dutta, Darjeeling.

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ডেপুটী মেয়র ও অল বেঙ্গল ইয়ংমেন্স্ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট
শ্রীযুক্ত এইচ্, এস্ সারাওয়ার্দ্দি

এবার 'ভারতবর্ষ' যে মহাপুরুষের পবিত্র আলেখ্যে তাহার প্রচ্ছদ-পট সুশোভিত করিল, তাঁহার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করা একেবারেই অনাবশ্যক। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এখন বিশ্ববিদিত; এক সম্প্রদায় এখন তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার চরণে ভক্তি-ভরে প্রণত হন। এই ভাদ্র মাসেই সেই মহাপুরুষের তিরোভাব হয়। আমরা ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ধন-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার উপর সংগৃহীত হইয়াছে! এখনও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দরকার। ভবানীপুরে যে বাড়ীতে চিত্তরঞ্জন বাস করিতেন, সে বাড়ী এক্ষণে দেনার দায়ে আবদ্ধ আছে। দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে সেই বাড়ী দায়মুক্ত করিয়া সেখানে রোগিনীদিগের জন্য একটী আশ্রম ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী মহোদয় এই ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন; দেশের লোকও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মহাত্মা আগামী ইংরাজী মাসের প্রথমেই বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তৎপূর্ব্বেই যাহাতে এই দশ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়, ইহাই তাঁহার

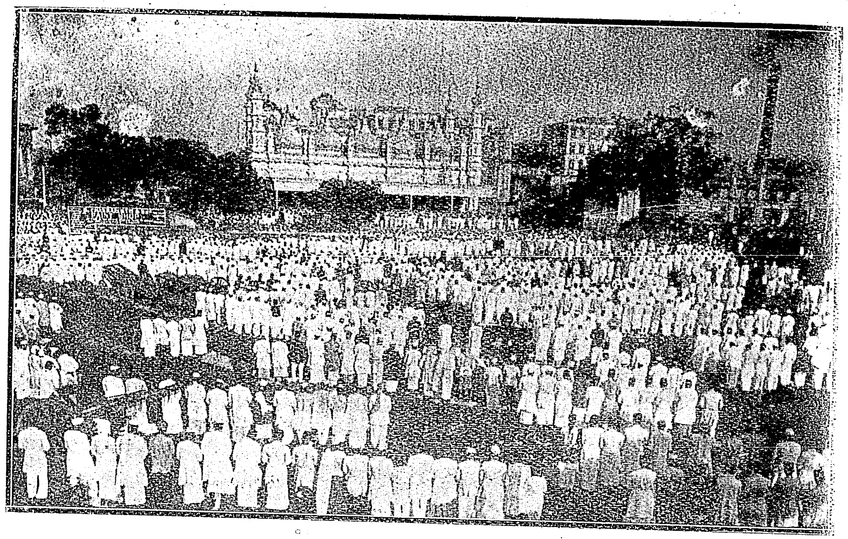

বক্‌রিদ্-উৎসব—ধর্ম্মতলা মস্‌জিদ Photo by—Mr. T.P. Sen

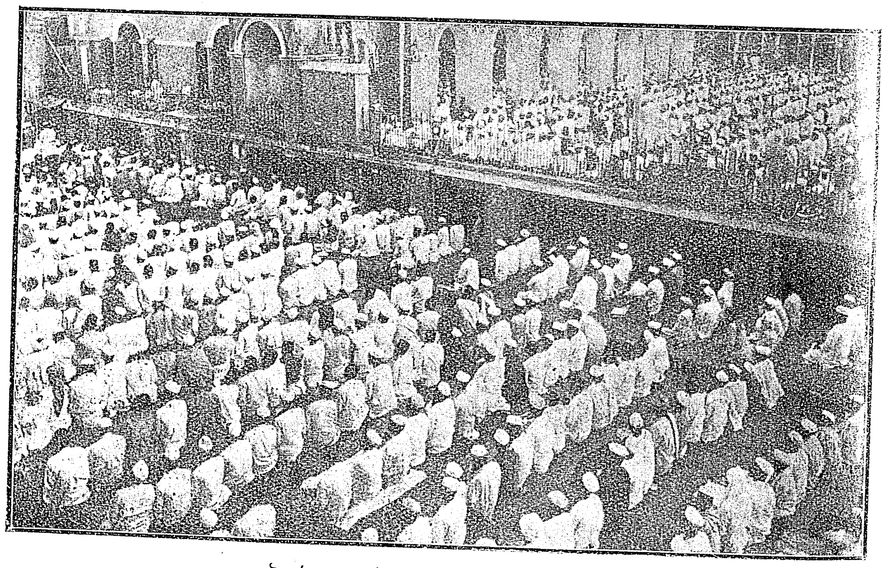

ইদ্ উপলক্ষে উপাসনা—নাখোদা মস্‌জিদ Photo by—Mr. T. P. Sen

বাসনা। আমাদের আশা আছে তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ হইবে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির মেয়রের পদ শূন্য হইয়াছিল। অনেকে

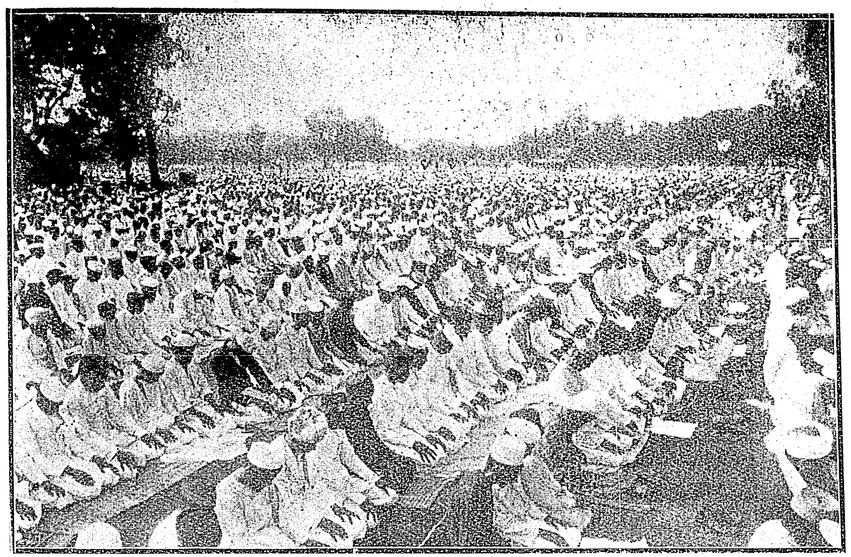

ইদ্ উপলক্ষে ময়দানে উপাসনা (১)

Photo by—Mr. T. P. Sen

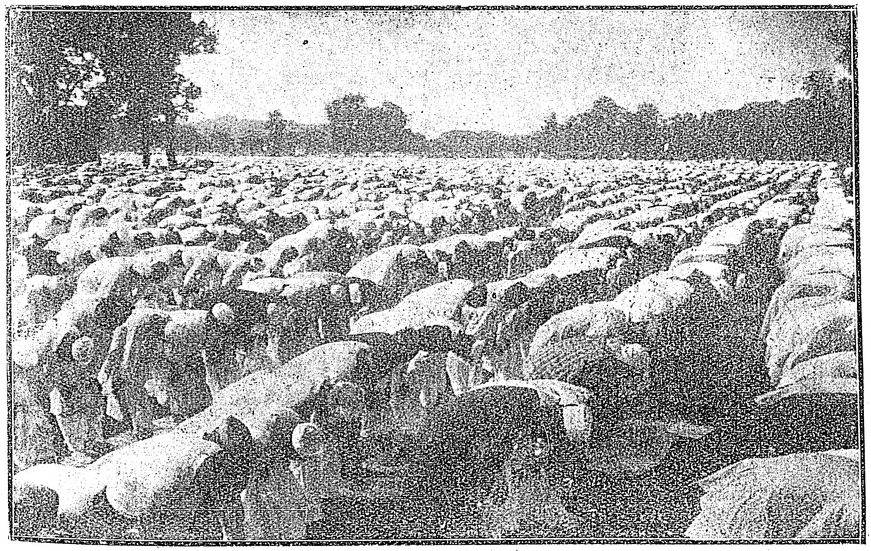

ইদ্ উপলক্ষে ময়দানে উপাসনা (২)

Photo by—Mr. T. P. Sen

উত্তরপাড়ায় হেমচন্দ্র-স্মৃতি-ফলক উন্মোচন

এ পদের প্রার্থী ছিলেন। মিউনিসিপাল কাউন্সিলগণের অধিকাংশের মতে স্বরাজ-নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মেয়র পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সংশ্রবে ছিলেন না; এইজন্য প্রথমে তাঁহাকে অল্‌ডারম্যান নির্ব্বাচিত করিয়া পরে তাঁহাকে মেয়র পদ প্রদান করা হইয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত সারাওয়ার্দ্দি মহাশয়দ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আশা করি তাঁহারা পরলোক-গত মেয়র দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

কিছুদিন হইল ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিটি (Taxation Enquiry Committee) বসাইয়াছেন। কমিটির সদস্যগণ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেকের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোন ট্যাক্স কমানো বা বাড়ানো যাইতে পারে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। এই কমিটির নিকট কয়েকজন সাক্ষ্য-দান সময়ে বলিয়াছেন যে, জমীদারী আয়ের উপর ট্যাক্স বসানো উচিত। এখনও কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু, এই কয়েকজনের মন্তব্য শুনিয়াই এ দল জমীদার ভীত হইয়াছেন। বঙ্গীয় জমিদার-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনই এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এদেশের জমীদারগণকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী বড় পাকা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"In this connection the landed classes must work with their tenantry in devising ways and means for the amelioration of the distress of all classes of people and in carrying further the banner of the social gospel of co-operation and its ideals so that every locality may feel interested in and try to solve its own problems." ইহার ভাবার্থ এই যে, জমীদারগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা প্রজাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যাহাতে সকলের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা। ইহাই ত জমীদারগণের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে অবহিত হইলেই দেশের দুর্দ্দিন নিশ্চয়ই ঘুচিয়া যাইবে।

স্বরেন্দ্রনাথ

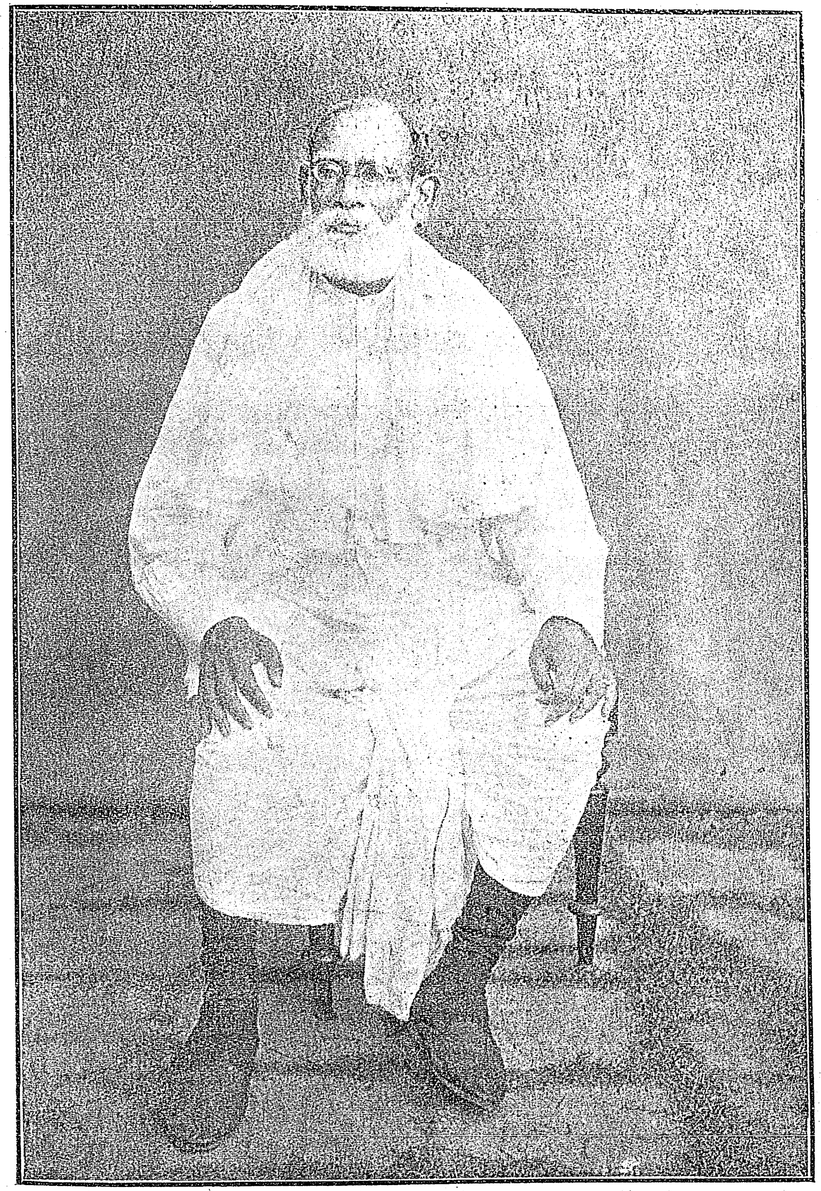

৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে মহাপুরুষগণ নব্য-ভারতের জাগরণ-মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যাঁহারা ভারতের নব-প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়াছিলেন—যাঁহাদের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার বলে জাতীয় জীবনের দুন্দুভি-নিনাদে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতবাসীর নয়ন উন্মীলিত হইয়াছিল, একে একে তাঁহাদের সকলেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; অবশিষ্ট যিনি ছিলেন, তিনিও বিগত ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ দেড়টার সময় বারাকপুরে ভাগীরথীতীরে, ৭৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন;—তিনি বাঙ্গালার, ভারতের মুকুটমণি দেশপূজ্য **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।** বিদ্যালয় তথা বাঙ্গালার শিক্ষা-সাধনার কর্ণধার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অতি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন—হাহাকারে দিঙমণ্ডল পূর্ণ হইল। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ বাঙ্গালীর গৌরব ছিলেন, ভারতের স্পর্দ্ধার আধার ছিলেন। তাঁহার অভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইল, বাঙ্গালী সমাজের যে মুকুটমণি খসিয়া পড়িল, আর কি তাহার পূরণ হইবে? তাহার পরই গেলেন ভূপেন্দ্রনাথ! স্থিরধী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, অধ্যবসায়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ—ভূপেন্দ্রনাথ কত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অনন্ত-পথের যাত্রী হইলেন। তাহার পর এই সেদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল, হিমালয়ের শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল;—দারজিলিঙের

সুরেন্দ্রনাথের মৃতদেহ

সত্যসত্যই বাঙ্গলা দেশের আজ বড়ই দুর্দ্দিন! বিগত দেড় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ কত রত্ন যে হারাইল, কত হৃদয়ভেদী হাহাকারে যে বাঙ্গালার গগন-পবন মুখর হইল, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, তাহা ভাবিলেও শরীর অবসন্ন হয়, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইতে হয়। এই দেড় বৎসরের মধ্যে প্রথমে গেলেন সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়; অমন ধীর স্থির শান্ত, মনীষী, স্বদেশপ্রেমিক কি আর মিলিবে? চৌধুরী আশুতোষের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই একেবারে বাঙ্গালীর মহাপুরুষ, প্রতিভার কাঞ্চনশৃঙ্গ, অনন্যসাধারণ কর্ম্মী, বাঙ্গালার বাঘ, কলিকাতা বিশ্ব-শৈলশিখর বাঙ্গালীর সাধনার ধন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিল, সমগ্র দেশবাসী নর-নারীর আকুল ক্রন্দনে, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না; বাঙ্গালী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তাহার পরই বাঙ্গালার, ভারতের স্বদেশী মন্ত্রের পুরোহিত, সেকালের দেশনায়কগণের শেষ স্মৃতি সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

কিন্তু, এ সময়ে ত সুরেন্দ্রনাথের চলিয়া যাইবার কথা ছিল না। এই যে সেদিন, দুই মাস পূর্ব্বে যখন মহাত্মা গান্ধী বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া

মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছিলেন "আমি ৯১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকিব," সে কথা ত স্থির রহিল না;—দুই মাস যাইতে না যাইতেই মহাকালের আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথকে পরপারে যাত্রা করিতে হইল। যে সকল সঙ্কল্প এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, যাহা সংসাধনের জন্য এই ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ যুবকের ন্যায় উৎসাহ, উদ্যম, দৃঢ়তার সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ত ঘটিল না;—সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা সেদিন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে ভস্মাবশেষ হইয়া গেল; বাঙ্গলার সুরেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালীর সুরেন্দ্রনাথ, ইংরাজের Surrender Not সব ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন; বাঙ্গলা দেশের একটা দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইলেন,—একটা তেজোময় জ্যোতিষ্ক আকাশের কোলে বিলীন হইয়া গেল।

মনে পড়ে, সেই বহুদিন পূর্ব্বের কথা, যখন সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও রমেশচন্দ্র সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা দিবার জন্য একসঙ্গে সমুদ্রপারে যাত্রা করেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনজনই সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে প্রত্যাগমন করেন।

মনে পড়ে, শ্রীহট্টে দুই বৎসর কার্য্য করিবার পর সামান্য অপরাধে সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়; তিনি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

মনে পড়ে, সুধু মনে পড়ে কেন, এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপন্ন সুরেন্দ্রনাথকে আশ্রয় প্রদান করেন; তাঁহাকে নিজের কলেজে দুইশত টাকা বেতনে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। আমরা তখন কলেজের ছাত্র।

মনে পড়ে, সুরেন্দ্রনাথের সেই বাগ্‌বিভূতি—সেই অতুলনীয় বাগ্মিতা, সেই উন্মাদনাময়ী বাক্যচ্ছটা। আমরা স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তখন তাঁহার অস্ত্র। এই যুবকদলকে যেন তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চালিত করিতেন। তাঁহার সেই তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনিবার জন্য দেশের যুবকমণ্ডলী কোথায় না গিয়াছে; কি কষ্ট না স্বীকার করিয়াছে। তিনি তখন বাঙ্গালীর যুবকদলের অধিনায়ক ছিলেন; তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিত। তিনি বাঙ্গালা দেশকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন—সকলকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে, ভারত-সভার (Indian Association) প্রতিষ্ঠা-দিনের কথা। যেদিন ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার একমাত্র পুত্র পরলোকগত হইল। (শ্রীমান্ ভবশঙ্কর তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই) এই সংবাদ কলিকাতায় প্রচারিত হইলে সকলে মনে করিলেন, সেদিন আর ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হইবে না। কিন্তু, যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত হইলেন। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা আগে—তাহার পর গৃহে গমন করিয়া হৃদয়ভেদী পুত্রশোকে অশ্রু বিসর্জ্জন! সকলে সবিস্ময়ে সুরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন—সুরেন্দ্রনাথের সিংহাসন দেশবাসীর হৃদয়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইল।

মনে পড়ে, আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের জন্য কারাবাস! সে দৃশ্য যে এখনও আমাদের চক্ষের সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। সহস্র সহস্র লোক সেদিন হাইকোর্টে বিচারফল জানিবার জন্য উপস্থিত। অনেকেরই মনে হইয়াছিল, বিচারে তাঁহার সামান্য অর্থদণ্ড হইবে। তাই পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টে উপস্থিত। আরও কত মহানুভব ব্যক্তি টাকা লইয়া গিয়াছিলেন;—যত টাকা জরিমানা হয়, তাহাই দিয়া দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে খালাস করিতে হইবে। তাহার পর যখন শুনিতে পাওয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের জন্য দেওয়ানী কারাবাস হইল, তখন সে কি উত্তেজনা, কি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলেজের ছাত্র। তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া ছাত্রগণ ডফ কলেজে যে সভা করেন, সেই সভায় আশুতোষ যে উন্মাদনাময়ী বক্তৃতা করেন, তাহা এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইলে সে যে কি উল্লাস! তাহারই ফলে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন!

মনে পড়ে, জাতীয় মহাসমিতির কথা। ১৮৮৫ অব্দে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে প্রথম জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ সে অধিবেশনে

উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার পর বৎসর ১৮৮৬ অব্দে কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতার কথা কোন দিন আমরা ভুলিব না। সেই হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথই তখন কংগ্রেস;—সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত না হইলে হয় ত অধিবেশনই পণ্ড হইত;—সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি তখন সুরেন্দ্রনাথের উপর নিবদ্ধ! সুরেন্দ্রনাথ তখন সত্যসত্যই জনগণ-মন-অধিনায়ক!

মনে পড়ে, বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির কথা! সুরেন্দ্রনাথ তার স্বরে ঘোষণা করিলেন, বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন সাহেবের আদেশ অমান্য করিয়া "বন্দে-মাতরম্" গান করিয়া শোভাযাত্রা করিতেই হইবে। সুরেন্দ্রনাথ শোভাযাত্রার অধিনায়ক হইলেন; যুবকেরা আহত হইল; সুরেন্দ্রনাথ ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নীত হইলেন; তিনি সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন,—যে দণ্ড হয়, তাহাই স্বীকার করিবেন বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইল।

মনে পড়ে, লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের কথা। সে যে কি আন্দোলন! সে আন্দোলন, সে উন্মাদনার অধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ! সে স্বদেশী-মন্ত্রের হোতা সুরেন্দ্রনাথ! বাঙ্গালা দেশময় সে কি তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল! বিদেশী দ্রব্য ত্যাগের সে কি জ্বলন্ত উৎসাহ! আর সেই জন-প্রবাহের, সেই স্বদেশ-তরণীর কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ! সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বজ্রনির্ঘোষ! অবশেষে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইল। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বিজয়ী বীরের মত দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিলেন—তাঁহাকে 'মুকুটহীন-রাজা' (Uncrowned King of Bengal) বলিয়া দেশবাসী অভিনন্দিত করিল।

তাহার পর—তাহার পর মনে পড়ে, এই সেদিনের কথা। মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হইল। দেশের লোক এ সংস্কার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। ভবিষ্যৎ স্বরাজ লাভের প্রথম বায়না, প্রথম সূচনা বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই সংস্কারকে সাদরে বরণ করিলেন; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন;—তাঁহাকে 'সার' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। দেশের স্বরাজপন্থী-দল তাঁহাদের দেশনায়ক, তাঁহাদের স্বদেশ-তরণীর কর্ণধারের এই কার্য্য নীরবে গ্রহণ করিলেন না;—পঞ্চাশ বৎসরের অধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ অগ্রগামী দলের উন্মাদনায়, আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিলেন না—তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল।

তাহার পর—তাহার পর মনে পড়ে, বাঙ্গালাদেশের প্রতিনিধি-সভার সদস্যপদের জন্য ভোট সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথের শোচনীয় পরাজয়!

আজ কিন্তু সব শেষ! বাঙ্গলা-বিজয়ী রাষ্ট্রনেতা, অদ্বিতীয় বাগ্মী, মনস্বী সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য নীরব হইলেন;—ভাগীরথী তাঁহার প্রিয় পুত্রের শ্মশান-ভস্ম বুকে করিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়া গেল;—রহিল সুরেন্দ্রনাথের অবদান! আজ তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। ইংরাজ বীরের কথা পুনরুক্ত করিয়া বলিতেছি—

"Surendranath, with all thy faults we love thee still!"

পরলোকে হিরণ্ময়ী দেবী

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম যে, শিক্ষা-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী দেবী গত ১৩ই জুলাই সোমবার বালীগঞ্জস্থ ভবনে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। হিরণ্ময়ী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথমা কন্যা। জীবিতকালে তিনি দেশহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মহিলা শিল্পাশ্রমে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে শতাধিক নিঃসহায় বিধবা তাঁহাদের জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সরলা দেবীর সহযোগে "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

গড্ডলিকা, পরশুরাম-রচিত।—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন-অঙ্কিত ২৯ চিত্র সহিত। দাম পাঁচ সিকা।

একজন লেখক মানবজাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—গাধা ও শৃগাল। কিন্তু আমরা এই মত মানিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে পরশুরামের স্থান হয় না। তিনি শৃগাল কর্ত্তৃক প্রত্যহ সংসারে গাধা ভক্ষণ দেখিয়া হাসিতেছেন এবং আমাদের হাসাইতেছেন। জগতে কতপ্রকার মেকি চলিতেছে, পরের অর্থে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে; এবং আর সকলেই যেন গড্ডলিকার প্রবাহের ন্যায় কিছু না ভাবিয়া, যখন যে দিকে একজনের ঝোঁক হয়, সেই দিকে ছুটিয়া যায়,—ইহা পাঁচটি অতি রমণীয় ব্যঙ্গচিত্রে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "পরশুরামের" কুঠারের তীক্ষ্ণ ধারে বাটপাড় জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, হোম্‌ব-চোমরা ডাক্তার, ধর্ম্মধ্বজী বক মহাশয়, সূক্ষ্মদর্শী প্রেততত্ত্ববিদ্ দার্শনিক, আড্ডাধারী গুলী (খুড়ী, খুড়ী, সিগারেট) খোর, কেহই নিস্তার পায় নাই। অথচ তাঁহার নির্ম্মল সৌম্য হাস্যে কাহারই অন্তরে বেদনা রাখিয়া যায় না। এই জন্যই না কালিদাস পরশুরামকে—

"স-সোম ইব ধর্ম্ম দীধিতি"

অর্থাৎ একাধারে সূর্য্যের খর দীপ্তি ও চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতির সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। আমাদের পরশুরামও তাহাই। বঙ্গবাসীর টি, এন্, মুখুজ্যের পর এই গ্রন্থের "ভুশণ্ডীর মাঠে"র মত বিমল হাস্যের ভৌতিক গল্প আর পড়ি নাই; অথচ মধ্যে এক স্থলে "ঘাটের কথা" (? অথবা "মহামায়া")র একটি বর্ণনার উপর গুপ্ত ছুরী মারাও হইয়াছে। লেখক মহাশয় রবির গদ্যপদ্যের রসে আপ্লুত, এবং সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রেরও বেশ অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত। "বৃথা ছাগ"এর উপর টীকাটি কপিরাইট করা উচিত।

আমাদের অন্তঃপুরে "লম্বকর্ণ" বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। আহা, বেচারার উপর সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি। প্রবীণ আড্ডাধারী চাটুয্যে মহাশয় তাঁহার এনাটমিকাল্ পরীক্ষা করিয়া "খাসা কালিয়া" করিবার পাঁতি দিলেন; নবীন রায়জাদা ষ্টেণ্ট্ তাহার মেটুলী চাহিয়া রাখিল; অজানিত ভাবে একটা বিয়োগান্ত নাটক না হইয়া গেলে বেলেঘাটা কেরানিন ব্যাণ্ড তাহাকে গন্ধর্ব্বলোকে পাঠাইত; চুকন্দর সিংহ তাহারই জন্য মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল; আর স্বয়ং রায়-বাঘিনী ("রায় বাহাদুরের স্ত্রী" ইত্যমরঃ) তাহাকে বিশ্বাসন-দণ্ড দিলেন। কিন্তু কোঠী অবিশ্বাস করিবার কি ভীষণ ফল দেখুন,—সেই লম্বকর্ণই রায়বাহাদুর ও রায়-বাঘিনীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিল, তাহার শিং সোনা দিয়া মোড়ান হইয়াছে, তাহার দাড়ি এখনও লম্বা হইতেছে! "আল্লা কালী যিশুর দিব্য" অথবা ততোধিক কোন "শক্তি"র ভয়ে কেহ তাহাকে ছুঁইতে পারে না। নিয়তি সর্ব্বত্র, হাল ফেসানের ইংরাজী শিক্ষিতেরা বিশ্বাস করুন আর না করুন।

লম্বকর্ণের দাড়ির মত এই গড্ডলিকার শ্রেণী আরও বাড়িতে থাকুক, বঙ্গীয় পাঠকের একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা বৃদ্ধি হউক। আমি শুধু একটি দিকে পরশুরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দিতেছি। সেটি ইঙ্গ-বঙ্গ স্বামীজীর দল। গেরুয়া রঙ্গের রেশমী মোজা ও আলখোল্লা, শৈলাবাসে পুরা সাহেবী পরিচ্ছদ (সোলার হ্যাট পর্য্যন্ত!) সুদূর প্রদেশে স্বামীজীর জন্য রেলে দুই দুই দিন পরে ইলিশ মাছ আসে, এবং কলিকাতা হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে পার্শেলে চেকোস্লেট আসিতেছে; আর বাঙ্গলার আমরা যত মধ্যবিত্ত শ্রমী লোক তাহার খরচ যোগাইবার জন্য চাঁদা দিতেছি। এক্ষেত্রে কি পরশুরাম নীরব থাকিবেন? না—

দুষ্ট সর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ
রোষিতোস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ?

এই নব্য বাবাজীদের বিক্রম কম নয়; অনেক মোহন্তকে হার মানাইয়াছে। ত্রাহি পরশুরাম!

শ্রীযদুনাথ সরকার

শ্রীঅরবিন্দের গীতা।—শ্রীঅনিলবরণ রায় অনূদিত। মূল্য দেড় টাকা।—শ্রীযুত অনিলবরণ রায় প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দের গীতা" আমি যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছি। স্বনামখ্যাত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যান ও বিবৃতি করিয়া যে ইংরাজি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, অনিলবরণ বাবুর গ্রন্থ সেই পুস্তকের অনুবাদ। এ অনুবাদ কার্য্যে গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; কারণ গ্রন্থ পড়িয়া অনেক স্থলেই ইহা অনুবাদ বলিয়া অনুভব হয় না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে গীতার বিশেষ উপযোগিতা আছে। অতএব গীতার যতই আলোচনা ও অনুশীলন হয় ততই ভাল। বিশেষতঃ সে আলোচনা যদি শ্রীঅরবিন্দের মত সাধনোজ্জ্বল বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয়, তবে তাহার সার্থকতা সমধিক। জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে গীতার অনেক মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং গীতা-রহস্যের অনেক প্রচ্ছন্ন গুহ্য নবালোকে উদ্ভাসিত দেখিবেন। একজন সৎপুরুষ গীতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—It has several octaves of meaning (গীতার্থের কয়েকটী বিভিন্নস্তর বা গ্রাম আছে।) আমরা যেমন যেমন সাধনায় উচ্চতর গ্রামে উঠিব, গীতার নবতর ভাব তেমনি আমাদের চিত্তে ফুটিয়া উঠিবে। গীতা

সম্পর্কে শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই—'শ্রীঅরবিন্দের গীতায়' অনেক নূতন কথা নূতন ভাবে বলা হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মুঘল বিদুষী।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। ২য় সংস্করণ, মূল্য ।৵০।

এই পুস্তকে বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম এবং আওরংজীব-দুহিতা জেবউন্নিসার জীবনী এবং গ্রন্থ পরিচয় আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং প্রথমবারকার রচনা আমূল সংশোধন এবং ইতিমধ্যে যে সব নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, লেখক চিন্তার পর যে সব নূতন মতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের সত্যান্বেষণের প্রগাঢ় চেষ্টা, প্রকৃত ইতিহাস রচনার পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা, এবং আশু-লভ্য খ্যাতি ও অর্থ ত্যাগ করিয়া গবেষণার সাধনায় সকল শক্তি নিয়োগের স্পৃহা তাঁহার গ্রন্থগুলিই বারবার প্রমাণ করিয়াছে। প্রতি নূতন সংস্করণে কষ্টসাধ্য আমূল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আরও দেখাইতেছেন যে সত্যপথের যাত্রীর বিশ্রাম নাই, ইতিহাস-চর্চ্চায় শেষ কথা কোথায়ও নাই; শুধু ক্রমোন্নতিই এই ব্রতের মূলমন্ত্র। বাঙ্গলায় এ দৃষ্টান্ত দেখান আবশ্যক হইয়াছে। চরিত দুটি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে এবং বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট জ্ঞানের মন্দিরের একটী অপরিচিত মনোরম কক্ষ খুলিয়া দিয়াছে। ইংরাজী ও ফার্সীতে এ বিষয়ে যত উপাদান আছে তাহার কিছুই এই পুস্তকে বাদ যায় নাই। জেবের জীবনীটির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযদুনাথ সরকার

সাথী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা। ইহা একখানা গার্হস্থ্য উপন্যাস। বিজয়বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক; গল্প বলিবার ভঙ্গীতে তাঁহার নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়—নারী ধনরত্ন বিভব কিছুই চাহে না, চাহে কেবল হৃদয়। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী, দাসদাসীপরিবৃতা, কোন অভাবই নাই; অথচ যেখানে প্রেম নাই তাহাতে নারী তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার অতৃপ্ত হৃদয় ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা ভাবে তাহার দয়িতকে পাইবার জন্যই দুটি ব্যাকুল বেদনাকাতর বাহু বিস্তার করে। এই বইখানি বাঙালী পাঠককে আনন্দ দিবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আর বাঙালী পাঠিকাদের সুশীলার করুণ কাহিনী পড়িতে পড়িতে একাধিকবার নয়ন সজল হইয়া উঠিবে।

বেদান্ত পরিচয়।—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। যিনি এই বেদান্তের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পরিচয় বা তাঁহার পুস্তকের পরিচয় প্রদান করা একান্তই অনাবশ্যক। মনীষী, পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে জানেন না, বা তাঁহার লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী পড়েন নাই, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী অতি কমই আছেন। নানা সাময়িক পত্রে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই 'বেদান্ত পরিচয়' প্রকাশিত হইয়াছে। এমন করিয়া সংগ্রহ না করিলে পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই জ্ঞানগর্ভ লেখাগুলি খুঁজিয়া পাঠ করা সহজসাধ্য হইত না। এই পুস্তকখানি যে বেদান্ত পাঠকের বিশেষ সহায়তা করিবে, এমন কি অনেকের অনেক অনুসন্ধিৎসা পূরণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর কথারই পুনরুক্তি করিতেছি—বেদান্তবাক্য যত বার শুনা যায়, ততই শ্রেয়।

কার্পাস-শিল্প।—শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত। মূল্য বার আনা। কাহার পরিচয় আগে দিব—পুস্তক-লেখকের, না পুস্তকের? পুস্তকের কথাই আগে বলি। গ্রন্থকার এই পুস্তকে আমাদের দেশের কার্পাস-শিল্প বা বস্ত্র-শিল্পের অবনতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং কি করিলে ঐ শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারও কথা বলিয়াছেন। এক কথায়, যাহাতে ঘরে ঘরে চরখা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশবাবু এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। আমাদের দেশের কার্পাস-শিল্পের ইতিহাস সত্যসত্যই জানিবার বিষয়। বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের কৃপায় কেমন করিয়া এই শিল্পের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে কি যে মনে হয়, তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু এই চরখা ও খদ্দর প্রচারের জন্য একাগ্রচিত্তে কাজ করিতেছেন, বিষয়কর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি এই কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টায় তিনিই মহাত্মা গান্ধী ও সার প্রফুল্লচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; আর এই খানি প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি বড় চাকুরী ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যবসায়ের ফল এই কার্পাস-শিল্প। এমন বই ঘরে ঘরে থাকা চাই।

দেশভক্তি।—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা। এখানি অধ্যাপক সমাদ্দার সম্পাদিত স্বর্ণময়ী পর্য্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে প্রকাশিত গল্পগুলি মূলতঃ বৈদেশিক ঘটনা হইতে গৃহীত হইলেও, দেশভক্তির গৌরবে সেগুলি উজ্জ্বল। গল্পগুলির লেখক যখন নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমরাও নাম ধরিয়া প্রশংসা করিব না। লেখক যিনিই হউন, তিনি যে সুলেখক, তাহা এই দেশভক্তির যে কোন একটা গল্প পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অধ্যাপক সমাদ্দারের এই স্বর্ণময়ী পর্য্যায় স্বর্ণমণ্ডিত হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

মিলনরাত্রি।—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়ার পরিচয় দিতে হইবে না, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন; এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেবা ত্যাগ করেন নাই। মিলনরাত্রি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি যে কথাটি যখনই বলিতে চান, তাহাই সরল, সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়া বলেন, কোন ঘোর

পেঁচ রাখেন না। আর ভাষার কথা—তিনি সে বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে অগ্রণীরূপেই অবস্থিতা। উপন্যাসখানির আখ্যান ভাগ স্বদেশী ব্যাপার; সুতরাং সকলেরই ভাল লাগিবে।

ঋণ-মোক্ষ।—শ্রীতারকনাথ সাধু প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়কে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি সত্যসত্যই 'বাহাদুর' এবং 'সাধু'। বলিতে গেলে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এই সাহিত্যিক মূর্ত্তি কেহই দেখিতে পান নাই; তিনি যে সাহিত্য-সেবার জন্য অবসর যাপন করিবেন, এ কথাও কেহ ভাবেন নাই। আর এখন কি না এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনি তিন-তিনখানি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন; এই ঋণ-মোক্ষ তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস। ইহাতে তিনি সনাতন ভাবেরই প্রচার করিয়াছেন। গল্পের আখ্যানভাগ ভাল; সাধু মহাশয়ও প্রাণ খুলিয়া তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিসর্জ্জন।—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই উপন্যাসখানি যখন পত্রান্তরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই আমরা পড়িয়াছিলাম। এই উপন্যাসে সরস্বতী মহাশয়ার পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুণ্ণ আছে। কয়েকটী চরিত্রচিত্রন অতি সুন্দর হইয়াছে; সতীর চরিত্র বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। আমরা এই উপন্যাস পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

অবাক্।—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। গল্প-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্না লেখিকা এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সব ভাল। পূজার বাজারে চলিবে।

সাঙ্খ্যযোগ।—শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য চারি আনা। এখানি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতান্তর্গত সাঙ্খ্যযোগের আধ্যাত্মিক ভাবব্যাখ্যা। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহাদের ভাল লাগিবে। ব্যাখ্যা সরল।

পিতা-পুত্র।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেশবাবু এই পিতা-পুত্র উপন্যাসে একটী গৃহস্থ ঘরের সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। পিতার অমিতব্যয়িতা ও খামখেয়ালী পিতৃভক্ত পুত্র কেমন নীরবে, নতশিরে আজীবন সহ্য করিয়াছেন, তাহারই করুণ কাহিনী এই উপন্যাসে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাকা হাতের পাকা লেখা; ইহার অধিক পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন আছে? প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থই যেন বইখানি পড়েন।

লালপতাকা।—শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত বি-এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। সকল দেশেই সকল যুগেই কতকগুলি খামখেয়ালী যুবক দেখিতে পাওয়া যায়—স্বদেশী আমলে এ দেশেও দেখা গিয়াছিল, এখনও দেখা যায়। তাহাদেরই মধ্যে এক জনের ছায়া লইয়া এই লালপতাকা লিখিত হইয়াছে। লেখক বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই, এই যা কথা।

কীর্ত্তিলতা।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যখন নেপাল গমন করেন, তখন সেখানকার দরবার পুস্তকালয় হইতে মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত 'কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' নামক দুইখানি পুরাতন পুঁথি নকল করিয়া আনেন। এ দুইখানিই মৈথিলী পুঁথি, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই একখানি—'কীর্ত্তিলতা'র মূল ও বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, কারণ এ পুঁথির অস্তিত্ব দুই একজন ব্যতীত আর কাহারও কর্ণগোচরই হয় নাই, দৃষ্টিগোচর ত দূরের কথা। শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই কীর্ত্তিলতার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু 'কীর্ত্তিপতাকা'র পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়কেই তাহা করিতে হইবে, পারিলাম না বলিয়া ছাড়িয়া দিলে আর কে সে কার্য্যে হস্ত পর্ণ করিবে। ডাক্তার শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই অমূল্য রত্নকে তাঁহার প্রকাশিত হৃষীকেশ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথেষ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ফল্গু।—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল্ বিরচিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। লেখক মহাশয় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী এই সংগ্রহ পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখক মহাশয় কবিতাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—গৃহলক্ষ্মী, দেশমাতৃকা ও বিশ্বদেবতা। এই তিনটী নামকরণ সার্থক হইয়াছে। আমরা সকলগুলি কবিতাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কবির উচ্চ হৃদয়ভাব ও আদর্শ প্রত্যেক কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঢেঁকির কীর্ত্তি।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য বার আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্প পুস্তক; ভিতরে কয়েকখানি ছবি আছে। এই পুস্তকে দুইজন বিখ্যাত দস্যুর (বদে, বিশের) ও পল্লীগ্রামের একটা ডাংপিটে ছেলের কয়েকটি গল্প আছে। গল্পগুলি যখন বুড়োদের ভাল লাগিয়াছে, তখন ছেলে মেয়েদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। পুস্তকখানির প্রধান বিশিষ্টতা—গল্পগুলি সত্য-ঘটনা-মূলক। সুতরাং এই ধরণের শিশুপাঠ্য গল্প-পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে কি না স্মরণ হয় না। গ্রন্থকার মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সেকালে পল্লীগ্রামের দুষ্ট ছেলেদের রুচি, প্রবৃত্তি, খেয়াল, দুষ্টামীর ধারা কিরূপ ছিল, একালের ছেলেদের তাহার ধারণা করা কঠিন হইয়াছে; তাই মনে হয় সাহিত্যেও এই গল্পগুলি স্থান পাইবার অযোগ্য নহে। ইহাতে সেকালের উদ্দাম পল্লীজীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক, দোষে-গুণে খাঁটি মানুষটিকে ইহার মধ্যে দেখিতে পাই।" গ্রন্থকার উপসংহারে আশঙ্কা করিয়াছেন, "হয় ত সমালোচকেরা বলিবেন—ইহাও একটা বুড়ো ঢেঁকির কীর্ত্তি!" কিন্তু ঢেঁকির উপযোগিতা অস্বীকার করিবে—ভেতো বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন সাহস কাহারও আছে কি?

ভবেশ।—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। অনেক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কালীপদ বাবু 'গৃহচিত্র' নামে একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়াছিলেন; আমরা সে সময় এই পুস্তকখানি পড়িয়াছিলাম। এতকাল পরে সেই পুস্তকখানিই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থের নায়কের নামানুসারে 'ভবেশ' নামে প্রকাশিত হইল। সনাতন হিন্দু আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন; ইহা সেই আদর্শবাদী পাঠকগণের নিকট সমাদরে গৃহীত হইবে। ইহার রচনাভঙ্গীও একালের দস্তুরমত নহে, পূর্ব্বকালের আদর্শে লিখিত। তাহা হইলেও প্রবীণ নবীন সকলেরই এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ছত্রপতি শিবাজী।—শ্রীভবসিন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য দুই টাকা। ছত্রপতি শিবাজীর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন চরিতের বড়ই অভাব ছিল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় একখানি জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জন্যই আমরা আর একখানি বিস্তৃত জীবন চরিত দেখিবার আশা করিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার লিপি-কৌশল, অনুসন্ধিৎসা ও ঘটনা-সংস্থান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই জীবনচরিত-খানির বহুল প্রচার কামনা করি। বইখানির অঙ্গসৌষ্ঠবও সুন্দর হইয়াছে।

ঝড়ের ফুল।—শ্রীনির্ম্মল দেব প্রণীত, দাম এক টাকা বার আনা। এখানি উপন্যাস। লেখক মহাশয় 'নবীন' হইলেও তাঁহার রচনা-চাতুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; বর্ণনা এমনই সুন্দর যে, বারবার পড়িতে ইচ্ছা করে। তিনি গল্পের আখ্যানভাগেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, চরিত্র চিত্রণ মনোরম হইয়াছে; কোথাও জড়তা নাই। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

হরিদাস ঠাকুর।—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত, মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যশোহর খুলনার ইতিহাস লিখিয়া সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, সাধনপরায়ণতা আছে, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ ব্যতীত আর কেহ এত দিন জানিবার অবকাশ পান নাই। এইবার এই হরিদাস ঠাকুর পুস্তকে পাঠকগণ তাহার প্রমাণ পাইবেন। আমরা অতৃপ্ত হৃদয়ে একাধিক বার এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি এবং সতীশবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। যে উন্নত ধর্ম্মপ্রাণতা থাকিলে হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহামানবের পবিত্র জীবন-কথা কীর্ত্তন করা যায়, সতীশ বাবুতে তাহা আছে। হরিদাস ঠাকুরের অপূর্ব্ব জীবন-কথা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভারত-পথিক-সহায়।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। যাঁহারা ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে অনেক অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এ রকমের একখানি বইয়ের বিশেষ অভাব ছিল; সতীশবাবু সেই অভাব পূর্ণ করিয়া ভারত-পথিকগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ঘরে বসিয়াই নানা স্থানের কথা জানিতে চান, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

দীপালী।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত, মূল্য কুড়ি আনা। বেশ বই, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট একেবারে আর্টিষ্টিক; ভিতরটা আরও সুন্দর—গুর্জ্জর, মালব ও রাজওয়ারার কয়েকটী আদর্শ মহিলার জীবন-কথা লেখক অতি সুললিত মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা বইখানি দেখিয়া ও পড়িয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি।

নমর মেয়ে।—ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায় প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা। এই অস্পৃশ্য-সমস্যার দিনে প্রতাপবাবু এই উপন্যাসখানি লিখিয়া নমঃশূদ্র জাতির সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর লোকের মনোভাবের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে অসংখ্য নরনারী দেবভাবাপন্ন হয়, আবার উচ্চশ্রেণীতে জন্মলাভ করিয়াও যে অনেকে চণ্ডালের অধম হয়, তাহা এই উপন্যাসখানিতে অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আত্ম-জীবন।—৺শ্রীকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রাণপঞ্জী, মূল্য ৷৷৹। ৺শ্রীকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আত্ম-জীবন চরিতে যে বড় বড় কথা থাকিবে, তাহা কেহই আশা করিতে পারেন না। ইহাতে আছে, একটী অসহায় বালক বহুকাল পূর্ব্বে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে কেমন করিয়া নিজের অধ্যবসায়-বলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; আর আছে, সেকালের পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-সমাজের সুন্দর চিত্র। আমরা এই বইখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, মূল্য বার আনা। এখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ-সংগ্রহ। এই অমূল্য উপদেশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষিতীন্দ্র বাবু সত্যধর্ম্ম-পিপাসুগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া মহর্ষিদেব যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের পরম আদরণীয়, সে কথা আর বলিতে হইবে না।

কিরণ লেখা।—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট উপন্যাস; কিন্তু ছোট হইলেও লেখকের লিপি-কৌশলের বাহাদুরী আছে। তিনি বেশ গোছাইয়া একটী পতিতা রমণীর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরও একটা কথা এই যে, লেখক মহাশয় ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন, কতদূর তিনি অগ্রসর হইতে পারেন; তিনি সীমারেখা ভুলিয়া যান নাই। এই জন্যই আমরা কিরণ-লেখার প্রশংসা করিতেছি।

লিচ্ছবি জাতি।—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্, পি এইচ্-ডি প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা।—প্রাক্ মৌর্য্যযুগে লিচ্ছবি জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জাতির ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত করিবার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে কেহই করেন নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় সেই চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে যতদূর সম্ভব, কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাহিত্যিক ইতিকথা ও কাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে; কারণ ঐগুলি ব্যতীত এই ইতিহাস সঙ্কলনে গত্যন্তর নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা ভারত-বর্ষের ইতিহাস-চর্চ্চা করেন, এই সুন্দর পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিবে। এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট ছাপা বাঁধাই পুস্তকের মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া লাহা মহাশয় ভাল কাজই করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য-পরিবার।—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু এই উপন্যাস-খানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর এই সুদীর্ঘকাল আর তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার অবকাশ পান নাই। অথচ এই সুন্দর পুস্তকখানি পড়িবার আগ্রহ অনেকেরই ছিল। এতদিন পরে লেখক মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন; আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, এটি Goldsmithএর Vicar of Wakefieldএর ঘটনার অনুসরণে লিখিত; কিন্তু, না বলিয়া দিলে তাহা ধরিবার উপায় ছিল না; কারণ তিনি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভাবে দেশী করিয়া ফেলিয়াছেন, কোন স্থানেই বিলাতীর সামান্য ছাপও নাই; ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

গোরুর গাড়ী।—শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত বিরচিত, মূল্য ছয় আনা। একে গোরুর গাড়ী, তাহে কাব্য—পড়িবার লোভ সংবরণ করা একেবারে অসাধ্য। পড়িয়া দেখিলাম গাড়োয়ান সত্য সত্যই বাহাদুর পুরুষ, তিনি কাব্য লিখিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। আমরা গোরুর গাড়ীর প্রশংসা করিতেছি। সবটা তুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু স্থানাভাব। তাই চারিটি লাইন মাত্র তুলিয়া দিলাম; ইহা হইতেই কবির ক্ষমতা বুঝিতে পারা যাইবে:—

অল্পমতি অলস গতি বুদ্ধি মোটামুটি,
নাই আসক্তি কিংবা শক্তি করতে ছোটাছুটি;
পথ চিনে সেই অচিন্ পথে চলতে যদি চাই,
গোরুর গাড়ী ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই!

মনের কথা।—শ্রীসরসীলাল সরকার প্রণীত; মূল্য বার আনা। বাঙ্গালা ভাষায় নব্য মনস্তত্ত্বের এইখানিই বোধ হয় প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্র-রসজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এই গ্রন্থের একটী সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন প্রচ্ছদপটের সুদৃশ্য ছবিখানি অঙ্কিত করিয়াছেন, সুতরাং বইখানিতে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

কীট-পতঙ্গ!—৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, দাম দেড় টাকা। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্র বাবু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। এই কীট-পতঙ্গের কাহিনী দ্বিজেন্দ্রবাবু বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর তাঁহার ভাগিনেয়...প্রথিতনামা সাহিত্যিক শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গো-পাধ্যায় এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া সুধু শিশু-সাহিত্যের কেন, প্রৌঢ় সাহিত্যেরও মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসদ্গুরু-সঙ্গ।—শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত, মূল্য ২৲। এখানি 'শ্রীশ্রীসদ্গুরু-সঙ্গ' পুস্তকের চতুর্থ খণ্ড। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত। ইহা ১২৯৯ সালের ডায়েরী। ব্রহ্মচারী মহাশয় গোস্বামী মহোদয়ের সঙ্গী ছিলেন এবং যখন যাহা দেখিয়া শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই আমরা এখন এমন পবিত্র জীবনের কতক দিনের ঘটনা জানিতে পারিতেছি। গোস্বামী প্রভুর শিষ্যেরাই যে কেবল এ গ্রন্থের সমাদর করিবেন তাহা নহে, বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট এই খণ্ড পূর্ব্ব তিনখানির ন্যায় আদৃত হইবে এবং পরম ভক্তিভরে পঠিত হইবে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও আত্মচিকিৎসা;—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য দশ পয়সা। এই পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুরুত্বে কম নয়। ইহাতে ম্যালেরিয়া জ্বরের কোষ্ঠিপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বা প্রতিষেধ, এবং আত্মচিকিৎসার কথা বিবৃত হইয়াছে। এখন বর্ষাকাল—বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া; এই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য ডাক্তার কার্ত্তিক বাবুর এই গ্রন্থ প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। পাঠকেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ চিকিৎসকের উপদেশাবলীর অনুসরণ করিলে উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা।—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় মাইকেলের পরম ভক্ত; তাঁহার ন্যায় এমন করিয়া মাইকেলের প্রত্যেক লাইন কবিতা কেহ পাঠ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। মেঘনাদবধের তিনি যে ব্যাখ্যা-যুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি এক্ষণে ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনার ব্যাখ্যা করিয়া, এই অভাবনীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত এই পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি

কেমন অভিনিবেশ সহকারে এই দুইখানি কাব্যের প্রত্যেক শব্দটীর আলোচনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় মেঘনাদবধ ও বর্ত্তমান পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই ভাবে মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা আশা করি, এই খানিও মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় পরম আদরে গৃহীত হইবে।

পথিক।—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত; মূল্য সাড়ে তিন টাকা। এখানি সুবৃহৎ উপন্যাস, ৫২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অনেক দিন এমন সুন্দর উপন্যাস পড়ি নাই। এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া চরিত্র-চিত্রণ বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শী হয়। ঘটনা-সংস্থানও অতি সুন্দর, কোন স্থানে জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব নাই; গোকুলবাবুর কল্পনা-স্রোত অপ্রতিহত গতিতে ছুটিতেছে, অথচ কোথাও অনাবিলতার নাম গন্ধও নাই। উপসংহারের কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—"মানুষের পায়ে-চলা পথের দিকে মায়া তাকাইয়া থাকে, পথ-যাত্রীদের দেখে আর ভাবে, ঐ অনন্ত পথ, ঐ অনন্ত-যাত্রীদের মধ্যেই লুকাইয়া আছে তাহার পথিক বন্ধু! প্রতিদিন সে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ঐ পথ ধরিয়া যদি সেও বাহির হইয়া পড়ে তাহার সন্ধানে, তবে দেখা কি হইবে না কোন দিন? কে জানে?—" এই পথিক! ইহাই এই পথিক পন্যাসের প্রাণবস্তু। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি "পথ কি নিজের শেষকে জানে? যেখানে সমস্ত লুপ্ত-ফুল আর স্তব্ধ-গান পৌঁছয় যেখানে তারার আলোর অনির্ব্বাণ-বেদনার দেওয়ালি-উৎসব হচ্চে!"

নীলিমা।—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত; মূল এক টাকা। এখানি কবিতা-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবু পূর্ব্বে অনেক সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিতেন, আমরাও পরম আগ্রহভরে সেই সকল কবিতা পাঠ করিতাম। কিন্তু কিছুদিন হইতে কবি তারাপ্রসন্ন একেবারে নীরব হইয়াছিলেন; আমরা মনে করিয়াছিলাম, তিনি শৈল-নিঝর ধ্যানমগ্ন। এখন এই নীলিমা দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি বাণী সেবা ত্যাগ করেন নাই; তাঁহার ভাবরাজ্যের নির্ম্মল কুসুম চয়ন করিয়া এই নীলিমা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সমস্তই সুন্দর, সরল ও প্রাণস্পর্শী।

প্রভাতী।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত; মূল্য বার আনা। ইহা একখানি গদ্য পদ্যের গীতিকাব্য। প্রভাতে উঠিয়া জীবন যেমন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয়, তেমনি প্রভাতে উঠিয়া চিত্তক্ষেত্রেও নানাবিধ চিন্তা জাগ্রত হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের চিত্তে প্রভাতে যে সকল ভাব জাগ্রত হয়, তাহারই কয়েকটী তিনি একত্র গ্রথিত করিয়া এই 'প্রভাতী' লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী ব্যক্তির নিকটই আশা করা যাইতে পারে। তিনি এই প্রভাতের চিন্তায় অনেক বহুমূল্য কথা বলিয়াছেন। এই ছোট বইখানি সকলেরই সমাদরে পাঠযোগ্য।

সাহিত্য-সংবাদ

রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত "আলোকে-আঁধারে" উপন্যাস শীঘ্র প্রকাশিত হইবে; মূল্য—১৷৷০

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "রাজপথ" সুবৃহৎ উপন্যাস শীঘ্র প্রকাশিত হইবে; মূল্য—৩৲

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "ভারতে হিন্দু-মুসলমান" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৷৷০

শ্রীবরদাকান্ত দাশগুপ্ত প্রণীত "ডালিম" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৷৷০

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভগ্নব্রত" নাটক প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সংসারী" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "সুরূপা" উপন্যাস প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৷৷০

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বউভাত" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীহরনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রেমের-পরশ" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিয়ের রাত" উপন্যাস প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "লাজাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল; মূল্য—৷৷৵০

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা প্রণীত "লিচ্ছবি জাতি" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷০

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ প্রণীত "ব্রহ্মসূত্রম্" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৷৷০

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত প্রণীত "গোরুর গাড়ী" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল; মূল্য—৷৵০

শ্রীসত্যচরণ সেন প্রণীত "হরনাথ চরিতামৃত" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত "কার্পাস-শিল্প" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৸০

শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "রয়েল অক্‌সান ব্রিজ" (বাঙ্গলায়) প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন প্রণীত "বঙ্গে চালতত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—৩৲

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত "নর্ম্মদা" গীতাভিনয় প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত "ছত্রপতি শিবাজী" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

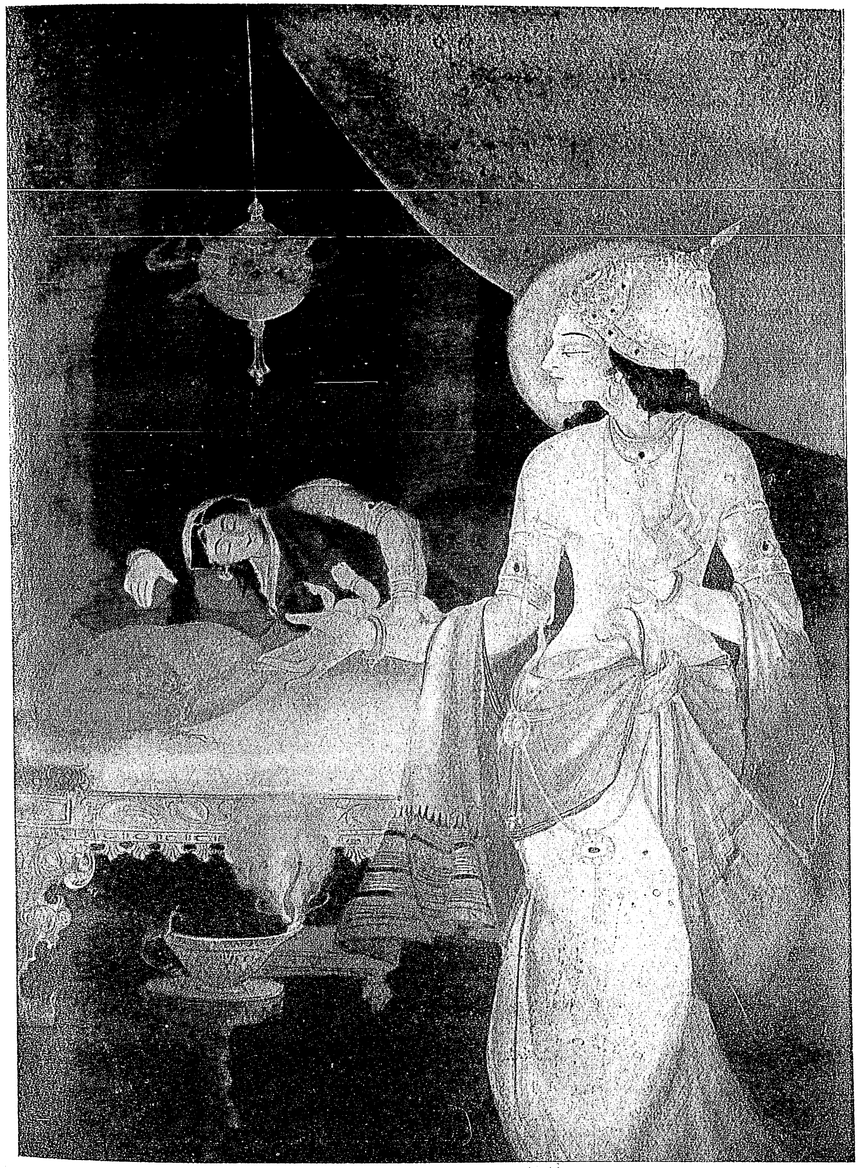

বুদ্ধের-গৃহত্যাগ

"অরুণ তোমার তরুণ অধর ঘুমাইছ তুমি নিখিল নয়নে
করুণ তোমার আঁখি, জাগিয়া উঠিবে বিরহ স্বপনে।"—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেনচন্দ্র ঘোষদস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works